সজনীকান্ত দাসের
স্বনির্বাচিত গল্প

স্বনির্বাচিত গল্প

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গ্রন্থম
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
২৮শে চৈত্র ১৩৬৬

প্রকাশক
প্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম
২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

একমাত্র পরিবেশক
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১৬

মুদ্রক
রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদচিত্র
তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রণ :
কলার স্টুডিও

দাম পাঁচ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীসজনীকান্ত দাস বাংলা সাহিত্যের আসরে যে দুর্ধর্ষ মেজাজ ও দুর্মদ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তার সুর ও দীপ্তি হয়তো সকলকার মনঃপূত হয় নি, কিন্তু একথা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হয়েছে যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা, সজনীকান্তের মধ্যে এই দুই হৃদয়বৃত্তির যে বিকাশ দেখা গেছে তা যেমন অকৃত্রিম তেমনি অবিচল।

তাই আজ সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করে তিনি সাহিত্য-মন্দিরের মণিকোঠায় প্রবেশাধিকার পেয়েছেন, সেখানকার বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ পূজারীদের মধ্যে আসন লাভ করেছেন, ইতিহাস তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছে।

বহু তীর্থ ভ্রমণের মত সজনীকান্তের সাহিত্য-পরিক্রমা এবং সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অসামান্য পারঙ্গমতা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গরচনা, প্রবন্ধ, গবেষণামূলক সাহিত্যকর্ম—এমন কোন বিষয় নেই বললেই হয় যা নিয়ে তিনি লেখনী চালনা করেন নি। এ ছাড়া তাঁর সাংবাদিকতা, সে তো এক অবিরামগতি ঝড়ের ইতিহাস, যার বেগ আজ মন্দীভূত হয়েছে, কিন্তু গতি স্তব্ধ হয় নি।

শ্রীসজনীকান্ত দাসের চারখানি গল্প-গ্রন্থ 'মধু ও হুল', 'কলিকাল', 'কেড্স ও স্যাণ্ডাল' এবং 'আকাশ-বাসর' যথাক্রমে ১৩৩৮, ১৩৪৭, ১৩৪৭ ও ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে 'কেড্স ও স্যাণ্ডাল' কবিতায় গল্প—সুতরাং এই সঙ্কলনে বর্জিত হয়েছে। 'মধু ও হুল' থেকে "জলের মত পরিষ্কার" ও "এক আনার ডাক-টিকিট"; 'কলিকাল' থেকে "পান্নালাল", "সতীন-কাঁটা", "চার পয়সা" ও "দেখে যা পাগলী" এবং 'আকাশ-বাসর' থেকে "হরিমতি", "কেষ্টর মা", "রিকশাওয়ালা", "আকাশ-বাসর" ও "ভাই-বোন" মোট এগারটি গল্প এই সঙ্কলনে নির্বাচিত হয়েছে। বাকি তেরোটি গল্প এখন পর্যন্ত পুস্তকাকারে

অপ্রকাশিত ছিল—এই গ্রন্থে সেগুলি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হল। লেখকের সর্বপ্রথম মুদ্রিত গল্প "গল্প" 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে ১৩৩২ সনে (১৯২৫ খ্রীঃ) এবং সর্বশেষ "খাওয়া" 'শনিবারের চিঠি'তে ১৩৬৩ সনে (১৯৫৬ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। এই কালের মধ্যে তাঁর লিখিত গল্পের সংখ্যা প্রায় একশোটি।

এই সংকলনে, আমাদের অনুরোধে তিনি নিজেই কয়েকটি গল্প বেছে দিয়েছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে বিভিন্ন রসের সমাবেশের সঙ্গে তাঁর জীবনের বিভিন্ন কালের মেজাজ ও লিখন-শৈলীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাংলা সাহিত্যে এই সংকলনের একটি বিশেষ তাৎপর্য ও মূল্য আছে বলে মনে করি।

উৎসর্গ

কল্যাণীয় বিমল ও কল্যাণীয়া উমাকে—

২৮শে চৈত্র
১৩৬৬

বিদ্যুল্লতা

হঠাৎ মাঝরাত্রে একটা জরুরি টেলিগ্রাম পাইলাম। গৌহাটি হইতে লতা নামধেয়া কেহ জানাইতেছেন—২৭শে শ্রাবণ তাঁহার কন্যার বিবাহ, আমার হাজির হওয়া চাই-ই চাই।

স্মৃতি-সমুদ্রে একটা চিড় খাইল বইকি! অনেকটা তলাইয়া যাইতেই ঘোলাটে ভাবটা কাটিয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। পুরা নাম বিদ্যুল্লতা, ডাকিতাম লতা বলিয়া। বিদ্যুতের মত ত্বরিতগামিনী, হাস্যে-লাস্যে প্রভাময়ী, হঠাৎ-আলোর ঝলকানিবৎ এক তন্বী দীর্ঘাঙ্গী তরুণীকে মনে পড়িল। আমারই সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু শরদিন্দু বসুর পত্নী—সাহিত্যরসিকা বিদ্যুল্লতা, আমিই নাম দিয়াছিলাম লতা। শরদিন্দু আর আমি একসঙ্গে আই. এস.-সি. পাস করিয়া বঙ্গবাসী কলেজ হইতে মেডিকাল কলেজে ভর্তি হই। কলেজ স্ট্রীটের একটা মেসে একই ঘরে আমরা মাত্র দুইজনে থাকিতাম। শরদিন্দু ছিল অত্যন্ত ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট মানুষ—যাহাকে বলা হয় ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিক। যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা বাস্তব, যাহা স্থূল, তাহা লইয়াই তাহার কারবার। প্রচুর ঝালমসলা সমন্বিত আহার্য যেমন সে ভালবাসিত, তেমনি কামনা করিত স্ত্রীলোকের স্থূল মাংসল দেহ। শেষোক্ত ব্যাপারে মাধুর্য ও সূক্ষ্মতার ধার দিয়া সে কখনও যাইত না, স্ত্রীলোকের মন বলিয়া কোনও অদৃশ্য বস্তু থাকিতে পারে তাহাও সে স্বীকার করিত না। সে বলিত, রসগোল্লার অনুমতি লইয়া যাহারা তাহাতে কামড় দিবার পক্ষপাতী, আমি তাহাদের দলে নহি। কামড়াই, গিলিয়া ফেলি, তারিয়া তারিয়া খাই, রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া দিই অথবা রসে মাখামাখি করিয়া কাপড়-চোপড় টেবিল-চেয়ার নোংরা করি—সে আমার ইচ্ছা। সূক্ষ্ম অনুবীক্ষণ যোগে রসগোল্লার "সেল" পরীক্ষা করিয়া রসসম্ভোগ নিতান্ত অরসিকের কাজ। এই শরদিন্দুর একটি মাত্র সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা ছিল, সে ভাল বাঁশের বাঁশি বাজাইতে পারিত। এ-হেন শরদিন্দু যখন বিবাহ করিয়া বউ আনিয়া চাঁপাতলার একটা ভাড়াটে বাড়িতে তুলিল, তখন বন্ধু হিসাবে আমিই সর্বপ্রথম নববধূর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিলাম শরদিন্দু তখন ফাইনাল এম. বি. পাস করিয়া

পুরাদস্তুর ডাক্তার হইয়া হাউস-সার্জেনি করিতেছে, আর আমি ফার্স্ট এম.বি. পরীক্ষায় বারবার অকৃতকার্য হইয়া টি. টমসনের হৌসে হিসাবের খাতা লিখিতেছি। কবিতা লেখার বদখেয়াল বাল্যকাল হইতেই ছিল। ইতিমধ্যে দুই একটি নাম-করা মাসিকে আমার কয়েকটি বালখিল্য প্রেমের কবিতা গৃহীত ও মুদ্রিত হওয়াতে পরিচিত-মহলে কবিখ্যাতিও হইয়াছে, দুই-চারিটি ছোট গল্পও লিখিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং সাহিত্যপ্রীতিসম্পন্না বিদ্যুল্লতার কাঠখোট্টা স্বামীর সহিত সন্তপাতা সংসারে প্রায় ঠাকুর-ঘরে দেবতার আসনে আমার স্থান হইল। হাউস-সার্জেনের তিলার্ধ অবসর নাই. মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী—আমার সুপ্রচুর অবকাশ। নিঃসঙ্গ পত্নীকে সঙ্গ দিবার জন্য তাহারই ঘরে এই অবকাশটুকু যেন যাপন করি শরদিন্দু সকাতরে সেই অনুরোধ জানাইয়াছিল। আমিও সানন্দে বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিয়া চলিতাম। কাব্যে গল্পে গানে (বিদ্যুল্লতা মন্দ গাহিত না) আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক আলোচনায় প্রতিদিনের সন্ধ্যা মুখর হইয়া উঠিত। রিপন হস্টেলের অধিবাসী শরদিন্দুর ভাই সুধাবিন্দু প্রায়ই আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় যোগ দিত. ভবানীপুরের শ্বশুরবাড়ি হইতে শরদিন্দুর বোন অমলাও মাঝে মাঝে আসিত। অনেক রাত্রে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় শরদিন্দু যখন ঘরে ফিরিত, তখন প্রথমেই সঙ্গীহীনা বিদ্যুল্লতার বিদ্যুৎচাঞ্চল্য আমরা রক্ষা করিতে পারিয়াছি দেখিয়া সে কৃতজ্ঞতা জানাইত এবং চৌকিতে চিত হইয়া শুইয়া বাঁশিতে রবীন্দ্রনাথের নূতন গান বাজাইতে বাজাইতে অচিরে ঘুমাইয়া পড়িত। তাহার নাক ডাকার শব্দে আমার চমক ভাঙিত, আমি তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া মেসে ফিরিতাম।

এইরূপ চলিয়াছিল অনেকদিন। গল্প গান কবিতার ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিলে আমি শরদিন্দুর বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া একমনে কবিতা ও গল্প লিখিতাম। একটা উপন্যাসও ফাঁদিয়াছিলাম। এইগুলি যখনই মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত, লতার আনন্দ দেখে কে! বড় গলা করিয়া সে সকলকে বলিত; এগুলি তাহারই পাশে বসিয়া লিখিত, অমুক কবিতার এই লাইনটি তাহার। তাহার অহমিকায় কৌতুক বোধ করিতাম ও তাহাকে প্রশ্রয় দিতাম।

বৎসরাধিক কাল পরে লতাকে ফরিদপুরে পিতৃগৃহে যাইতে হইল—প্রথম সন্তান মায়ের কাছে হওয়াই বিধেয়। আমার সান্ধ্য-অবকাশরঞ্জন অকস্মাৎ

রমণীয়তা হারাইয়া আমাকে প্রথমটা খুবই কষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, এই সুযোগে অনেক কিছুই লিখিব, কিন্তু দশ লাইনের একটা গানও এই কালের মধ্যে লিখিতে পারি নাই। না লিখিতে পারার আরও একটা কারণ—শরদিন্দু তাহার নৈশ অভিযানগুলিতে আমাকে টানিতে লাগিল। আন্দাজ আমি অনেক পূর্বেই করিয়াছিলাম, চাকুরির মেয়াদ প্রত্যহ রাত্রে অত দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না, অন্যত্র তাহার শখের চাকরি নিশ্চয়ই জুটিয়াছে। কিন্তু তাহা যে একেবারে অপাংক্তেয় পল্লীতে, তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই। দ্রাক্ষারস-সুরভিও এক-আধ দিন চকিতে নাকে লাগিয়াছিল। এতদিনে সব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। স্থূলরসপ্রীতি তাহাকে কোথায় কত নীচে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

বিদ্যুল্লতাকে রক্ষা করিবার কথা মনে হইতে লাগিল, কিন্তু এমন সময়ে ফরিদপুরের খবর আসিয়া নিঃসংশয় প্রমাণ দিল যে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; লতা একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়া অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমিও কিছুদিন ডাক্তারি পড়িয়াছিলাম, তাহারই জোরে শরদিন্দুকে প্রশ্ন করিলাম। সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল, বলিল, কবিকল্পনা। চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম।

লতা ফিরিয়া আসিল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, শরদিন্দু আর আমাকে আমল দিতে প্রস্তুত নয়। সে আমাকে পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিল। আমার অজ্ঞাতসারে বাসা বদলাইয়া আমাকে ঠিকানা দিল না। এবারে লতাকে যে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্ট অনুভূতি হইল. কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে—চপলা গম্ভীরা হইয়াছে। হাসিমুখেই প্রশ্ন করিল, অনেকদিন তো সময় পেলেন, কি লিখলেন? হাসিয়া জবাব দিলাম, ইন্‌স্পিরেশনের অভাবে কলম চলে নাই। কিছু লেখা হয় নাই। লতা খুশী হইল, না, দুঃখিত হইল বুঝিতে পারিলাম না।

ইহার পর কিছুদিন বন্ধু-পরিবারের কোনই সন্ধান পাই নাই। পরম্পরায় এইটুকু মাত্র জানিতে পারিলাম, আমাদের নূতন সাহিত্যিক বন্ধু দিব্যেন্দু শরদিন্দুর সহিত খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, তাহারই চেষ্টায় বেগবাগানের একটা দুর্গম পল্লীতে শরদিন্দু বাসা লইয়াছে। সেখানে দিব্যেন্দুর নিত্য যাতায়াত। আমি ধীরে ধীরে আমার মনকে গুটাইয়া লইলাম। কষ্ট হইল নিশ্চয়ই, কিন্তু কলিকাতায় নিজের নূতন সংসার লইয়া এমনই জড়াইয়া পড়িলাম

যে, কে গেল অথবা কি হারাইলাম তাহা ভাল করিয়া ঠাহরই করিতে পারিলাম না।

তিন বৎসর পরের কথা। হঠাৎ একদিন একটি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলাম দিব্যেন্দুরই মারফত। গেলাম। বিদ্যুল্লতাকে বিশীর্ণা ও মলিনা দেখিব কল্পনা করি নাই। সে শয্যাশায়িতা ছিল, অসুস্থ। আর একটি সন্তান গর্ভেই নষ্ট হইয়াছে। তাহার চোখের দৃষ্টি একটু লক্ষ্যহীন হইয়াছে, কথায় প্রগল্‌ভতা আসিয়াছে। আমার হাতটা নির্বিচারে বুকের উপর টানিয়া লইল, কাতর ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমার কি ছেলে হবে না মথুরবাবু? ওই দেখুন, পুতুল নিয়ে মনের সাধ মিটোতে চাই, খানিকক্ষণ ভালও লাগে, কিন্তু তারপর অসহ্য মনে হয়। এরা যে কাঁদে না, আবদার করে না। কি করি বলুন তো?

দেখিলাম, সামনের কাচের আলমারিতে সারি সারি পুতুল সাজানো। বড় বড় "ডল"—কাপড়ে গয়নায় সজ্জিত, খরচ বড় কম হইবে না। চোখের কোণে জল আসিল। মুখে মৃদু হাসি টানিয়া বলিলাম, হবে বইকি, এখনি হতাশ হচ্ছ কেন?

হবে?—বলিয়া লতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, আমার হাতটা তাহার হাতেই ধরা রহিল। এমন সময় শরদিন্দু প্রবেশ করিল। আমাকে ওই অবস্থায় দেখিয়া তাহার মুখে কালোছায়া নামিয়া আসিল। চেষ্টা করিয়া মুখে হাসি টানিয়া বলিল, বা রে, তুই কোত্থেকে?

শরদিন্দুকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া উভয়ের চিকিৎসার কথা বলিলাম, আরও বলিলাম, আমি ডাক্তার হতে পারি নি বটে, তবে মনুষ্য-চরিত্র যতটুকু বুঝি তা থেকে বলতে পারি—একটি সুস্থ সবল ছেলে না পেলে লতা পাগল হয়ে যাবে। সাবধান!

শরদিন্দু আমার কাঁধে একটা থাবা মারিয়া অট্টহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া বলিল, তুই নিজে অলরেডি পাগল হয়েছিস। খুব সেন্টিমেণ্টাল উপন্যাস লিখছিস বুঝি আজকাল?

বুঝিলাম, যে দানব সেই দানবই আছে, মুখের কথায় কিছু হইবে না। দুঃখিত চিত্তে বিদায় লইয়া আসিলাম।

ইহার পরেই শরদিন্দু অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জেনের চাকরি লইয়া ধুবড়ি চলিয়া গেল। বিদ্যুল্লতার সহিত আমার যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হইল।

হঠাৎ একদিন ঠিক আজিকার মত একটা টেলিগ্রাম পাইয়া বন্ধু-দম্পতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলাম। তাহারা উভয়ে কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজনে আসিতেছে; আমার বাসাতেই উঠিবে। ভাবিত হইয়া উঠিলাম। আমার বাসাটি সঙ্কীর্ণ। চারিটি ছেলেমেয়ে লইয়া কোনক্রমে একটা ঘরে থাকি, আর একটি মাত্র ঘরে থাকেন আমার বিপত্নীক পিসেমশাই। বাতিকগ্রস্ত সেকেলে মানুষ। তাঁহাকে লইয়াই গৃহিণীর হেফাজতের অন্ত নাই। দিনের মধ্যে তিনি বত্রিশবার তামাক খান, আটটা সেট কলিকা সর্বদাই ঠিক্‌রে সমেত প্রস্তুত রাখিতে হয়; গজ লইয়া দৈনিক তিনবার হুঁকার নল পরিষ্কার—সেও এক এলাহি কাণ্ড; বালাখানার গন্ধে সমস্ত বাড়ি চব্বিশ ঘণ্টা ভরপুর, ছেলেমেয়েরা তো গন্ধে গন্ধেই পাড় হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় বন্ধুর জোড়ে আগমন ঠিক কাম্য ছিল না। তবু সহ্য করিতেই হইল!

অনেকদিন পরে বিদ্যুল্লতাকে দেখিলাম, আর সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা নয়। বিদ্যুৎ যেটুকু বজায় আছে তাহা প্রসাধনে। শরদিন্দু একটা ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে, পাস করিতে পারিলে চাকুরিতে প্রভূত উন্নতি হইবে। ইতিমধ্যেই গাড়ি করিয়াছে, শিলংয়ে একটা বাড়িও কিনিয়াছে। বস্তুতান্ত্রিক শরদিন্দু চুপ করিয়া বসিয়া নাই। গৃহিণী ও মোট-ঘাট কোনক্রমে আমাদের দাওয়ায় নামাইয়াই সে অন্তর্ধান হইল। একটা বিপুলায়তন বাক্স, সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিলই না, দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া বারান্দা দিয়া তুলিতে হইল।

পিসেমশাই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, তিনি চাটুজ্জে-বাড়ির রোয়াকে হুঁকা হাতে সেই যে গিয়া বসিলেন, উঠিবার নাম করেন না—সে এক বাড়্‌তি হাঙ্গামা। গৃহিণীও ঠিক মাটির মানুষ নহেন, খিটিমিটি যে কেন বাধিতে লাগিল তাহা মাত্র আমি বুঝিলাম। পরের ব্যাপারে বেশী উৎসাহ প্রদর্শন সমীচীন নয় ভাবিয়া নিঃশব্দে অফিসে চলিয়া গেলাম।

ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, শরদিন্দু তখনও ফেরে নাই, লতা রান্নাঘরে বসিয়া পিণ্ডিখেজুরের জেলি বানাইতেছে ও গৃহিণীর সহিত গল্প করিতেছে। আমি বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন না করিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া মাদুর লইয়া ছাদে চলিয়া গেলাম। মনে পড়িতেছে, সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি। ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ মৃদুস্পর্শে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম—লতা! কি সর্বনাশ! সেই ভরা জ্যোৎস্নার মধ্যেই আমার মাথায়

আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। লতা বুঝিল, বলিল, মেহু পাশের বাড়িতে গেছে, সে বাড়ির গিন্নীর নাকি এখন-তখন অবস্থা—একটি মেয়ে ডাকতে এসেছিল। তবু ভাল, বলিলাম, শরদিন্দুর কি হল? রাত্রি যে অনেক হয়েছে—এখনও—

লতার মুখে বিদ্যুতের মত একটা হাসির ঝলক দেখিলাম। তাহার সুপ্ত প্রকৃতি কি তবে জাগিয়াছে? শরদিন্দুর প্রসঙ্গ একেবারেই না তুলিয়া সে সরাসরি প্রশ্ন করিল, আমার বড় বাক্সটাতে কি আছে আপনি দেখেছেন? কি আছে আন্দাজ করতে পারেন?

দুটি প্রশ্নেই ঘাড় নাড়িলাম। লতা বলিল, আছে পুতুল, ওরাই আমার ছেলেমেয়ে। দুটো নষ্ট হওয়ার কথা আপনি জানেন, তারপর আরও চারটে। ছটি অসহায় শিশু আমার কাছে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে পথ খুঁজে পায় নি। আমি তাদের নকল সাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, নিজেকে ভোলবার চেষ্টা করছি—কিন্তু বৃথা।

জবাব দিবার কিছুই ছিল না, চুপ করিয়া রহিলাম। লতা উত্তেজনায় আমার হাত চাপিয়া ধরিল। ব্যাকুল আর্তকণ্ঠে বলিল, আপনি পথ করে দেবেন আমার সেই পথহারা শিশুদের?

বুঝিতে পারিয়াও বোকার মতন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নীচে সদর-দরজা খুলিবার ও বন্ধ হইবার শব্দ হইল। সর্বনাশ! বলিলাম, চল, নীচে যাই।

লতার হাত দৃঢ়তর হইল। বলিল, না, আমার কথার জবাব না দিয়ে আপনি যেতে পারবেন না। আপনি তো মহাভারত পড়েছেন? অম্বা-অম্বালিকার কাহিনী নিশ্চয়ই জানেন। এসব কি শুধুই গল্প, না, এর মধ্যে মানুষের অবলম্বনের কোন ইঙ্গিত আছে? মহাভারতকে আপনি ধর্মগ্রন্থ বলে মানেন?

মূঢ়ের মত বলিলাম, মানি।

তবে?

থতমত খাইয়া বলিলাম, বেদব্যাস, সূর্য, পবন, ইন্দ্র বা অশ্বিনীকুমারদের পক্ষে যা সম্ভব, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, মহাভারতের সমাজ আর আজকের সমাজ এক নয়।

লতা পদদলিত সাপের মত গর্জন করিয়া উঠিল। বলিল, সত্যি কথা, এ সমাজ পতিত হীন অমানুষের সমাজ। আর নয়, চলুন, নীচে যাই।

নামিয়া আসিলাম। বড় ঘরটায় দেখিলাম তক্তপোষের উপর লতার বড় বাক্সটা খোলা, আর বিছানায় সারি সারি পুতুল সাজানো।

পরদিনই লতা আমাদের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল পিত্রালয়ে যাইতেছে। শরদিন্দু কলিকাতা হইতে একাই ফিরিবে।

তাহার পর পনেরো বৎসর হইয়া গিয়াছে। শরদিন্দু এখন গৌহাটির সিভিল সার্জেন, প্রচুর নামডাক ঐশ্বর্য। কাগজে মাঝে মাঝে তাহার নাম দেখি। কোন কোন সামাজিক বা দাতব্য অনুষ্ঠানে লতার উপস্থিতিও বিজ্ঞাপিত দেখি। পনেরো বৎসর পরে এই বিবাহের আকস্মিক ও সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণ! তবে কি লতার পরবর্তী সন্তান বাঁচিয়াছে?

যাওয়াই স্থির করিলাম।

গৌহাটিতে সিভিল সার্জেনের কোয়ার্টারে যখন প্রবেশ করিলাম, তখন রাত্রি গভীর। বিবাহের কোনও চিহ্ন কোন দিকেই নাই। অতি করুণ, অতি মধুর বাঁশের বাঁশির স্বর কানে আসিল।

আমার আগমনে সচকিত শরদিন্দু প্রায় ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিল। বলিল, তুই এসেছিস? আয় এই দিকে।

শরদিন্দুর নির্দেশমত দুইজনেই পা টিপিয়া টিপিয়া বারান্দায় গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, পরিপূর্ণ বিদ্যুতের আলোকের মধ্যে জানালার গরাদে ধরিয়া বিদ্যুল্লতা বাহিরের আকাশের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে। স্থির বিদ্যুল্লতা। শরদিন্দুর কান্না যেন কথা হইয়া ফাটিয়া পড়িল—কাল তোমাকে টেলিগ্রাম করার পর ওখান থেকে ওকে নড়ানো যাচ্ছে না, দেখ যদি কিছু করতে পার।

আমি আগাইয়া গেলাম।

আশ্বিন, ১৩৫৯

কেষ্টর মা

কাজে-অকাজে গ্রামের শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীরা পর্যন্ত তাহাকে ডাকিতেন— নাড়ু কুটিতে, খই-মুড়ি ভাজিতে, নারিকেলের তক্তি বানাইতে, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পান সাজিতে, তরকারি কুটিতে এবং সহস্রবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যে কেষ্টর মাকে বাদ দিবার উপায় ছিল না। গ্রামের ভদ্রগোষ্ঠীর সেও একজন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজে-কর্মে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার পূর্ব ইতিহাস যেন লোকে ইচ্ছা করিয়াই বিস্মৃত হইয়াছিল।

কিন্তু খুব অধিক দিনের কথা নহে, এই সামান্য নারীকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য গ্রামের মহামহিম মোড়লমণ্ডলীর শিখা ও হুঁকা একসঙ্গে সবেগে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কথা উঠিলেই সতীসাধ্বী গৃহিণীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মৌখিক শতমুখী প্রহারে বেচারাকে জর্জরিত করিতেন; গ্রামের রসিকা যুবতীরা গোপনে মুখরোচক আলোচনা করিত। গাঁয়ের গিন্নীবান্নী বউ ঝি, সমাজপতি ও ছেলেছোকরাদের এই নিন্দা সমালোচনা ও রূঢ়বাক্য যখন পল্লবিত হইয়া কেষ্টর মার কর্ণগোচর হইত সে তখন যথাসম্ভব আপনার সামান্য কুটীর-প্রাঙ্গণে আত্মগোপন করিয়া অতীব সঙ্কোচে দিন কাটাইত—পারতপক্ষে কখনই ঘরের বাহির হইত না। কোনও দিক দিয়া কোনও প্রকার বাধা না পাইয়া হতাশ নিন্দুকেরা শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হইয়াছিল। ক্রমে সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা হইল—অন্ততঃ তাহার নিন্দা কেহ আর করিত না। তবু এই প্রৌঢ়া 'বিধবা' নারী তাহার অভ্যস্ত সঙ্কোচটুকু পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। শুভ্র বসনখানিতে নিরাভরণ দেহটিকে যথাসম্ভব আবৃত করিয়া মূর্তিমতী ব্যথার মত সে গ্রামের ঘরে ঘরে নিতান্ত প্রয়োজনের কালে বিচরণ করিত। কিন্তু তাহার যত জ্বালা ছিল কেষ্টকে লইয়া। সে মাঝে মাঝে অন্তর্ধান হইয়া গোপন গৃহকোণ হইতে এই প্রৌঢ়াকে টানিয়া আনিয়া গ্রামের পথে বাহির করিয়া দিত, আহারের সময়ে গৃহে না ফিরিয়া এই অসহায়া নারীকে লোকের দ্বারে দ্বারে, ছেলেদের আড্ডায় আড্ডায় খোঁজ করিয়া ফিরিতে বাধ্য করিত। যখন গ্রামে তাহার সম্বন্ধে নিন্দার বান ডাকিত, সমাজপতিরা মাথা মুড়াইয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে প্রত্যহ নূতন করিয়া

রায় দিতেন, তখনও তাহাকে যথেষ্ট সঙ্কোচ লইয়া কেষ্টর সম্বন্ধে তদারক করিতে হইয়াছে। কালপ্রবাহে সে নিন্দা সমাজ বিস্মৃত হইলেও কেষ্টর মা নিজে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই, আপনার জোরে কোন দিনই সে তাই কিছু অধিকার করিতে পারে নাই; আপনাকে যথাসম্ভব আড়ালে রাখিয়াই সে পরের কাজ করিয়া যাইত।

* * *

এখানে প্রথম ইতিহাস কিছু বলা আবশ্যক। কেষ্টর মা বলিয়া আজ সে সর্বত্র পরিচিত হইলেও আসলে সে কেষ্টর মাতা নহে—কেষ্টই তাহাকে এখন মা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। এই নিঃসহায় বিধবার দুঃখ লজ্জা সঙ্কোচের সব চাইতে বড় কারণও সেখানে।

রাইচরণ মোদকের গৃহিণী জ্ঞানদা যেদিন একমাত্র পুত্রকে স্বামীর পদতলে রাখিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু বুজিল, সেদিন রাইচরণ চক্ষে অন্ধকার দেখিল। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাসম্ভব ধূমধামের সহিত শেষ করিয়া মাতৃহারা অপোগণ্ড রোরুদ্যমান শিশুকে লইয়া সে যখন ঘরের দরজায় আসিয়া বসিল, তখন পাড়ার বৃদ্ধ বৃদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সমবয়স্ক বন্ধুরা পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাহাকে দ্বিতীয় বার সংসার করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথোচিত ও অযাচিত উপদেশ দিয়া গেল। রাইচরণ একটিও কথা বলিল না। মৌন থাকিয়া তাহাদের কথায় সম্মতি দিল ভাবিয়া তাহারা প্রত্যেকেই খুশীর ভাব দেখাইয়া আড়ালে বলাবলি করিল, "কি নির্মম লোক গো, বউয়ের মরবার তর সয় না।" কিন্তু উপদেশ ও নিন্দার দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়াও রাইচরণ পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিল না।

রাইচরণ লোকটা ছিল অত্যন্ত নিরীহ, গোবেচারী। বিবাহ না করিবার কোনও ধনুর্ভঙ্গ পণ তাহার ছিল না, বরঞ্চ বিবাহ করিয়া শিশুপুত্রকে লালন-পালন করিবার উপযুক্ত একটি লোক পাইলে সে অনেক যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে—ইহাও বিশ্বাস করিত। তবু নানা ঝঞ্ঝাটের ভয়ে সে বিবাহ করিতে পারিল না। যদি এক কোপে বলি দেওয়ার মত সহজেই কাজটা নিষ্পন্ন হইয়া যাইত তাহা হইলে বিবাহ করিতে তাহার বাধিত না, কিন্তু অনেক তোড়জোড়, অনেক হাঁক-ডাক করিয়া তবে একটি বিবাহ করিতে পারা যায়, তা সে দ্বিতীয় পক্ষই হউক আর তৃতীয় পক্ষই হউক। লোক-লৌকিকতা পাওনা-দেনা, মন্ত্রতন্ত্র, পুরোহিত-নাপিত—সে অনেক হাঙ্গামা!

রাইচরণ বিবাহ করিতে পারিল না, অথচ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকেও মানুষ করিতে হইবে। পিতৃকুলে তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না। মাহিনা করিয়া লোক রাখিয়া ছেলেকে মানুষ করিবে এমন অর্থেরও তাহার অভাব ছিল। তাহাকে খাটিয়া খাইতে হয়। রীতিমত হাড়ভাঙা পরিশ্রম না করিলে দুইবেলা অন্নসংস্থান হওয়াই দুর্ঘট; ছেলেকে লইয়া নিজে যে কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে তাহার সুযোগও ছিল না, অনভ্যস্ত কাজে অতিরিক্ত যত্ন দেখাইতে গিয়া শিশুর অবিরাম ক্রন্দনে সে দিশাহারা হইয়া পড়িতে লাগিল।

এরূপ ক্ষেত্রে আবাল্য-বিধবা শ্যালিকা কুসুমের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার হাতেই সন্তানকে সঁপিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। এখন থাকিবার মধ্যে এই এক কুসুম আছে। দাদার সংসারে অনেকগুলি সন্তান-পরিবৃত বউদিদিদের মন যোগাইয়া চলিতে তাহাকে যথেষ্টই পরিশ্রম করিতে হইত, অধিকন্তু উঠিতে বসিতে বউদিদির অকারণ গঞ্জনা ও দাদার লাঞ্ছনা তো ছিলই। বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিয়া সে যে দাদার সমূহ ক্ষতি করিতেছে এবং একদিন স্বামী ও শ্বশুরকুলের মত এই সংসারের সকলকেও গ্রাস করিবে ইত্যাদি কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহারও বিশ্বাস হইয়াছিল, সে দাদার সংসারে ভয় ও ভ র স্বরূপই অবস্থান করিতেছে।

শ্যালকের কাছে রাইচরণ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল—কুসুমকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, ছেলে একটু বড় হইলেই কুসুম ফিরিতে পারিবে। কিন্তু শ্যালক রাজি হইলেও শালাজ প্রথমটা রাজি হইল না। মুখে অন্য কথা বলিলেও অপোগণ্ড সন্তান-পরিবৃত সংসারে কুসুম তাহার যন্ত্রণার কতখানি লাঘব করিত সে তাহা ভাল রকমেই জানিত। কুসুম চলিয়া গেলে তাহার দুর্দশার অবধি থাকিবে না। শ্যালকের উত্তর শুনিয়া রাইচরণ দমিয়া গেল, এবং একদিন শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গরুর গাড়ি সহযোগে শ্যালকের গৃহে দর্শন দিয়া অন্তত এক বৎসরের জন্য কুসুমের সহায়তা প্রার্থনা করিল। রাইচরণের বিশ্বাস ছিল যে, তাহার ও শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া শ্যালকের মন গলিবে। শ্যালক ও শ্যালক-পত্নীর মন গলিল কি না বুঝা গেল না বটে, কিন্তু কুসুম দিদির কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। গরুর গাড়ির ভিতর হইতে সেই যে সে দিদির অনেক বয়সের অনেক আদরের ও অনেক পূজা-মানতের ফল এই কাঁটাটুকুকে কোলে তুলিয়া লইল, আর তাহাকে কোল

হইতে নামাইতে পারিল না। তাহার শূন্য মরুময় জীবনে এই শিশুটি যেন অমৃতবর্ষণ করিল। শৈশবে কখন তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কখন সে নারীর চরম দুর্ভাগ্য বৈধব্য বরণ করিয়াছিল, এসব তাহার স্মরণেই ছিল না। তবে তাহার নিরাভরণ দেহ, পাড়হীন বসন ও সিন্দুরহীন সিঁথি, সে অন্য পাঁচজনের অপেক্ষা যে ভিন্ন কিছু, তাহা শৈশব হইতেই তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। তারপর উঠিতে বসিতে শাশুড়ী, মাতা-পিতা ও পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে বৈধব্যের জন্য সে খোঁটা খাইয়াছে, সকলে তাহার পোড়াকপালের দোষ দিয়াছে ; সে ইহার প্রত্যুত্তরে কথা খুঁজিয়া পায় নাই। গত জন্মের নিদারুণ পাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন এমনভাবে পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহার বলিবার আছেই বা কি ?

শৈশব ছাড়িয়া কৈশোরে, এবং কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনে সে পদার্পণ করিল কিন্তু তাহার অপরিপক্ক মনে কোনও বিকার আসিতে পারিল না, মনের গোপন কোণেও বিন্দুমাত্র রঙ ধরিল না, সে শিশুই রহিয়া গেল। দাদার সংসারে কাজের চাপে সে নিভৃতে নিজেকে যাচাইয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই, তাহার আর পাঁচজন সমবয়সী যে স্বামীদের লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করে, সে পারে না, ইহা বিচার করিয়া দেখিবার মত অবসরও সে পায় নাই। মনের পরিণতি না ঘটিলেও দেহে তাহার যৌবনের বান ডাকিয়াছিল, এবং ঘাটের পথে পাড়ার রসিক ছোকরারা সঙ্গীতে-ইঙ্গিতে সেটি তাহাকে বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল, কিন্তু সক্ষম হয় নাই। যৌবনের অপরূপ লাবণ্যহিল্লোল সর্বাঙ্গে মাখিয়াও কুসুম শিশু ছিল। দাদার সন্তানদের মানুষ করিবার ভার হাতে পাইয়াও বউদিদির অত্যাচারে সে মাতৃত্ব অনুভব করে নাই। দিদির পুত্রটিকে কোলে পাইয়া সে সহসা শৈশব হইতে অনেক ধাপ প্রমোশন পাইয়া একেবারে মা হইয়া বসিল। যে সঙ্কোচ সে এতকাল মনের মধ্যে অহরহ অনুভব করিতেছিল তাহা যেন কোথায় মিলাইয়া গেল, সে দাদা ও বউদিদির সামনে বিশেষ জোরের সহিত গিয়া বলিল যে, ভগিনীপতির সহিত সে যাইবে—বলিয়া, দিদির পুত্রটিকে বুকের কাছে লইয়া চুমু খাইল। দাদা বলিল, বটে ! আচ্ছা।—কুসুম চলিয়া যাইতেই তাহার বউদি তাহার এই অকারণ শিশুপ্রীতি দেখিয়া এমন একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিল যে স্বামীর কাছেই সে ধমক খাইল।

কুসুম রাইচরণের সহিত চলিয়া গেল। সেই যে তেইশ বৎসর বয়সের

সময় সে রাইচরণের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহার পর সে প্রৌঢ়া হইল তবু দাদার গৃহে আর ফিরিতে পারে নাই, রাইচরণের শিশু তাহাকে এমনিভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। পেটে না ধরিলেও সে এক মুহূর্তের জন্যও আর ভাবিতে পারে নাই যে, কেষ্ট তাহারই সন্তান নয়।

কেষ্টর প্রতি স্নেহ ছাড়াও দাদার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে আর একটি প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। রাইচরণের সহিত তাহার একটা কুৎসিত ঘনিষ্ঠতার কথা দিদির শূন্য গৃহে পদার্পণ করিবার অল্পদিনের মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। নিন্দুকেরা যেন ইহার জন্য ওত পাতিয়া ছিল। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এতবড় কলঙ্কের কথা শুনিয়াও রাইচরণ বা কুসুম কখনও ইহার প্রতিবাদ করে নাই। রাইচরণ তাহার দোকানের গণ্ডীর মধ্যেই ডুব মারিল এবং কুসুম কেষ্টকে বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঘরের কোণ আশ্রয় করিল—পারতপক্ষে ঘরের বাহির হইত না।

বস্তুতঃ নিন্দা উঠিবার এমন সহজ সুযোগ আর কোনও মানুষে দেয় নাই। বিপত্নীক হইলেও রাইচরণের বয়স এমন কিছু বেশী হয় নাই যাহাতে "সোমত্ত"বয়সী এই বিধবা শ্যালিকার সহিত একত্রবাস লোকে উপেক্ষা করিতে পারে। বাড়িতে এক কচি শিশু ছাড়া জনপ্রাণী থাকে না, এমত অবস্থায় অন্যায় কিছু না ঘটাই অন্যায়। লোকে বিশেষ বিশেষ দিন ও ঘটনার উল্লেখ করিতে পর্যন্ত ছাড়িল না—কে কি শুনিয়াছে, কে কি দেখিয়াছে, রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে তাহার শুনানি হইল। সমাজপতিরা আগুন হইলেন। গাঁয়ের গিন্নীবান্নীরা পুকুরঘাটে যথেষ্ট তোলপাড় শুরু করিলেন, ঘৃত এবং অগ্নিনামক পদার্থের পরস্পর সান্নিধ্য কি ভীষণ কুফলপ্রদ তাহার জ্ঞাত ও শ্রুত অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। এমনই করিয়া কুসুমের আগমন গ্রামের শান্ত জীবনযাত্রায় কিছু রঙ ধরাইয়াছিল বটে, কিন্তু নিন্দা কটূক্তি টিকিবার পক্ষে যে প্রতিবাদ ও ক্রোধ প্রকাশের প্রয়োজন, রাইচরণ বা কুসুমের দিক হইতে তাহার একটিও না আসাতে এক হাতে তালির মতই তাহা ক্রমশঃ নিঃশব্দ হইয়া আসিল।

এই নিন্দার প্রথম হিড়িকে রাইচরণ কিছু প্রমাদ গনিয়াছিল এবং কুসুমকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে শ্যালককে অনুরোধ করিয়া পত্রও দিয়াছিল। সে কোনও কারণ দেখায় নাই, কিন্তু এই নিন্দার ঢেউ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছাইতে বেশী সময়ও লাগে নাই। কুসুমের দাদা অনতিবিলম্বেই ভগিনীর

ভ্রষ্ট চরিত্রের কথা শুনিয়া রাগে গরগর করিতে লাগিল। স্ত্রী তাহাকে শুনাইয়া বলিল, কেমন, বলিয়াছিলাম্ কি না! তখন তো ভগ্নীর সতীপনা দেখিয়াছিলে! সুতরাং দাদার গৃহে কুসুমের স্থান হইল না, সে রাইচরণের আশ্রয়েই রহিয়া গেল। সেও কোনদিন মুখ ফুটিয়া অন্যত্র যাইবার কথা রাইচরণকে বলে নাই, কারণ কেষ্টকে ছাড়িয়া থাকিতে সে পারিবে না; নিন্দা সহিতে সে বরং প্রস্তুত আছে। রাইচরণও আর বিশেষ কিছু চেষ্টা করিল না। কানে তুলা গুঁজিয়া ও পৃষ্ঠে কুলা বাঁধিয়া সে গ্রামেই রহিয়া গেল। কুসুম চলিয়া গেলে কেষ্টকে মানুষ করিবে কে?

কেষ্ট কুসুমের আদর-যত্নে মানুষ হইতে লাগিল, এবং তাহাকেই মা বলিয়া জানিল। এদিকে গ্রামের নিন্দার বান কমিতে কমিতে রাইচরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল।

পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত কুসুমের হাতে সমর্পণ করিয়া রাইচরণ একদা সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার এই অকালমৃত্যুতে 'আহা' করিবার লোকও ছিল না। কুসুম কেবল শুদ্ধ হইয়া পিতৃমাতৃহীন সন্তানকে আঁকড়িয়া ধরিয়া গ্রামের মাতব্বরদের পায়ে ধরিয়া যথাকর্তব্য সম্পাদন করাইল।

কুসুমের দাদা ভগিনীপতির মৃত্যুসংবাদ এবং তাহার পরিত্যক্ত নগদ অর্থের সংবাদ একটু অতিরঞ্জিতভাবেই শুনিল। লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

একদিন সে হঠাৎ রাইচরণের গৃহে দেখা দিল। সকলকে বলিল, মায়ের পেটের বোনকে সে ফেলিবে কি করিয়া, তা সে যতই কেন—ইত্যাদি।

রাইচরণের শ্যালক যাহাই শুনিয়া থাকুক, মৃত্যুর সময় রাইচরণ কুসুমের হাতে নগদ পাঁচ শত টাকার কিছু অধিক ধরিয়া দিয়া বলিয়াছিল, কেষ্টকে যেন এই অর্থে সে লেখাপড়া শেখায়। জমিজমা ও দোকানঘর বিক্রয় করিয়া বিধবার ও শিশুর ভরণপোষণ চলিয়া যাইবে—ইহাও সে বলিয়া গিয়াছিল। অশ্রুসজলচক্ষে ভগিনীপতির মৃত্যুশয্যায় কুসুম বলিয়াছিল, যেন মৃত্যুকালে কেষ্টর জন্য সে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে। সে জীবিত থাকিতে কেষ্টকে কোন দুঃখ পাইতে দিবে না, তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবে। দাদার কথাবার্তা শুনিয়া তাহার গোপন মতলব বুঝিতে কুসুমের বিলম্ব হইল না। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল যে, রাইচরণের ভিটা ছাড়িয়া সে কোথাও এক পা নড়িবে না। অনুনয়

বিনয় উপরোধ ক্রোধে কোনও ফল হইল না, অভিশাপ দিতে দিতে দাদা প্রস্থান করিল।

তাহার পর হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুকে লইয়া এই নারী কায়ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছিল। এখানে-ওখানে কাজে-অকাজে সাহায্য করিয়া যাহা জুটিত, তাহাতেই কোনও রকমে দুইজনের পেট চলিত, দোকান-ঘরখানি বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থ হাতে আসিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিয়া এই বিধবাকে সাহায্য করিতে লাগিল। কেষ্টকে লইয়া সুখে-দুঃখে কুসুমের দিন যাইতে লাগিল। কেষ্টকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল, সমাজপতিদিগের তরফ হইতে কোনও বাধা আসিল না। কেষ্ট দিনে দিনে বড় হইতে লাগিল। লেখাপড়াতে তাহার খুব মনোযোগ, রাইচরণ ও দিদিকে স্মরণ করিয়া কুসুম মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ও চোখের জল ফেলিত।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন, যে দিক হইতে বিপদের কোনও আশঙ্কা না করিয়া কুসুম নিশ্চিন্ত ছিল, বিপদ আসিল সেইদিক হইতেই। কেষ্টর হাতেই কুসুম আঘাত পাইতে লাগিল বেশি। কুসুম গোপনে অশ্রুবিসর্জ্জন করে ও আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। এ কথা কাহাকেও বলিবার নহে।

কেষ্ট কুসুমের আদর-যত্নে বাড়িতে লাগিল, সকল বিষয় বুঝিয়া দেখিবার মত বুদ্ধি তাহার হইল। সে কুসুমকে মা বলিয়াই জানিত ও ভক্তি করিত, কিন্তু অকারণে আগুন জ্বালাইবার লোকের অভাব পৃথিবীতে নাই। কে একদিন নির্ম্মমভাবে বালককে বুঝাইয়া দিল যে, কুসুম তাহার মাতা নহে। তাহার পিতার রক্ষিতা মাত্র। রক্ষিতা বলিতে কি বুঝায়, বালক কেষ্ট তাহা ঠিক না বুঝিলেও মর্মান্তিক আঘাত পাইল। তাহার মনে হইল, কুসুম এতদিন অকারণে তাহাকে ঠকাইয়াছে। একজন দুইজন করিয়া অনেকেই এখন এ কথা তাহাকে শোনায় এবং অতিরঞ্জিত করিয়াই শোনায়। কুসুমের প্রতি তাহার পিতার অবৈধ প্রীতিই যে তাহার মাতার মৃত্যুর কারণ, এমন কথাও কেহ কেহ তাহাকে বুঝাইল। দশ বৎসরের বালক পিতার রক্ষিতার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

ইহার পর হইতে কুসুমের আদর-যত্ন কেষ্টর বিষবৎ মনে হইত। তাহার শিশুমনের উপর এই অস্পষ্ট কানাঘুষাগুলি অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। যাহাকে সে মাতৃ-জ্ঞানে ভক্তি করিয়াছে, আদর-আবদারে যাহার চিত্তকে ভরাইয়া রাখিয়াছে, তাহাকেই এখন সে ডাইনী রাক্ষসী ইত্যাদি

বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। কেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে—রাইচরণের এই মৃত্যুকালীন বাসনা কুসুম অহরহ স্মরণ করিত; এই লেখাপড়াতেই কেষ্টর শৈথিল্য লক্ষিত হইল। নানাদিকের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার শিশুচিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল।

তাহার সমবয়সীরা তাহাকে সামনে পিছনে উপহাস করে, কুসুমের সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করে—কেষ্ট কুসুমের প্রতিই ইহাতে ক্রুদ্ধ হয়। তাহার জন্যই তো তাহার এই অপমান! সেও বন্ধুদের সহিত যোগ দিয়া কুসুমের নিন্দা করে।

যে মাতার কাছে ফিরিবার জন্য আগে আগে কেষ্ট উতলা হইত এখন সেই বাড়িই তাহার কাছে অত্যন্ত হেয় বলিয়া মনে হইল। সে বাড়ি হইতে দূরে দূরে ফিরিতে লাগিল, গ্রামের নষ্ট-দুষ্ট-প্রকৃতির ছেলেদের সহিত মিশিয়া নানাপ্রকার ছোট কাজ করিতেও আর দ্বিধা বোধ করিল না। কুসুম কাঁদিয়া আকুল হইল।

কুসুম মুখ ফুটিয়া কেষ্টকে কিছু বলিতে পারে না। আজ এতকাল যে চুপ করিয়া সকল অপবাদ সহ্য করিয়া আসিয়াছে, আপনার সন্তানের সহিত সে তাহার কি বিচার করিবে? যাহাকে কোলে লইয়া এই অসহায়া নারী পৃথিবীর সমস্ত অপমান তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারই অপমান তাহাকে মর্মান্তিক আঘাত করিল। নিরুপায় নারী ইহার কোনও প্রতিকারের উপায় কল্পনা করিতে পারিল না।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় কেষ্ট বাড়ি আসে না, কুসুম তাহাকে খুঁজিতে বাহির হয়। কোনও রাস্তায় যদি তাহার সাক্ষাৎ মিলে বন্ধুদের সম্মুখেই কেষ্ট তাহাকে অপমানে জর্জরিত করে। কখনও কখনও দুই-একদিনের জন্য কেষ্টর খোঁজ পাওয়া যায় না। কুসুম কাঁদে, নিরাহারে বিনিদ্র রজনী যাপন করে।

কেষ্টর বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু পড়াশোনায় সেই যে ভাটা পড়িয়াছিল, আর জোয়ার আসিল না। রাইচরণের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল। কেষ্ট পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল এবং একদিন কোনও সমবয়সী বন্ধুর প্ররোচনায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হইল। কুসুম চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

অপরিণতবয়স্ক বালক কলিকাতার মত আজব শহরে কি করিয়া দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন সংস্থান করিবে, হয়তো না খাইতে পাইয়াই মারা যাইবে—

ইত্যাদি নানা সম্ভব অসম্ভব কল্পনায় কুসুম পীড়িত হইত। গাড়িঘোড়া, গুণ্ডা পুলিস জুয়াচোর কত রকমে লোকের সর্বনাশ ঘটিয়া যায়। প্রবীণ লোকেরাই নির্বিঘ্নে সেই ভয়ঙ্কর শহর হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না—সেই দুধের ছেলে কি করিয়া বাঁচিবে! হাতে তাহার একটিও পয়সা নাই! তাহার পিতার উপার্জিত এবং তাহারই শিক্ষাবাবদ সযত্নে রক্ষিত প্রায় ছয় শত টাকা কুসুমের নিকট রহিয়াছে, অথচ সে কলিকাতার পথে হয়তো অন্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে—এ চিন্তা কুসুমের অসহ্য হইল।

যে ছেলেটির সঙ্গে কেষ্ট কলিকাতা গিয়াছিল, কুসুম একদিন তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া কেষ্ট প্রভৃতির খবর জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা কোনও সন্ধান জানে না। হতাশভাবে কুসুম ঘরে ফিরিল।

কলিকাতা-প্রত্যাবৃত্ত রায়েদের বড় ছেলের মুখে একদিন কেষ্টর খবর পাওয়া গেল। কলিকাতার কোনও হোটেলে চাকরি লইয়া কেষ্ট নাকি বহুকষ্টে জীবনযাপন করিতেছে। কুসুম সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া রায়েদের ছেলের সহিত একদিন দেখা করিয়া কেষ্টকে এই কথা বলিতে অনুরোধ করিল, সে যেন গ্রামে ফিরিয়া তাহার ছয় শত টাকা বুঝিয়া লয় ও তাহা দ্বারা গ্রামেই হউক যেখানেই হউক একটা দোকান খুলিয়া নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। বাবুটি স্বীকৃত হইলেন।

হায় রে, কুসুমের কত আশাই না ছিল। কেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে, বউ ঘরে আসিবে, তারপর নাতি-নাতিনীদের লইয়া তাহার জীবন কিরূপ ভরিয়া উঠিবে—এই সব কল্পনা সে প্রায় করিত। এখন কুসুম আকাশ-কুসুম রচনা করিতেও ভরসা পায় না।

একদিন হঠাৎ কেষ্ট গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। নিজের বাড়িতে সে উঠিল না। তাহার সেই বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় লইল, কুসুমের সহিত দেখা করিয়া তাহার পাওনা টাকার দাবি করিল। কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল, তাহার টাকা তাহারই আছে। সে আপনার ঘর-সংসার বুঝিয়া লউক, এই বৃদ্ধ বয়সে পরের বোঝা আগলাইতে আর সে পারে না। কেষ্ট সমস্ত বুঝিয়া লইলে সে সেখানে থাকিবে না, যেমন করিয়াই হউক অন্যত্র সে পোড়া পেটের ব্যবস্থা করিবে।

কেষ্ট বলিল, বেশ্যার বাড়িতে সে থাকিতে পারিবে না। কুসুম শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, এতটা সে প্রত্যাশা করে নাই। গ্রামের সমাজপতি গৃহিণী-

বউঝিয়েরাও যে কথা তাহাকে বলিতে পারেন নাই, আজ কেষ্ট কিনা সেই কুৎসিত কথা উচ্চারণ করিল! তাহার চক্ষে অশ্রু শুকাইয়া গেল। সে আর একটিও কথা না বলিয়া বহুদিনের সযত্নরক্ষিত কেষ্টর শিক্ষার খরচ প্রায় ছয় শত টাকা কেষ্টর হাতেই গুনিয়া দিল। কেষ্ট কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

কুসুম এবার কাঁদিতে বসিল, তাহার দিদিকে স্মরণ হইল, রাইচরণের কথা মনে পড়িল। হায় রে অতীত! হায় রে ভবিষ্যৎ! আমৃত্যু এই শূন্য কুটীরে সে একলা কাটাইবে কি করিয়া? স্মৃতির বৃশ্চিকদংশনে সে পাগল হইয়া যাইবে। যে কেষ্টকে এতকাল বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিল, সে তাহাকে চরম অপমান করিতেও দ্বিধা করিল না।

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও কুসুম মনকে দৃঢ় করিতে পারিল না, কেষ্টর কথা ভাবিয়া সে আকুল হইল। গ্রামের প্রত্যেকের কাজে সে এখন যথাসাধ্য সাহায্য করে, সকলে তাহাকে কেষ্টর মা বলিয়াই খাতির যত্ন করে। তাহার পূর্ব ইতিহাস কেহ মনে রাখে নাই—শুধু নিঃসঙ্গ রাত্রির অবসরে কেষ্টর সহিত শেষ সাক্ষাতের দিনের কথাগুলি তাহার মনে আগুনের মত জ্বলিতে থাকে। তাহার দুঃখে এখন সকলেই সহানুভূতি দেখায়। পাড়ার প্রবীণা গৃহিণীরা বলেন, "আহা, ছেলেটা কি পাষাণ গা, মাগীকে এত কষ্টও দেয়!"

কেষ্ট টাকা লইয়া সেই যে গিয়াছে আর তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, তাহার কোন খোঁজও কেহ দিতে পারে নাই। কলিকাতায় যাহাদের যাওয়া-আসা আছে, কুসুম তাহাদের কাছে ঘোরাফেরা করে, কেহ কোনও সন্ধান দিতে পারে না।

* * * *

একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল। কেষ্টর সন্ধান পাওয়া গেল না। কুসুম দারুণ রোগে শয্যাশায়ী হইল। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে সে কেবল কেষ্টর কথা বলিতে লাগিল, তাহাকে দেখিতে চাহিল। গ্রামের ভদ্রঘরের গৃহিণীরা তাহার রোগের সময় তাহাকে দেখিতে আসেন; প্রত্যেকেই যথাসাধ্য এই নিঃসঙ্গ নারীর সেবা করেন, কিন্তু তাহার হাহাকার কেহ ঘুচাইতে পারেন না। কেষ্টর কথা ছাড়া তাহার মুখে অন্য কথা নাই। তাহার একমাত্র কামনা যেন কেষ্ট তাহার মুখাগ্নি করে, সেই কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে সকলকে জানায়। কিন্তু রাইচরণের শেষ ইচ্ছার মত তাহারও শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। পাড়া-প্রতিবেশিনী-পরিবৃত হইয়া কুসুম একদিন প্রাণত্যাগ

করিল, কিন্তু কেষ্ট আসিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিল না—সে কোথায় রহিল কেহ জানিতেও পারিল না।

কেষ্টর মার কথা এখন সকলে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। কেষ্টও সেই হইতে আর গ্রামে দর্শন দেয় নাই। শুধু বৃদ্ধা রায়-গৃহিণী এখনও মাঝে মাঝে কেষ্টর মায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কেষ্ট ফিরিলে তাহাকে দিয়া কুসুমের নামে গয়ায় পিণ্ড দেওয়াইবেন। তাহাতেই হয়তো পরলোকে এই দুর্ভাগিনীর আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে।

১৩৩২

রিক্‌শাওয়ালা

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে। সকাল হইতেই থাকিয়া থাকিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া জনসঙ্কুল শহরের দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। পথিকেরা আকাশের খামখেয়ালিপনায় বিরক্ত হইতেছিল; পথ চলিতে চলিতে বৃষ্টি নামে; কোন বাড়ির গাড়িবারান্দায় আশ্রয় লইয়া তাহারা কোন রকমে একটু মাথা বাঁচাইয়া লয়; বৃষ্টি ধরিয়া আসে। ভরসা করিয়া গাড়ি-বারান্দার আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা যেমনই একটু অগ্রসর হয় অমনই আবার এক পসলা বৃষ্টি শুরু হয়।

সমস্ত দিন মেঘ করিয়া ছিল, একটানা না হইলেও বৃষ্টির বিরাম ছিল না। তবুও কেমন একটা গুমোট গরমের ভ্যাপসানিতে কলিকাতার সিক্তসন্ধ্যা থমথম করিতেছিল। এমন দিনে সাধারণতঃ কেহ ঘরের বাহির হয় না। নেহাত প্রয়োজনে ছোট ভাই বিনোদকে সঙ্গে লইয়া স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরিয়া কুমারটুলী অভিমুখে চলিতেছিলাম। তখন বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছে। শীকর-ভারাক্রান্ত বায়ুস্তর ভেদ করিয়া গঙ্গার ওপারের কারখানাগুলির আলো মাতালের চোখের মত ঘোলাটে দেখাইতেছিল; ল্যাম্প-পোস্ট ও টেলিগ্রাফ পোস্টগুলির গায়ে কিংবা টেলিগ্রাফের তারে তারে সঞ্চিত জলের উপর গ্যাসের আলো পড়িয়া চকচক করিতেছে। পথে লোকজন বা যানবাহনাদির বিশেষ বালাই ছিল না; ক্বচিৎ কদাচিৎ একআধখানা ট্যাক্সি কিংবা ছ্যাকরা গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে কাদা ছিটাইয়া ছুটিতেছিল;—দূরে একখানা রিক্‌শা ঠুনঠুন ঘণ্টা বাজাইয়া মন্থরগতিতে চলিয়াছে—পিছনের আলোটি চোখের সম্মুখে একটি লাল রেখা টানিয়া দিতেছে।

বৃষ্টির ভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিলাম। নিমতলা পার হইতেই বেশ সমারোহসহকারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একটি গাছতলা আশ্রয় করিয়া কোন রকমে মাথা রক্ষা করিতেছি। দেখি, সেই রিক্‌শাওয়ালা বিশেষ শ্রান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল। রিক্‌শাখানা খালি। রিক্‌শা-ওয়ালা সম্ভবত বহুদূরের সওয়ারী লইয়া তাহাকে গন্তব্য স্থলে পৌছাইয়া ফিরিতেছে।

বৃষ্টি থামিবার গতিক দেখিলাম না। তবু ভাল, একখানা রিক্‌শা পাওয়া

গেল। এই সামান্য পথটুকু—কয় পয়সাই বা দিতে হইবে! পরিশ্রান্ত রিকৃশাওয়ালা ততক্ষণে মুখ মাথা মুছিয়া সুস্থ হইয়াছে। কষাকষি করিয়া দুই আনা ভাড়া স্থির হইল। বিনুকে উঠাইয়া দিয়া নিজে উঠিতে যাইতেছি, রিকৃশাওয়ালা বলিল, হুজুর, দুজনকে পারব না।

বলিলাম, সে কি রে, এই রোগা রোগা দুজন লোক, আর কতটুকুই বা রাস্তা!

আজ্ঞে না হুজুর, পারব না।

একটু আশ্চর্য হইলেও চটিয়া গেলাম। বলিলাম, দুনিয়াশুদ্ধ রিকৃশাওয়ালা দুজন তিনজন লোক নেয়। তুই ব্যাটা নিবি না কেন? অমন ষাঁড়ের মত শরীর তোর—

শকেগা নেহি বাবু।—বলিয়া সে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বৃক্ষতল ছাড়িয়া গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমন শক্ত-সমর্থ লোকের ব্যাকুলতাপূর্ণ 'শকেগা নেহি' শুনিয়া মনটা নরম হইল। তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা অদ্ভুত শঙ্কা ও কাতরতা মাখানো ছিল যে, আমার মন অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল।

বৃষ্টি আর গাছের পাতার আচ্ছাদন মানিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলাম। রিকৃশাওয়ালা তখন কিছুদূর চলিয়া গিয়াছে। হাঁকিয়া বলিলাম, দশ পয়সা দিব। সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল এবং পরমুহূর্তেই গাড়ি লইয়া দৌড়াইতে শুরু করিল।

বহুদূর হইতে রিকৃশাখানার ঠুনঠুন আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। পিছনের লাল আলোটি তখনও বর্ষাস্নাত অন্ধকার পথে একটি গতিশীল সিঁদুর-টিপের মত দেখাইতেছিল।

সিক্তদেহে পথে নামিয়া পড়িলাম। সেদিন শ্রাবণ-নিশীথিনীর গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া একটি কঠোর মুখের মলিন বেদনাকাতর দৃষ্টি আমার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল।

* * *

কিছুদিন পরের কথা। এল্‌ফিন্‌স্টোন পিক্‌চার প্যালেসে ছবি দেখিয়া একটি পরিচিত লোকের অপেক্ষায় হগ সাহেবের বাজারের কোণে দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ এক রিকৃশাওয়ালার সহিত দুই বিপুলকায় মাড়োয়ারীর বিশুদ্ধ হিন্দিতে বচসা হইতেছে শুনিতে পাইলাম। মাড়োয়ারীযুগলের গলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য একটু ঔৎসুক্য

হইল। কাছে গিয়াই দেখি, স্ট্র্যাণ্ড রোডের সেই রিক্‌শাওয়ালা। বচসার কারণ—সে তুইজনকে লইতে পারিবে না। ওই তুইটি বিপুলকায় বস্তাকে একসঙ্গে গাড়িতে উঠিতে দিতে যে কোনও রিক্‌শাওয়ালার আপত্তি হইতে পারিত এবং তাহাতে আশ্চর্য হইবার বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সেই লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। মাড়োয়ারী তুইজন অন্য যানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। রিক্‌শাওয়ালাকে পরীক্ষা করিবার কৌতূহল হইল। তাহার সহিত ভাড়া স্থির করিয়া তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলিলাম, আমার আর একজন সঙ্গী আছে। করুণ ভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে আমাকে অন্য গাড়ি দেখিতে অনুরোধ করিল—তুইজনকে সে লইতে পারিবে না। আমি এতদূর বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম যে, বন্ধুর অপেক্ষা না করিয়াই রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিলাম।

সেদিনও আকাশ ব্যাপিয়া মেঘ করিয়া আসিতেছিল ; ঘন ঘন মেঘগর্জন ও বিত্যুৎচমকে কলিকাতার চঞ্চল আকাশ স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আসন্ন তুর্যোগের আশঙ্কায় রাস্তায় লোক-চলাচল অনেকটা কম। রিক্‌শাওয়ালাকে তাড়া দিলাম, অবিলম্বে বৃষ্টি নামিবে, শীঘ্র বাড়ি পৌছানো চাই। জোরে টানিতে গিয়া রিক্‌শাওয়ালা গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিল ; অবাঁক হইলাম। আমার মত ক্ষীণকায় পুরুষকে টানিতে এতটা পরিশ্রম হইবার কথা নয়। আগের দিনের মত একটা অজানা অস্বস্তিকর অনুভূতি মনে জাগিতে লাগিল। অমন বিপুলকায় একটা লোক আমার মত একটি সামান্য বোঝাকে টানিতে পারিতেছে না, ইহার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। একটা অস্পষ্ট অলৌকিক ভয় মনকে পীড়া দিতে লাগিল।

বেচারার তুরবস্থা দেখিয়া মায়া হইল। শুধু বোঝা টানার পরিশ্রম ছাড়াও অন্য কোনও যন্ত্রণা তাহার হইতেছিল, তাহারও আভাস পাইতেছিলাম। নানা কল্পনা করিয়া কোনও কিনারা করিতে পারিলাম না। তাহাকে যথেচ্ছ রিক্‌শা টানিতে বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম। কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার যথেষ্ট ঔৎসুক্য হওয়া সত্ত্বেও চুপ করিয়া কি ভাবে কথাটা পাড়িব ভাবিতে লাগিলাম।

হঠাৎ চড়বড় করিয়া বৃষ্টি নামিল। রিক্‌শাওয়ালা চকিত হইয়া উঠিল। একটা বাড়ির গাড়িবারান্দার ধারে আসিয়া তাহাকে থামিতে বলিলাম।

দুজনে গাড়িবারান্দার নীচে আসিয়া মাথা মুছিয়া বৃষ্টি থামিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

রিক্শাওয়ালাকে একটা সিগারেট দিলাম। সে বিনীত সেলাম করিয়া সিগারেট লইয়া ফুটপাথের উপর উবু হইয়া বসিয়া সেটিকে ধরাইল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনের অদম্য কৌতূহল আমাকে ভিতর হইতে ঠেলা দিতে লাগিল, কিন্তু পাছে বেফাঁস কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলি—এই ভয় হইতে লাগিল। তাহার নাম কি, কোথায় থাকে, তাহার কে আছে, এগুলি বেশ সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম। তাহার নাম মকবুল, হাতীবাগানের বস্তীতে থাকে, এক বৃদ্ধা ফুফু ছাড়া তাহার কেহ নাই ; শিশু অবস্থা হইতেই সে পিতৃমাতৃহীন—ফুফুর হাতেই মানুষ হইয়াছে। বিবাহ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে সে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাবু, যে বোঝা তাহাকে নিরন্তর টানিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তাহা লইয়াই সে অস্থির—ইহার উপর জরুর বোঝা বহিতে সে অক্ষম। বলিলাম, বুড়ী ফুফু ছাড়া তাহার কেহ নাই, অথচ অহরহ বোঝা বহিতে হইতেছে, ইহার অর্থ তো বুঝিলাম না। মকবুল চুপ করিয়া রহিল। আমি তাহাকে চিন্তা করিবার অবসর না দিবার জন্য বলিলাম, একটা বিষয়ে আমার ভারী কৌতূহল আছে। কিছুকাল আগে নিমতলাঘাটের কাছে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, আজও দেখিলাম ; দুই দিনই সে একজনের অধিক সওয়ারী লইতে অস্বীকার করিয়াছে অথচ সে দুর্বল নয়। ইহার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তাহা হইলে—

মকবুল চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ হইয়া গেল। হাত দিয়া মাথার রগ টিপিতে টিপিতে সে বলিল, বাবু, সে বড় ভয়ানক কথা। যে কথা মনে হইলেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, তাহার বুকের তাজা রক্ত হিম হইয়া যায়, মুখে সে-কথা সে প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া ?

বলিতে বলিতে সে সভয়ে রিক্শাখানির দিকে চাহিল। কি যেন একটা ভয়াবহ কিছু দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া তেরপলের পর্দা দিয়া রিক্শাখানি মুড়িয়া ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। তখনও ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-ঝলকে কি যেন একটা অনন্ত রহস্যের ক্ষণিক আভাস মাত্র

পাইতেছিলাম ; জলভারাক্রান্ত বাতাস কলিকাতার পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া একটা একটানা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিতেছিল। রাস্তায় জনমানবের চিহ্ন ছিল না।

তাহাকে আর একটা সিগারেট দিয়া আমি তাহার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলাম। কি যেন একটা অজানা ভয়ে আমার মনও পীড়িত হইতে লাগিল। ব্যাপারটা আগাগোড়া এমন অস্বাভাবিক—মাঝে মাঝে সমস্তটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলাম ; কিন্তু সম্মুখে উপবিষ্ট রিক্‌শাওয়ালার অস্বাভাবিক-দীপ্তি-সম্পন্ন চোখ দুইটি আমার মনে এক অলৌকিক ভয় জাগাইতেছিল—আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

কিন্তু এভাবে বসিয়া থাকা চলে না, বাড়ি যাইতে হইবে। এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে বিস্তারিত না জানিয়াও যাওয়া যায় না। বলিলাম, মকবুল, এসব কথা ভাবিতে যদি তোমার কষ্ট হয় কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই—বৃষ্টি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে—এখন যাওয়া যাইতে পারে।

সজোরে আমার পা দুইটি চাপিয়া ধরিয়া অধীরভাবে সে বলিয়া উঠিল, আর একটু দাঁড়ান বাবু। যে-কথা তিন বছর ধরিয়া বলিবার জন্য আমি ব্যাকুল, অথচ কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, আজ আমাকে বলিতে দিন ; এ যন্ত্রণা আর সহিতে পারিতেছি না।

নিবিড় সহানুভূতিতে চিত্ত ভরিয়া গেল। ভুলিয়া গেলাম, আমি মকবুল অপেক্ষা সামাজিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ লোক ; তাহার সহিত এভাবে কলিকাতার রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আলাপ করাটা আমার পক্ষে হীনতাসূচক। সেই ব্যথাক্লিষ্ট মানুষটির গোপন কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

মকবুল অতি ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া হিন্দিমিশ্রিত বাংলায় যাহা বলিল এবং যাহা বলিল না—সবটুকু মিলাইয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাই ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি। মকবুল বলিল, বাবু, আমি আপনাকে ব্যাপারটা ঠিক বুঝাইতে পারিব কি না জানি না। ঘটনাটা এমন অসম্ভব আর এমনই ভয়াবহ যে, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু খোদার কসম বাবু, আমি একটিও মিথ্যা বলিব না। আমি আজ তিন বৎসর ধরিয়া এই গাড়িতে এক মৃতদেহের বোঝা টানিয়া বেড়াইতেছি। একজনের অধিক লোককে গাড়িতে তুলিয়া টানিতে পারিব কেমন করিয়া? আর একজন যে নিরন্তর আমার গাড়িতে বসিয়া আছে! তাহার নড়িবার শক্তি নাই। আমি তাহাকে বহন

করিয়া লইয়া ফিরিতেছি। ইহার হাত হইতে আমার নিস্তার নাই। মৃতদেহ পচিয়া ভারী হইয়া গিয়াছে; আমি অহরহ দুর্গন্ধে অস্থির হইতেছি। মৃতদেহের ভার টানিয়া টানিয়া আমার সবল দেহ জীর্ণ হইয়া আসিল—এই অদৃশ্য শবদেহের ভারে আমি জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, আমি আর বাঁচিব না বাবু।

মনে হইল, উপকথা শুনিতেছি; মনে হইল, কলিকাতার আবেষ্টনী ধোঁয়া হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—জনশূন্য মরুভূমির মাঝখানে আমরা দুইজনে পড়িয়া আছি। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আমার সমস্ত চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইল। আমি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম—

তিন বছর আগেকার কথা। সেদিন প্রবল বর্ষণে কলিকাতা শহর জলধারার আবরণে বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাত্রি নয়টা দশটার সময় আমি এই গাড়িখানা লইয়া হাওড়া স্টেশনে সওয়ারীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। সেখানে দুই-চারখান মাত্র গাড়ি ছিল, লোকের ভিড় ছিল না বলিলেই হয়—অমন দিনে সাধারণত কুকুর-বিড়ালেরাও বাড়ির বাহির হয় না। কিন্তু অভাব যাহাদিগকে পীড়া দেয়, তাহারা কুকুর-বিড়ালেরও অধম। আমি বিবাহ করিবার লোভে অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলাম। বহিঃপ্রকৃতির সহস্র বাধাও আমার সঙ্গিনীপিয়াসী মনকে দমাইতে পারে নাই। বিবাহ করিবার কি অদম্য স্পৃহা আমার ছিল বাবু, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না—নহিলে অমন দিনে মানুষে ঘরের বাহির হয় না। আজ বিবাহ করিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি আমার নাই; প্রতি মুহূর্তেই আমার শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিতেছে; আমি আর বেশীদিন বাঁচিলে পাগল হইয়া যাইব। শুধু ফুফুর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সে আমার এই অবস্থার কথা জানিতে পারিলে কষ্ট পাইবে।

মকবুল আবার চুপ করিল। যাহা শুনিতেছিলাম, তাহার পরিষ্কার ধারণা করিবার মত শক্তি আমার ছিল না। জলের ঝাপটা লাগিয়া সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল; অন্ধকার আকাশে তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে লাগিল।—কলিকাতার ঘরবাড়ি লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে; আকাশের নীচে গ্যাসের স্তিমিত আলোকে আমরা দুইটি প্রাণী এক অজানিত রহস্যলোকের দ্বার উন্মোচন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছি—

—সওয়ারী জুটিল দুইজন। প্রচুর ভাড়া চাহিলাম, তাহারা তাহাতেই স্বীকৃত হইল। দুইজনের কেহই প্রকৃতিস্থ ছিল না—একজন নেশায়

একেবারে চুর হইয়া ছিল, অন্যজনের তখনও হুঁশ ছিল। এই ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যেই বাগবাজার পর্যন্ত যাইতে হইবে।

সওয়ারী দুইজন ভিতরে বসিল। আমি ভাল করিয়া পর্দা মুড়িয়া দিলাম।

গঙ্গার ধারে ধারে সোজা উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম; দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা পানের দোকানে এক উড়িয়া বামুন সুর করিয়া কি পড়িতেছিল, রাস্তায় এখানে-ওখানে দুই-একজন লোক চলিতেছিল, গাড়িঘোড়া একেবারেই ছিল না। আমি নির্বিঘ্নে পথের মাঝখান দিয়া রিক্‌শা টানিয়া লইয়া চলিলাম। কুমারটুলীর কাছাকাছি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কতদূর যাইতে হইবে? উত্তর পাইলাম, সিধা চালাও।

আমার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। পরিশ্রমে আর ক্লান্তিতে চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। মনে হইতেছিল, আর টানিতে পারিব না। এমন সময়ে পর্দা ঠেলিয়া এক বাবু আমার হাতে পয়সা দিয়া এক বাক্স সিগারেট আনিতে বলিলেন। একটা গাছতলায় গাড়ি রাখিয়া সিগারেট আনিতে গেলাম। কাছাকাছি দোকান ছিল না। এদিক-ওদিক ঘুরিয়া একটি বিড়ির দোকানের সন্ধান পাইলাম। সিগারেট কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাঁকিয়া বাবুদের সিগারেটের বাক্সটা লইতে বলিলাম। কেহ উত্তর দিল না। ভাবিলাম, মাতাল বাবুরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তেরপলের পর্দা তুলিয়া সিগারেট দিতে গিয়া এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া মূর্ছিতপ্রায় হইলাম। বাবু, সেই মুহূর্ত হইতে আমার জীবনের সমস্ত শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে; কাহার পাপের বোঝা মাথায় লইয়া আমি আজ তিন বৎসর কাল প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ফিরিতেছি জানি না। আর কতকাল এ যন্ত্রণা সহিতে হইবে খোদাতালাই বলিতে পারেন।

সামান্য আলো আসিতেছিল; দূরে গ্যাস-পোস্ট। গাছের তলে বেশ একটু অন্ধকার, বৃষ্টির বিরাম ছিল না। পর্দা তুলিয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম, গাড়িতে একজন মাত্র লোক—মুখ বাঁধা, বুক দিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতেছে, সর্বাঙ্গ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। প্রাণ আছে বলিয়া মনে হইল না! কেমন করিয়া কি হইল প্রথমটা কিছু ঠাহর করিতে পারিলাম না, বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া আসিল। মনে বিষম ভয় হইতে লাগিল। চোখের সম্মুখে ফাঁসিকাষ্ঠের ভয়াবহ

দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে যে চাপিবে তাহাতে সন্দেহ নাই—আমার কথা কে বিশ্বাস করিবে ?

বুঝিলাম, অন্য লোকটি মুখ বাঁধিয়া ছোরার আঘাতে এই লোকটিকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে। তাহাকে ধরিবার কোনও উপায় নাই, তাহার চেহারাটাও মনে আসিল না।

লোকটা নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, তখনও গরম। ভাবিলাম, কোনও হাসপাতালে লইয়া যাই, চিৎকার করিয়া লোক জড়ো করি, কিন্তু সাহস হইল না। তাজা খুন দেখিয়া ভয়ে আমি তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য—আত্মরক্ষা করার কথাটাই আমার প্রথমে মনে হইল। সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া মৃত বা মরণাপন্ন দেহটি সেই বৃক্ষতলে ফেলিয়া রাখিয়া গাড়ি লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলাম।

কেমন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, কেমন করিয়া সেই রাত্রিতেই গাড়িখানি ধুইয়া মুছিয়া আস্তাবলে রাখিলাম, আমার কিছুই স্মরণ নাই। তারপরে সাত আট দিন ধরিয়া আমি দারুণ জ্বরে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ফুফুর মুখে শুনিয়াছি, সে কয়দিন আমি খুন রক্ত ফাঁসি ইত্যাদি নানা ভুল বকিয়াছিলাম।

সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পরও গাড়ি লইয়া বাহির হইতে সাহস হইতেছিল না, গাড়িখানির দিকে নজর দিতেও ভরসা পাইতেছিলাম না। কিন্তু পেট তো চালাইতে হইবে। আবার একদিন সকালে মনের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া গাড়িখানি বাহির করিতে গেলাম। গাড়িতে হাত দেওয়ামাত্র মনটা ছাঁত করিয়া উঠিল। রক্তের চিহ্নমাত্র ছিল না, তবু যেন রক্ত দেখিতে পাইলাম। মনের দুর্বলতা জোর করিয়া উড়াইয়া দিয়া গাড়ি লইয়া বাহির হইলাম। সওয়ারী জুটিল। মাঝে মাঝে গা ছমছম করিতেছিল বটে, কিন্তু দিনের আলোয় লোকের ভিড়ে সে ভাব বেশীক্ষণ মনে থাকিতে পায় নাই। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল, অন্যায় করিয়াছি—হয়তো লোকটা বাঁচিতে পারিত। বিপদের ভয় না করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ কোনও হাসপাতালে তাহাকে লইয়া যাইতাম হয়তো সে বাঁচিয়া উঠিত। লোকটা যদি মরিয়াই থাকে, নিজেকে তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে ভাবটাও কাটাইয়া উঠিলাম। কে জানে, পরের দিকে নজর দিতে গিয়া হয়তো মহা ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইতাম! বাঁচিবার নসীব থাকিলে সে এমনই বাঁচিবে!

এইভাবে নানা মানসিক দ্বন্দ্বে প্রথম দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

সমস্ত রাত্রি কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে কাটিল; ঘুমাইতে পারিলাম না। ভয় হইল, আবার বুঝি জ্বর হইবে। সেই রক্তাক্ত-দেহ মুখ-বাঁধা লোকটিকে যেন চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম। মাথা গরম হইয়াছে ভাবিয়া চোখেমুখে জল দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, ঘুমও আসিল। কিন্তু ভোরবেলায় আবার একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভীষণ ভয়ে ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া আমার কানে কানে বলিয়া গেল—তুই আমাকে খুন করিয়াছিস! আমি আল্লা নাম স্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

সেদিন গাড়ি লইয়া বাহির হইতে যাইব—মনে হইল কে যেন আমার পিছু লইয়াছে, পিছনের পথের উপর যেন রক্তের দাগ দেখিলাম। হায় আল্লা! এ কি হইল! কাহার পাপের বোঝা কাহার ঘাড়ে চাপাইলে তুমি! আমি যেখানে যাই, সেখানেই যেন কোনও অদৃশ্য কেহ আমার পিছু লইতে লাগিল। ভাবিলাম, আমি কি পাগল হইয়া গেলাম!

বুঝিলাম, আমাকে ভূতে পাইয়াছে। ওঝার কাছে গেলাম, সে অনেক ঝাড়ফুঁক করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—সে আমার পিছু ছাড়িল না।

মকবুল চুপ করিয়া গামছা দিয়া কপালের ঘাম মুছিল। আমার কাছে একটা সিগারেট লইয়া সেটা ধরাইয়া আবার বলিতে লাগিল—

দুই-একদিন পরে সন্ধ্যার সময় হেদুয়ার মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এমন সময়ে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য গাড়িখানা তেরপল মুড়ি দিতে যাইতেছি, দেখি পিছনে পিছনে কে যেন আসিতেছে! ফিরিয়া তাকাইলাম, কেহ নাই। তাড়াতাড়ি গাড়িখানা ঢাকিয়া বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা হইল। গাড়ির ছপ্পর হইতে পর্দাখানা ফেলিতে যাইব, দেখি গাড়ির ভিতরে সে বসিয়া—মুখ বাঁধা, বুক দিয়া রক্ত গড়াইতেছে! ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পর্দা ফেলিয়া দিয়া মূর্ছিতের মত সেখানে বসিয়া পড়িলাম।

আমার এই অদ্ভুত যন্ত্রণার কথা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব বাবু? আপনি কি বুঝিতে পারিবেন? গাড়ির ভিতর রক্তাক্তকলেবরে সে নিশ্চয়ই বসিয়া আছে। সেই হইতে আজ পর্যন্ত ওই গাড়িতেই বসিয়া থাকে সে;

আমার পিছনে আর তাহাকে দেখি না—সে নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ির ভিতরেই থাকে, আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়াই।

মকবুল চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ ওই ভাবে থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—

বাবু, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত ওই মড়ার বোঝা আমি টানিয়া ফিরিতেছি। একজনের অধিক সওয়ারী তাই আর টানিতে পারি না। মড়া পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে—আমাকে তাহাই সঙ্গে করিয়া ফিরিতে হইতেছে। অথচ আল্লার দোহাই বাবু, ওই লোকটার মৃত্যুতে জ্ঞানতঃ আমার কোনও অপরাধ নাই।

আমি ওই নিরক্ষর লোকটিকে কি সান্ত্বনা দিব! চুপ করিয়া রহিলাম।

—বাবু, বোঝা সব সময়েই বহিতে হয়, কিন্তু বর্ষারাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে ওই মৃতদেহ আমি দেখিতে পাই না। দেখিয়া দেখিয়া বোঝা টানিয়া টানিয়া অনেকটা সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও মাঝে মাঝে ভয় পাইয়া উঠি। ভিতরে ভিতরে আমার শরীর জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা আমি আর বেশীদিন সহ্য করিতে পারিব না।

এই গাড়িখানি ছাড়িয়া দিবার সামর্থ আমার নাই বাবু—এক অদৃশ্যশক্তি আমাকে ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছে, আমি তাহার কাছে সম্পূর্ণ শক্তিহীন। আজ তিন বৎসর ধরিয়া আমার এই ভীষণ কর্তব্য আরম্ভ হইয়াছে; কবে শেষ হইবে খোদাতালাই জানেন!

মকবুল উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে বাবু, আপনি গাড়িতে বসুন। আমি পরদিন তাহাকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিব কি না ভাবিতে ভাবিতে গাড়ির নিকট গেলাম। মকবুল মুখ ফিরাইয়া কম্পিত হস্তে পর্দাখানি তুলিয়া ধরিল। আমি ভিতরে বসিতেই সে পর্দাখানি ফেলিয়া দিয়া গাড়ি টানিতে শুরু করিল।

পর্দা-ফেলা অন্ধকার রিক্‌শাখানির ভিতর বসিতেই আমার গা ছমছম করিতে লাগিল। আমিও যেন আমার অত্যন্ত গা ঘেঁষিয়া এক অদৃশ্য রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম; একটা পচা দুর্গন্ধও নাকে আসিতে লাগিল। সভয়ে পর্দা তুলিয়া ফেলিয়া মকবুলকে রিক্‌শা থামাইতে বলিয়া বলিলাম, আমার বাড়ি বেশী দূর নয়, আমি হাঁটিয়াই যাইতে পারিব। রিক্‌শাখানির ভিতরে চাহিবার আর সাহস হইল না।

মকবুল বুঝিল। একটু শীর্ণ হাসি হাসিয়া গাড়িখানি তুলিয়া ধরিয়া মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। আমি সেখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। রিক্‌শাখানির দিকে চাহিবার সামর্থ পর্যন্ত আমার হইল না। বহুক্ষণ পর্যন্ত রিক্‌শাখানির ঠুনঠুন আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। সে-রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না।

১৩৩৩

টিংচার আয়োডিন

নারায়ণগঞ্জের এক সভায় বক্তৃতা দিতে আহূত হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়াও শেষ পর্যন্ত শারীরিক কারণে না যাওয়াই স্থির করিয়াছিলাম। সভার উদ্যোক্তাদের সেই মর্মে পত্র দিব, হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তিন শত সাঁইত্রিশ টাকা আট আনার একটা ইনসিওর্ড পত্র আমার নামে হাজির হইল। তাহাতে লেখা ছিল, "জগবন্ধু সেনকে নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে একসঙ্গে আই. এস-সি পাস করিয়াছিলাম। তুমি জেনারাল লাইনে পড়িতে থাক, আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হই। মধ্যে অর্থাভাবে যখন লেখাপড়ায় প্রায় ইস্তফা দিতে যাই, তুমি আমাকে আড়াই শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলে! তোমার সেই বদান্যতাই সেদিন আমাকে রক্ষা করিয়াছিল। তারপর যথারীতি ডাক্তারী পাস করিয়া বাহির হই কিন্তু সাক্ষাতের সুযোগ আর ঘটে নাই। ইচ্ছা করিয়াই দূরে ছিলাম, কারণ তোমার ঋণ শোধ করিবার মত সামর্থ কিছুদিন পূর্বেও আমার ছিল না। সম্প্রতি সে ক্ষমতা হইয়াছে। তোমার জয়যাত্রা আমি কলেজ-জীবন হইতে বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তুমি আজ যথেষ্ট যশ ও কীর্তি অর্জন করিয়াছ। নারায়ণগঞ্জ আসিতেছ এই সংবাদ পাইয়াই সেই প্রাচীন ঋণ আমার হিসাবমত সুদসহ পরিশোধ করিলাম। পাছে এখানে আসিলে এই সামান্য কয়েকটা টাকা আমাদের পুনঃ পরিচয়ের পথে মানসিক কোনও বাধার সৃষ্টি করে এই ভয়েই সাক্ষাতের পূর্বেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম। আমি তোমার পুরাতন বন্ধু, তুমি আমারই আতিথ্য গ্রহণ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। সভার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আমি সে বন্দোবস্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। আমি স্টীমার-ঘাটে উপস্থিত থাকিব। তাঁহারাও থাকিবেন। কবে আসিতেছ জানাইও। সাক্ষাতে অন্যান্য কথা হইবে। ইতি— তোমার

জগবন্ধু"

চমকিয়া উঠিলাম, মন সুদূর অতীতে চলিয়া গেল। জগবন্ধু সেন! তাহার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। রসিক বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। বাড়ি বিক্রমপুর। হাসি গল্পে গানে সে দীর্ঘকাল আমাদের বৈকালিক চায়ের আসর মাতাইয়া রাখিত। জীবনের পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ কবে সে

হারাইয়া গেল, কেন হারাইয়া গেল, তাহা লইয়া চিন্তা করিবার অবসরও ঘটে নাই। তাহার ডাক্তারী পাসের খবরটা শুনিয়াছিলাম, বাস্ সেই পর্যন্ত। সেই জগবন্ধু চিঠি লিখিয়াছে—শুধু চিঠি নয়, বিস্মৃত ঋণ সুদসহ পরিশোধ করিয়াছে! তাজ্জব ব্যাপার বটে।

মত পরিবর্তন করিতে হইল। জগবন্ধুর জন্যই নারায়ণগঞ্জ যাইতে হইবে—তাহার মূল্যবান আহ্বান উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

গেলাম। স্টীমার-ঘাটে ফুলমালা এবং জয়ধ্বনির মধ্যেই পুরাতন জগবন্ধুর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎকার ঘটিল—প্রশস্ত টাকের আড়ালেও পুরাতন মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। কোলাকুলি এবং সাদর আপ্যায়নে দীর্ঘদিনের অপরিচয় নিমেষে কাটিয়া গেল। নদীতীরবর্তী বন্ধুগৃহে সগৌরবে স্থান গ্রহণ করিলাম।

বেলা একটায় পৌঁছিয়াছিলাম, ছটায় স্থানীয় ম্যুনিসিপাল পাবলিক লাইব্রেরির হলে সভা বসিল, সুতরাং জগবন্ধুর সহিত প্রাচীন সম্পর্ক ঝালাইয়া লইবার সুযোগ ঘটিল না। সভার শেষে স্থানীয় একদল গরুড়ধর্মী ছোকরা ছিনে জোঁকের মত ছাঁকিয়া ধরিল, জগবন্ধু বিশেষ কৌশলে তাহাদের নাগপাশ এড়াইয়া আমাকে আমার আশ্রিত ঘরটিতে আনিয়া নিরিবিলিতে এক পেয়ালা চা দিয়া নিজেও এক পেয়ালা চা হাতে একটা জানালার উপর চাপিয়া বসিল। দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর আরাম পাইয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিলাম। কথায় কথায় কখন যে আলাপ জমিয়া উঠিল, দীর্ঘ বিশ বৎসরের ব্যবধান ঠেলিয়া দুই সহপাঠীতে যে আবার সেই ছাত্রজীবনের দায়িত্বহীন আবহাওয়ায় গিয়া পৌঁছিলাম, জগবন্ধুর কন্যা আসিয়া আহারের তাড়া দিতে তবে চটকা ভাঙিল। খাইতে খাইতে জগবন্ধু বলিল, তোমাকে আসল গল্পটা এখনও বলা হয় নি, আমার এই অবস্থা পরিবর্তনের কাহিনী খুব চমকপ্রদ না হলেও কৌতুকপ্রদ বটে। এই পরিবর্তন খুব অল্পদিনই ঘটেছে। ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরের মধ্যে। তার আগে পর্যন্ত যাকে সত্যিকার ভ্যারেণ্ডাভাজা বলে তাই ছিল পেশা। পৈতৃক বাড়িটা আর কিছু জমিজমা ছিল বলে কোনও রকমে ছেলেমেয়েগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। আজ অবিশ্যি স্বতন্ত্র কথা।

কৌতূহলপরবশ হইয়া উঠিলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া একটা ইজি-

চেয়ারে অর্ধশয়ানভাবে সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে জগবন্ধুর গল্প শুনিতে লাগিলাম।

রাত্রি তখন গভীর হইয়া আসিয়াছিল, নদীর ঘাটে একটা স্টীমারের বংশীধ্বনি আর্তহাহাকারের মত শুনাইতেছিল। পাশের রাস্তায় ঢাকাগামী মিলিটারী লরিগুলির সহর্নগতি-শব্দে নিশীথ অন্ধকার মুহুর্মুহু আলোড়িত হইতেছিল। এই সকল বিজাতীয় কোলাহলের অন্তরালে একটা অস্বাভাবিক নীরবতার আভাস পাইতেছিলাম। মনটা স্বতঃই দমিয়া যাইতেছিল। জগবন্ধুর কণ্ঠস্বর সেই অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে বিচিত্র শুনাইতেছিল। জগবন্ধু বলিতেছিল—

বললে খুব নিষ্ঠুর শোনাবে ভাই, কিন্তু একটা কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, যে-মহামন্বন্তরে বাংলাদেশের একপঞ্চমাংশ লোক উজাড় হয়ে গেল সেই মহামন্বন্তরই একদল লোককে শুধু যে বাঁচিয়ে রাখল তা নয়, অশোভন এবং অযাচিত দাক্ষিণ্যে তাদের অনেককে ঐশ্বর্য্যবিমণ্ডিত করে নতুন একটা অভিজাত-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করল। অধিকাংশই অর্ধশিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক—কণ্ট্রাক্টারি বা দালালি ছিল যাদের সাময়িক পেশা, অধিকাংশই অতি ভাগ্যবান, কেউ কেউ অতি বুদ্ধিমান শ্রেণীর। এই নতুন আভিজাত্যকে আমি নাম দিয়েছি নাইনটিনফর্টিথি অ্যারিস্টক্রেসি। ভাগ্যক্রমে আমিও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছি—তবে এখনও সাধারণ বুদ্ধিবলে সজাগ আছি বলে নিজেকে এদের থেকে তফাত করে ভাবতে পারি। পয়সা জমিয়ে যাচ্ছি বটে কিন্তু অ্যারিস্টক্র্যাট হতে পারি নি।

সারাদিনের ধস্তাধস্তির ফলে আমার ঘুম আসিতেছিল। বলিলাম, আসল জায়গায় এস জগবন্ধু, তোমার বড়লোক হওয়ার গল্প বল, না হয় আজকে "ক্রমশঃ" করে রাখ। ঘুম পাচ্ছে।

জগবন্ধু তটস্থ হইয়া উঠিল। বলিল, সেই ভালো, মুখে আর বলব না, কাল একেবারে চলচ্চিত্রের সাহায্যে তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করব। তুমি এখন ঘুমোও।

প্রস্তাব সমর্থন করিলাম। বিছানায় গা এলাইয়া দিতেই চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিল। তন্দ্রার মধ্যেই লক্ষ্য করিলাম, জগবন্ধু আমার মশারিটাকে ফেলিয়া আলো নিবাইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

স্বপ্ন দেখিলাম—ফারপো হোটেলে বড় সাহেব লাঞ্চ খাইতেছেন, সাহেবের

এক হাতে মদের পাত্র, অন্য হাতে নোটের তাড়া ; সাহেব হয়তো ডুপ্লিকেট-ট্রিপ্লিকেট বিল সহি করিবেন, অথবা আট টাকা দামের মশারির বিয়াল্লিশ টাকা মূল্য ধার্য করিয়া দিবেন। হাজরা রোডের বেশ্যাপল্লীতে বড় হল্লা, দিশী মেজরসাহেবকে সেখানে এণ্টারটেন করা হইতেছে—ফুলকপি ওলকপি শালগম বিলিতি বেগুন মটরশুঁটি অর্থাৎ ইংলিশ ভেজিটেব্‌লের ওজনে তিনি মণকরা দশ সের অনুগ্রহ করিবেন বশম্বদ দালালকে। দরিদ্র-সেবাব্রত ক্যাণ্টিনে দেখিলাম, কণ্ট্রোল দরে বরাদ্দ খাদ্যদ্রব্যের একদশমাংশ দরিদ্র-সেবায় লাগিয়া বাকিটা চোরাবাজারে চালান হইতেছে, দয়াদাক্ষিণ্যের আংশিক বিনিময়ে লাখোপতি ক্রোড়পতি হইয়া যাইতেছে। অন্যত্র দেখিলাম, আর্ত দুর্গতদের মধ্যে বিলি হইবার জন্য কম্বল গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি থরে থরে সজ্জিত থাকিয়া নমোনমঃ-দান-মহিমা ঘোষণা করিয়া প্রদেশান্তরে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রীত হইবার জন্য চালান হইয়া যাইতেছে। দেখিলাম, মন্ত্রী-পরিষদ-স্বজাতি বিড়িওয়ালারা রাতারাতি পারমিটবলে বড়মানুষ সৈয়দ হইয়া জুড়ি হাঁকাইতেছে। গোয়ালারা ওজনদরে গরু বেচিয়া জরু সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিলাম, হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহের ইট দিয়া দক্ষিণ-চব্বিশপরগণা, যশোহর ও খুলনায় বড় বড় গোলা নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে সারে সারে বস্তায় বস্তায় সজ্জিত হইতেছে চাল আর আটা, ইঁদুরে তছনছ করিতেছে কিন্তু চাল ও আটা খাইবার মানুষ নাই। একটা পচা দূষিত গন্ধ উঠিতেছে। সমন্ত্রী বাংলার লাট সাহেব নাকে রুমাল বাঁধিয়া লাঠি হাতে দুর্গন্ধের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই স্থান নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। কলিকাতার রাস্তায় লোক মরিলেই তাহাদিগকে লরিতে গাড়িতে বহন করিয়া লইয়া গিয়া নূতন গোলা নির্মিত হইতেছে, ওদিকে একদল লোক গড়ের মাঠে মরা মানুষকে লাটাই করিয়া নোটের ঘুড়ি উড়াইতেছে। সেখানে মহা কম্পিটিশন, মাড়োয়ারী মুসলমানে প্যাঁচখেলার ধূম লাগিয়া গিয়াছে। গড়ের মাঠের মধ্য দিয়া গঙ্গার দিকে যাইতে যাইতে এইরূপ নানা উপভোগ্য দৃশ্য দেখিতেছি, হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" ও "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি কানে আসিল। অগ্রসর হইয়া দেখি উটরাম ঘাটের জেটি অন্তর্হিত, গোটা নিমতলা ঘাটটা সেখানে হাজির হইয়াছে। সারি সারি কঙ্কাল পড়িয়া আছে এবং তাহাদেরই কণ্ঠ হইতে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি নির্গত হইতেছে। কাছে আসিতে ধ্বনি উচ্চতর হইল।

ঘুম ভাঙিতেই অনুভব হইল ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, রাস্তায় একদল লোক "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, এবং তাহাদের পিছনে পিছনে আর একদল "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ও "কংগ্রেস লীগ এক হও" বলিতে বলিতে আগাইয়া আসিতেছে। হঠাৎ স্মরণ হইল আজ ২৬শে জানুয়ারি, স্বাধীনতা-দিবসের প্রত্যূষে নারায়ণগঞ্জ স্টীমার ঘাটের সন্নিকটে আমার ঘুম ভাঙিয়াছে। জড়তা একেবারে কাটিয়া গেল, জাগিয়া বসিলাম।

পরদিন সন্ধ্যা। জগবন্ধুর ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি, সম্মুখে কলনাদিনী শীতললক্ষ্যা, জেটি স্টীমার গাধাবোট আর নৌকার ভিড়ে নিত্যচলমানা চঞ্চলাকে স্থির ও নিষ্প্রাণ মনে হইতেছে। রাস্তায় অসম্ভব ভিড়, জগবন্ধুর ডিস্পেনসারিতেও ভিড় কম নয়। অলসভাবে আগন্তুকদের দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটা বিষয়ে চকিত হইয়া উঠিলাম—জগবন্ধুর রোগীরা সকলেই প্রায় তরুণী, আসলে গ্রাম্য হইলেও বেশবাসে নাগরিক হইবার প্রয়াস আছে—সঙ্গে তরুণ অথবা প্রবীণ, যুবক অথবা প্রৌঢ় যাহারা আসিতেছে এক নজর দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম তাহারাই নাইন্‌টিন্‌ফর্টিথি অ্যারিষ্টক্রেসি। সাইকেল-রিকশা চাপিয়া গলায় রুমাল বাঁধা অবস্থায় সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে তাহারা আসিতেছে যাইতেছে—জগবন্ধুর ফুরসত নাই। তরুণীদের সকলেরই পীড়া শ্রীচরণে, জগবন্ধু জুতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে মোজা খুলিয়া ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়া প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিতেছে, কম্পাউণ্ডার হরিরাম ঘন ঘন "প্রবেশ-নিষেধে"র মধ্যে ঢুকিতেছে ও এক এক শিশি শোণিতাভ পদার্থ পরিবেশন করিয়া নোটমূল্য সংগ্রহ করিতেছে। খুবই কৌতূহল হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে জগবন্ধু হরিরামকে হুঁশিয়ার থাকিবার হুকুম দিয়া আমাকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইল, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিলাম তাহাদের লক্ষ্য স্থানীয় সিনেমা-হাউসটি এবং তৎসংলগ্ন একটি চা-খানা। চা-খানার সম্মুখবর্তী প্রান্তরে সারি সারি চেয়ার বেঞ্চ ও টেবিল পাতা হইয়াছে—প্রায় কোনটিই খালি নাই। অতিচঞ্চল ও অতিব্যস্ত "পরিস্থিতি"। ভাগ্যক্রমে পাশাপাশি দুইটি আসন সংগ্রহ হইল, দোকানের মালিক জগবন্ধুকে দেখিয়া অতি সম্ভ্রমভরে ছুটিয়া আসিল। বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনি? কি সৌভাগ্য আমার আজ! জগবন্ধু বলিল, হ্যাঁ, আমার এই বন্ধুটিকে তোমার 'কমরেড্ কাফে' দেখাতে আনলাম, নারায়ণগঞ্জে এ একটা দেখবার মত জিনিষ তো!

কি বল? বিগলিত মালিক—ওরে চা আন্, টোস্ট আন্, দুখানা চপ দি।—বলিয়া নিজেকে উচ্চকণ্ঠে জাহির করিতে লাগিল।

জগবন্ধুর মুখে হোটেলের নাম শুনিয়া প্রাচীর-গাত্রে স্বতঃই নজর গেল। ইংরেজি বাংলা উভয়বিধ অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা 'কমরেড্ কাফে'। সম্মুখেই প্রান্তর ঢালু হইয়া নদীতে নামিয়াছে। দেখিতে পাইলাম নদীগর্ভ হইতে দলে দলে বিচিত্রবেশা স্ত্রীপুরুষ হোটেল এবং সিনেমা অভিমুখেই আসিতেছে, মেয়েরা অধিকাংশই তরুণী। হাইহিল জুতায় অনভ্যস্ত তাহাদের চরণগতি ঠিক গজেন্দ্রনিন্দিত নয়, মরালগমন বলিলেও বলা যাইতে পারে। সংশ্লিষ্ট পুরুষেরা অধিকাংশই কোট-পাজামাধারী, কণ্ঠে টাইয়ের বদলে রুমাল।

আর তিল ধারণের স্থান নাই। জগবন্ধুর খাতিরে চা টোস্ট আসিতে বিলম্ব হয় নাই। চা খাইতে খাইতে কমরেড্‌দের দেখিতে লাগিলাম। "মার্কস্-এঙ্গেল্‌স্ ডবল মামলেট", "লেনিন ক্যাক্", "স্টালিন ড্যাভিল", "মলোটভ চপে"র আদেশ ঘন ঘন চতুর্দিকে উচ্চারিত হইতেছে। শ্রমিকেরা হঠাৎ ধনিক হইয়া গেলে যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইতেছে—ব্যয়ের দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, স্টাইলের প্রতি আকর্ষণই অধিক। "ক্যাক-ড্যাভিল-চপ" যাহারা খাইতেছে তাহাদের গুড়মুড়ির অভ্যাস তখনো সর্বাঙ্গে জড়ানো; এই আধুনিকতায় প্রচুর অস্বস্তি ভোগ করিতেছে তথাপি চাল ছাড়িতেছে না।

দেখিতে দেখিতে বিরক্তি ধরিয়া গেল, ডিস্পেনসারিতে ফিরিয়া আসিলাম। জগবন্ধু বলিল, এখন দু ঘণ্টা বিশ্রাম। এরা এর পরে সিনেমায় ঢুকবে, ইহুদীকা লেড়্‌কির স্বপ্ন দেখে বাড়ি ফিরবার পথে যখন খোঁড়াবে তখনই আমার প্র্যাকটিসের মরসুম। গোড়ায় একচোট হয়ে গেছে কিন্তু শেষের তুলনায় সেটা কিছু নয়। এদের এই আভিজাত্য-মোহই আমাকে এই দুর্দিনে টিকিয়ে রেখেছে ভাই। শুধু টেকানো নয়—বড়লোকও করেছে। এই ধারা নিত্যি চলেছে, বিরাম নেই। তুমি এই কাগজগুলোতে চোখ বুলোও, আমি ততক্ষণ ওষুধ তৈরি করে রাখি।

টিংচার আয়োডিন লেবেল আঁটা একটা বড় শিশি আসিল, পটাস পার্মাংগেনেটের বোতল আসিল, ম্যাজেন্টার মত একটা রঙও দেখিলাম—তিন বস্তুর মিক্‌শ্চার প্রস্তুত হইয়া বড় বড় বয়ামে টলটল করিতে লাগিল। আমি কাগজপাঠের অবকাশে আড়নয়নে সমস্ত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

মরসুম আরম্ভ হইল। বৈকালে যেমন দেখিয়াছিলাম ঠিক তেমনই, কিন্তু সংখ্যায় এবার অনেক বেশী। জগবন্ধু নিজে হেঁট হইয়া জুতা এবং কাহারও কাহারও মোজা খুলিয়া সযত্নে শ্রীচরণ পরীক্ষা করিয়া প্রেসক্রিপশন লিখিতেছে এবং হরিরামের তৎপরতায় বয়ামের লাল জল তলায় আসিয়া ঠেকিতেছে। এক টাকা মূল্যের কাগজে জগবন্ধুর হাতবাক্সটি ভরিয়া উঠিল।

রাত্রি নটা নাগাদ ফুরসত মিলিল। জগবন্ধু একটু সলজ্জ সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া বলিল, এই ১৯৪৩-এর আভিজাত্য আর টিংচার আয়োডিন এরাই আমার লক্ষ্মী সরস্বতী—সরস্বতীকে একেবারে বিশুদ্ধ রাখতে পারি নি, সংগ্রহ করা কঠিন। তাই পটাশ পার্মাংগেনেট আর ম্যাজেণ্টার সাহায্যে তাঁকে খাদে নামিয়েছি।

প্রশ্ন করিলাম, এরা তবু আসে?

উত্তেজিতভাবে জগবন্ধু বলিল, আসবে না? ব্যারামটা দৈহিক যতখানি তার চাইতে অনেকখানি বেশী মানসিক যে! সদ্যগজা কমরেডদের হাইহীল জুতোর দিকে লোভ আছে। নতুন অভ্যাসে পায়ে ফোসকাও পড়ে কিন্তু তার জন্যে ডাক্তারের শরণাপন্ন না হলেও চলত ওদের। কিন্তু সেই যে প্রথমে দৈবাদিষ্টের মত এই নতুন আভিজাত্যের পায়ে হাত দিয়েছিলাম—শিক্ষিত এম-বি পাস করা ডাক্তারের সেই চরণসেবা এদের মনে মোহের সৃষ্টি করেছে, এরা পয়সা দিয়ে পদসেবা নিতে আসে, চিকিৎসা করাতে নয়। আমিও "গ্রাজ" করি না—মা-লক্ষ্মী যখন চরণপথেই আসছেন, তাঁকে পায়ে ঠেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই নিরভিমান সাহসই আমাকে রক্ষা করেছে ভাই। তোমার ঋণ-পরিশোধের কাহিনী এই। টিংচার আয়োডিনে যতই ভেজাল থাক্‌, আমার এই নব-আভিজাত্য-পূজা কিন্তু "সিন্‌সিয়ার"। মা কালীর দিব্যি!

জগবন্ধুর ছোট চোখ দুটিতে যেন একটা হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল। হঠাৎ দীর্ঘকাল পূর্বের আমাদের সান্ধ্য চায়ের মজলিশের সেই জগবন্ধু সেনকে যেন দেখিতে পাইলাম—ক্ষণিকের জন্য। হরিরাম ততক্ষণ ক্যাশ মিলাইয়া নগদ সাড়ে বিরানব্বই টাকা জগবন্ধুর হাতে আনিয়া দিল। নেপথ্যে প্রশ্ন করিলাম, মূলধন?

জগবন্ধু একটু হিসাব করিয়া বলিল, পাঁচ টাকা দশ আনা। তবু আমার এই পায়ে হাত দিয়ে রোজগারকে ব্ল্যাক মার্কেটিং নিশ্চয়ই বলবে না, তা ছাড়া এদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। এরাই "স্টেডি" হয়ে একদিন আমাদের এই

মধ্যবিত্ত সমাজকে পুষ্ট করবে। আমি জানি এই পরিণামই কমরেডত্বকে চরম সর্বনাশ থেকে রক্ষা করবে। অনেক রাত হল, চল বাড়ি যাই। মেয়েরা হয়তো বসে আছে।

উঠিলাম। দূরে চাহিয়া দেখিলাম, 'কমরেড কাফে'র প্রান্তর-সভা তখনও ভঙ্গ হয় নাই, চাপা আলোতে দ্রুত ধাবমান দোকানের ছোকরাগুলিকে স্বপ্নলোকের জীব বলিয়া মনে হইল।

বৈশাখ, ১৩৫২

দি ওন্‌লি ওয়ে

মফস্বল হইতে আই. এ. পাস করিয়া কলিকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি হইলাম। শিল্প-বিদ্যায় স্বভাব-দক্ষতা ছিল, অল্পদিনেই পারদর্শী হইয়া উঠিলাম। মফস্বলের ছেলে, অন্যদিকে চালাক-চতুর হইতে দেরি হইতেছিল; শহুরে ছেলেদের সহিত তেমন প্রাণখোলা ঘনিষ্ঠতাও জমাইতে পারি নাই। সকালে মেসে বসিয়া মক্স করিতাম; দ্বিপ্রহরে স্কুলে বহু জাতি ও চরিত্রের সহপাঠী ও শিক্ষকদের সাহচর্যে সময় মন্দ কাটিত না, বৈকালটা লইয়াই গোলে পড়িতাম। ক্ষুধা পাইত প্রচুর কিন্তু ট্যাঁকের অনুপাতে খাদ্য যাহা জুটিত তাহাতে মফস্বলীয় পেট ভরিত না; চিড়িয়াখানায়, গঙ্গার ধারে, ইডেন গার্ডেনে, রেড রোডে অকারণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমণ-ডিসপেপসিয়া হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত সকল মুশকিলের আসান গোলদীঘিরই শরণাপন্ন হইলাম। বায়স্কোপ দেখার পয়সা ছিল না (শোনার নয়, কলিকাতায় তখনও টকির আমদানি হয় নাই), আজকালকার বহুখ্যাত লেকও তখন বাদা ও জঙ্গলে দুর্গম ছিল।

কলেজ স্কোয়ারে সত্যকার আরাম মিলিল। দুই পা চলিয়া এক একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়ি, আবার চলি; রঙ-বেরঙের লোকের বাক্য ও গতিভঙ্গি লক্ষ্য করি। প্রায়ই এক-আধটা চেনা মুখ চোখে পড়ে, লুপ্ত ও বিস্মৃত আলাপ জমিয়া উঠে। কোনও কোনও দিন দীঘির উত্তর ধারে রাষ্ট্রীয় রথীদের গরম গরম বক্তৃতা শুনিয়া প্রাণে বিচিত্র আশার সঞ্চার হয়। একই মানুষের বিবিধ মুখভঙ্গি স্টাডি করিবার সুযোগ পাইয়া আর্টিস্টের উপকার হয়।

হঠাৎ একদিন মতিলালের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল—দীঘির চারিধারে সে চরকির মত পাক দিয়া ফিরিতেছিল। গ্রামের স্কুল হইতে একসঙ্গে প্রবেশিকা পাস করিয়াছিলাম, সেখান হইতে সে পড়িতে আসে কলিকাতায়, আমি যাই মেদিনীপুর; দীর্ঘ চারি বৎসর পরে দেখা। তাহার চেহারায় একটু শহুরে রঙ ধরিয়াছে, মুখেচোখে নাগরিক দীপ্তি, কথায়-বার্তায় বিদগ্ধজনসুলভ প্রখরতা। আমার পিঠে সজোরে একটা থাবা মারিয়া মতিলাল বলিল, আরে মান্‌কে যে, তুই এখানে কোত্থেকে? করছিস কি?

বলিলাম। মতিলাল অনুকম্পার হাসি হাসিল। খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিল, নট্‌ ব্যাড, কিন্তু এ পথে সময় লাগবে।

আমি বিস্মিত হইলাম। মতিলাল কোন্ সহজ পথ ধরিয়াছে জানিতে ইচ্ছা হইল। প্রশ্ন করিলাম।

মতিলাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেই "দে-পাক"-সম্প্রদায়ের দুই চারিজন থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। মতিলালের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। উত্তেজিতভাবেই বলিল, হোয়াই, পলিটিক্স! ছাট ইজ দি ওয়ে। দেখবি?

সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলাম। মতিলাল আমাকে একরকম টানিতে টানিতেই দীঘির সদর গেটে উপবিষ্ট একজন "চানাচুর-বাদামভাজা"র কাছে লইয়া গেল এবং তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া তাহার কেরোসিনের কাঠের বাক্সটা তুলিয়া লইল। তাহার পিছন পিছন উত্তর ধারে সংস্কৃত কলেজের পিছনটায় গেলাম। স্পষ্ট বুঝিলাম চানাচুরওয়ালার সঙ্গে তাহার এই কারবার প্রথম নয়।

প্রধান সেনাধ্যক্ষের মত মতিলাল একবার স্থানটি পরিক্রমণ করিল এবং তারপর একস্থানে বাক্সটি রাখিয়া তাহার উপর উঠিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ক্রমাগত "ওই ওই" বলিয়া তারস্বরে চেঁচাইতে লাগিল। একটি দুটি করিয়া লোক জড়ো হইতে লাগিল এবং মতিলালের নির্দেশমত ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া শূন্য আকাশে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্নিকটবর্তী ব্যক্তির কাঁধ ঘেঁষিয়া "কি মশাই", "কি মশাই" প্রশ্নকারী পথিকের সমবায়ে স্থানটি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। আমার বিস্ময় তখন ভয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্বনাশ, পাগলের পাল্লায় পড়িলাম না কি? মুহূর্তকাল মধ্যে আমার সকল আশঙ্কা দূর হইল। দেখিলাম, সপ্রতিভ মতিলাল একবার হর্ষোচ্ছল চোখে সম্মিলিত বিরাট জনতার দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দম দেওয়া কলের গানের মত বজ্রনির্ঘোষে আরম্ভ করিল—ওই, ওই যে দেখছেন শূন্য নীলাকাশ, নিশীথের ঘনায়িত অন্ধকারে ওখানেই জল্‌জল্ করবে লক্ষ লক্ষ তারকা। এখন যেস্থান জনশূন্য, মুহূর্তকাল মধ্যে দেখতে পাবেন সেস্থান জনসঙ্কুল। আজ দেশের কাজে, দেশমাতৃকার সেবায় নামছেন না কেউই, কিন্তু এমন দিন আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি সেই শুভদিন সমাগত, যেদিন, আমাদের কবির ভাষায়—

'সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে।'

ঘন ঘন করতালি-ধ্বনিতে গোলদীঘি মুখর হইয়া উঠিল। মতিলাল জনতাকে হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়াছে; তাহারা তাহার কণ্ঠস্বরে ও আবেগে মাতিয়া উঠিয়াছে। আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। শেষ পর্যন্ত দেখিবার ধৈর্য রহিল না। চারিদিকে উৎসাহী জনতার বিসদৃশ চাপে ঘামিয়া উঠিলাম এবং অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিলাম।

ইহাই হইল প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা গেল, কাল—প্রাতঃকাল; স্থান—কলিকাতা, হ্যারিসন রোড; স্বেচ্ছাসেবক মতিলাল নগ্নপদে ঘাড় হেঁট করিয়া ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে চলিয়াছে; স্বেচ্ছাসেবিকারা তাহার অব্যবহিত পিছনে এবং তাহাদের পিছনে প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনায়কের শবদেহ—ফুল-মাল্যভারে প্রপীড়িত হইয়া জনসমুদ্রের মাথায় মাথায় চলিয়াছে। সেই ঐতিহাসিক শব-শোভাযাত্রায় সমস্ত কলিকাতা শহর যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম, এই ভিড়ের মধ্যে মতিলালের স্থান যেন একটু স্বতন্ত্র। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, সে রাস্তা করিতেছে। আগাইয়াছেও অনেক দূর।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য নেপথ্যে অভিনীত হইয়াছিল; সান্তাহারে বন্যাত্রাণ সমিতির ক্যাম্পে। হাফটোন ব্লকের সাহায্যে নরওয়েজিয়ান কাগজের উপর মতিলালকে অস্পষ্ট দেখিলেও স্পষ্ট চিনিলাম। মোটা স্ক্রীনের বাধা সত্ত্বেও বুঝিতে পারিলাম তাহার মুখেচোখে যেন বেদনা-সমুদ্রের বান ডাকিয়াছে।

ইহার পর আট বৎসরের খবর জানি না, আরও কয়টি দৃশ্যের অভিনয় হইয়া নাটকটি কোন্ অঙ্কে পৌছিয়াছিল বলিতে পারিব না। আমি দেশত্যাগ করিয়া সুদূর ত্রিবাঙ্কুরে মোটা মাহিনার চাকরিতে একটি সুবৃহৎ প্রস্তরমন্দিরের সংস্কারকার্যে গেলাম। নিজের কাজের মধ্যে এমনভাবেই ডুবিয়া থাকিতাম যে পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহার সংবাদ রাখার প্রয়োজনই বোধ করিতাম না। তবু বিংশ শতাব্দীতে বাতাসের মুখে খবর ছুটে; দেশের কথা এবং দেশকর্মী মতিলালের কথা দুইই একবার শুনিয়াছিলাম।

কলিকাতায় যখন ফিরিলাম তখন অসহযোগ আন্দোলন তৃতীয়বার আরম্ভ হইয়া সমাপ্ত হইয়াছে, ভোরের জ্বরো রোগীর মত দেশ শান্ত। এখানকার একটি বিখ্যাত শিল্প-বিদ্যালয়ে মোটা মাহিনার চাকরি পাইয়াছিলাম। আসিয়াই দীর্ঘকাল-অবহেলিত ছাত্রদের লইয়া পড়িলাম। অন্য কোনও দিকে নজর দেওয়ার সময় পাইলাম না। সংবাদপত্র আমি কোনকালেই পড়িতাম না, এখন একেবারেই পড়ি না।

সেদিন প্রাতঃকালে অয়েল-কালারে ওয়ালটেয়ারের সমুদ্র-সৈকতের একটা ছবি ফাঁদিয়াছিলাম। ক্যানভাসটা সবে একটু নীলাভ হইয়া আসিয়াছে হঠাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। দেশ-সেবার প্রসিদ্ধ আখড়া হইতে সম্পাদক শশিশেখরবাবু ডাকিতেছেন। এ যুগে শিল্পীরও স্বাধীনতা নাই—যাইতে হইল। একটি পোর্ট্রেট আঁকিবার অর্ডার—এই অর্ডারের অর্থ হুকুম। কাহার পোর্ট্রেট জানিতে চাহিলাম। ভক্তিগদগদ জবাব পাইলাম—মহাপ্রাণ স্বদেশরঞ্জনের; পূর্ণ এক বৎসর কারাবাস করিয়া মাত্র গতকল্য তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। নানাবিধ সংস্কারের দ্বারা তাঁহার কারাপুষ্ট মূর্তির পরিবর্তন ঘটিবার পূর্বে রঙে ও তেলে সেটিকে ধরিয়া রাখিবার হুকুম হইল আমার উপর। যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কাজ সারিতে হইবে। স্বদেশরঞ্জনের শরীর অসুস্থ, তিনি বেশীক্ষণ "সিটিং" দিতে পারিবেন না।

স্থান ও কাল সম্বন্ধে সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া রঙের দোকানে গিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কে জানে, হয়তো এই মূর্তি-চিত্রের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সত্য বলিতে কি, আমি একটু উত্তেজিতই হইয়াছিলাম।

নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। বৈঠকখানায় লোক গিজ-গিজ করিতেছে। কাহাকেও কাহাকেও চিনিতাম—তাহারা বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমাকে দেখিতে লাগিল। ভাবটা যেন এই—ভাগ্য ভাল তোমার, মহাপ্রাণ স্বদেশরঞ্জনও তোমার মুখ চাহিয়া কিছুকাল ঠায় বসিয়া থাকিবেন; আমাদের হিংসা হইতেছে।

ভিতরের একটি ঘরে গেলাম, সেই ঘরেই তিনি বসিবেন। এদিকে ওদিকে নানা বয়সের এবং রূপের মেয়েরা খুব উৎসাহ ও উত্তেজনার সহিত ঘুরিতেছেন ফিরিতেছেন—মহাপ্রাণ স্বদেশরঞ্জনকে লইয়া তাঁহাদের ভাবনা ও ছুটাছুটির অন্ত নাই। তাঁহারা স্বদেশরঞ্জনের আসন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চারিদিক দেখিয়া দরজা ও জানালা পথে আলোর গতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী স্থান নির্ধারণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম।

স্বদেশরঞ্জন আসিলেন। এইরূপ আসাকেই আগমন বলে। দুই হাতের ভর দুইটি তরুণীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ধীর পদে স্মিত হাস্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। চকিতে মনে হইল আমার চেনা মুখ, কিন্তু পরক্ষণেই আবক্ষলম্বিত দাড়ি ও আকর্ণবিশ্রান্ত গুম্ফ-শোভায় সকল পরিচয় ঢাকিয়া গেল। না,

ইঁহাকে কখনও দেখি নাই। খদ্দরের ধুতি পরিহিত, সর্বাঙ্গে খদ্দরের চাদর-আবৃত সৌম্যদর্শন মূর্তি—মাথায় গান্ধী টুপি।

স্বদেশরঞ্জন প্রথমেই আমাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করিলেন, কথা বলিলেন না। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। উৎসাহী ভক্তেরা ভিড় করিয়া এদিক ওদিক দাঁড়াইয়াছিল, আলোর ওজুহাতে তাহাদিগকে একপাশে সরাইলাম। স্বদেশরঞ্জনকে আমার নির্দেশমত মুখ চোখ নাক ঘুরাইতে হইতেছিল দেখিয়া ভক্তসম্প্রদায় সম্ভবত চটিতেছিল। দেখিলাম, ধীরে ধীরে তাহারা পাতলা হইয়া আসিল। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মহিলা টিকিয়াছিলেন; দেশপ্রাণ স্বদেশরঞ্জনের আহার্যের বিলম্ব হইতেছে সে কথা তাঁহারা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

স্বদেশরঞ্জনের মুখে কিন্তু বিকার নাই, প্রারম্ভের সেই স্মিত হাসি শেষ পর্যন্ত বজায় রহিল। এতটুকু অস্বস্তিবোধ পর্যন্ত করিতেছেন এরূপ বোধ হইল না।

আমার রঙ ও তুলির মহিমায় ক্যানভাসেও তখন স্মিতহাস্য ফুটিয়াছে। মহিলা রক্ষীবৃন্দ আশ্বস্ত হইয়া বোধ হয় আহার্যের ব্যবস্থা করিতেই গেলেন। আমি ঠোঁটের হাসি শেষ করিয়া চোখের তারায় হাত দিলাম।

আমরা দুটি প্রাণী, ঘরে আর কেহ নাই। ভুরুতে শেষ টান দিতে যাইব—হঠাৎ শুনিলাম, মাইরি মান্‌কে, আর পারি না, এবার ছেড়ে দে। বাপ্‌স্‌।

সম্মুখে বজ্র পতন হইলেও অধিক বিচলিত হইতাম না। মতিলালের কণ্ঠস্বর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, এবার চিনিতে বিলম্ব হইল না। মতিলালই বটে।

একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া মতিলাল বলিল, কি রে, চিনতে পারছিস না? দিস ইজ দি ওন্‌লি ওয়ে, দেখছিস তো?

অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না এবং ইহাও বুঝিলাম, এখানেই যবনিকা-পতন নয়। আরও দেখিতে হইবে।

কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারি নাই। পোর্ট্রেটটি শেষ হইল এবং চিত্রকরের নামও হইল কিন্তু আমি বাংলাদেশে আর থাকি নাই। সুদূর লাহোরে একটা সামান্য বেতনের চাকরি জুটাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। সেখান হইতেই কাহিনীটা পাঠাইতেছি।

আশ্বিন, ১৩৪৭

নামের আড়াল

নামের মাহাত্ম্য লইয়া নানা মুনির নানা মতভেদ আছে। এমন কি, এক মুনিরও অবস্থাভেদে ভিন্ন মত। যেমন ধরুন মহাকবি শেক্সপীয়র জুলিয়েটের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন (রোমিও-জুলিয়েট, ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) :

নামে বল কিই-বা আসে যায় ?
গোলাপ নামে আমরা যারে ডাকি,
অন্য কোনও নাম সে যদি পায়
তেমনি মধুর গন্ধ দেবে নাকি ?

তিনিই আবার 'ওথেলো' নাটকে ইয়াগোর মুখ দিয়া (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) বলিতেছেন :

টাকার থলি করবে চুরি ? তুচ্ছ তাহার দাম,
আজ যা' আমার কাল তা তোমার, হাজার পরিণাম !
সত্যি মোরে গরীব করে যে নেয় কেড়ে নাম ॥

এখানে নাম অবশ্য সুনাম। এইরূপ সুনাম বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি অসীম জোয়ার্দারের ছিল। এবং এই নামের গুণেই আকৃষ্ট হইয়া ভারতখ্যাতা ঔপন্যাসিক অশ্রুমালা দেবী স্বেচ্ছায় তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে এই রকম মাণিক-জোড় দম্পতি খুঁজিলে ইংলণ্ডে দুই জোড়া মাত্র পাওয়া যায়—রবার্ট ও এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এবং লিওনার্ড ও ভার্জিনিয়া-উল্‌ফ।

কবি অসীম জোয়ার্দার অতিশয় কুনো ছিলেন ; যদিও জাপানের সাকুরা এবং আলপ্‌সের রডডেনড্রন-পুষ্পগুচ্ছ ছাড়া তাঁহার কাব্য এক পাও অগ্রসর হইত না, আসলে কিন্তু তিনি ল্যান্সডাউন রোডের দুধারী কৃষ্ণচূড়া ও গোল্ড-মোহর ফুল ছাড়া কোনও বৃক্ষচূড়াশোভী ফুলই চোখে দেখেন নাই, ঘেঁটু-ধুতুরা-আকন্দ ফুলও নয় ; কারণ তিনি হাওড়া-বালিব্রীজ দূরের কথা, জীবনে উত্তরে টালার এবং দক্ষিণে গড়িয়ার পোলও কখনও পার হন নাই। অশ্রুমালা দেবীও যৌবনে কাশী কাঞ্চী কেরল করিয়া এখন নিজের উপার্জিত অর্থে নির্মিত পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়িতে থিতাইয়া বসিয়াছেন। নড়িতে চড়িতে (কলিকাতার সভা-সমিতি ছাড়া) তাঁহারও আর ভাল লাগে না। তিন

বৎসরের বিপুল পরিশ্রমের ফল তাঁহার সুবৃহৎ উপন্যাস 'মরণোল্লাস' মাত্র গত বৎসর বাহির হইয়া এই বৎসরে রবীন্দ্র-পুরস্কার পাইয়াছে।

কবি অসীম জোয়ার্দারও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা—কাব্যগ্রন্থগুলি হইতে বাছাই করিয়া তিনি 'অসীম জোয়ার্দারের শ্রেষ্ঠ কবিতা' মাত্র সেদিন বাহির করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই কানাঘুষায় খবর আসিয়াছে এ বছরের আকাদামি পুরস্কার তাঁহাকেই দেওয়া হইবে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যদিও আলাদা, একই ছাতের তলায় পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার আসিয়া জোটা বড় সহজ নয়।

তাই এতদিনে বাহিরে যাইবার জন্য কবির মন বড় উতলা হইয়াছিল। বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর শরতের পারাবতপালকধূসর লঘু মেঘ আকাশের নীল চোখে অঞ্জনের মত প্রতিভাত হইতেছিল, মাঝে মাঝে ঝিরিঝিরি দু এক পসলা বৃষ্টি এবং তদুপরি বাগানের হাস্নুহানা ফুলের তীব্র গন্ধ বহুকাল পরে তাঁহার মনকে মাতাল করিয়াছিল। ঔপন্যাসিক হইলে কি হইবে, অশ্রুমালা দেবীরও কবি-দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বামীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন এবং একদিন হুস করিয়া তাঁহাদের মোটরখানা ডায়মণ্ডহারবারের ডাকবাংলার হাতায় গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। প্রাইভেট গাড়ি দেখিয়া বাবুর্চী-খানসামা ছুটিয়া আসিল। সকালের প্রাতরাশ ও দ্বিপ্রহরের লাঞ্চ হুকুম করিয়া কবি বারান্দার গোলটেবিলের ধারে সিঙ্গাপুরী বেতের চেয়ারে বেশ গা ছড়াইয়া আরাম করিয়া বসিয়া চুরুট ধরাইলেন। এদিক ওদিক নজর করিয়া বুঝিতে পারিলেন ডাকবাংলায় আরও লোক আছে। তরুণ-তরুণীর কলকণ্ঠও কানে আসিল। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

অনেকক্ষণ একটানা সঙ্কীর্ণ মোটর গাড়িতে বসিয়া অশ্রুমালা দেবীর বাতের ব্যাথাটা আবার চাগাড় দিয়াছিল। তিনি তাঁহাদের নির্দিষ্ট কামরায় সদ্যপরিবর্তিত চাদরাস্তৃত ধবধবে শয্যায় গা এলাইয়া দিয়াছিলেন। একটু ঘুমও আসিয়াছিল। হঠাৎ বাহিরে বারান্দায় স্বামীর রূঢ় ও বিচলিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কষ্টে নিজেকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া গোল টেবিলের একটা ধারে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাকবাংলার খানসামা একটা মোটা বাঁধানো পুরাতন রেজিস্টারি বহি কবির সামনে খুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রত্যেক যাত্রীর নাম ধাম ঠিকানা কতক্ষণ অবস্থান ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিখাইয়া লওয়া

ডাকবাংলার সনাতন বিধি। কবি নিজের ও পত্নীর নাম-ঠিকানা যথাযথ লিখিয়াও দিয়াছিলেন। গোল বাধাইল খানসামা। লোকটা ইংরেজী বাংলা লিখিতে পড়িতে জানিত। রবার্ট ব্লেকের বড় ভক্ত অর্থাৎ একটু ডিটেকটিভি মনোবৃত্তি। আড়চোখে কবি ও কবিগৃহিণীর নাম পড়িয়া সে মাথা চুলকাইতে লাগিল। মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। কবি, খানসামার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন, সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, কি হল হে?

খানসামা বলিল, আজ্ঞে, ভুল হচ্ছে না তো?

রাগিলে কবি অসীম জোয়ার্দারের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তবু তিনি বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া একটু গলা চড়াইয়া বলিলেন, ভুল! তার মানে?

এই অবস্থায় কবি-গৃহিণী অকুস্থলে উপস্থিত হইলেন।

খানসামা একজন মহিলাকে শ্রোতা পাইয়া একটু রসিকতা করিয়া ফেলিল, এজ্ঞে, এই নাম-ধাম-ঠিকানার এক পেয়ার (pair) আজ তিন বছর এই ডাকবাংলায় যাতায়াত কচ্ছেন কি না!

সে বেশ একটু সন্দিগ্ধভাবে ভারতপ্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীঅশ্রুমালা দেবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার ভাবটা এই, বুঝেছি, বুড়ো বয়সে নাম ভাঁড়িয়ে ফুর্তি করতে এসেছেন!

খানসামার দোষ নাই। এমন অনেকেই আসিয়া থাকে। তাহাকেই রেজিষ্ট্রি-বই হাতে কয়েকবার আদালতে সাক্ষী দিতে ছুটিতে হইয়াছে। অনেক কেচ্ছা এই বাবদে সে শুনিয়াছে, অনেক রঙ্গ দেখিয়াছেও।

ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কবি অসীম জোয়ার্দার দাঁড়াইয়া উঠিলেন। হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, কি বললি, বেল্লিক। প্রমাণ কর্, নইলে তোকে মেরেই ফেলব।

কবির বিপুল মূর্তি দেখিয়া ক্ষীণকায় খানসামা ভয় পাইল। বুঝিল "পেয়ার" কথাটা বেফাঁস বলায় একটু বেয়াদপি হইয়া গিয়াছে। সে বিনীত-ভাবেই বলিল, আমি মিথ্যে বলছি না হুজুর। একটা পাতা উলটেই দেখুন না, আজকেও তাঁরা এসেছেন এবং সই করেছেন।

ততক্ষণে কবির উচ্চকণ্ঠ ডাকবাংলার অন্যান্য যাত্রীদেরও কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ বারান্দায় সরাসরি আসিয়া, কেহ পর্দার আড়াল হইতে ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাজ্জব বটে। ঠিক আগের পৃষ্ঠাতেই স্পষ্ট লেখা—"অসীম জোয়ার্দার

উইথ ওয়াইফ অশ্রুমালা দেবী। পণ্ডিতিয়া রোড, ক্যালকাটা।" বাড়ির নম্বরটা খালি মেলে না। এই তফাতটুকু খানসামা অবশ্য ধরিতে পারে নাই।

কবি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঔপন্যাসকের দিকে চাহিলেন। ঔপন্যাসিক হইলেও অশ্রুমালা দেবী স্ত্রীলোক। সহজভাবে বলিলেন, বেশ তো, ওঁরা দুজনে তো আজ এইখানেই আছেন, ওঁদের সঙ্গেই বোঝাপড়া হোক না।

সন্ধান পাওয়া গেল পূর্বাগত অসীম জোয়ার্দার ও অশ্রুমালা দেবী দূরের এমব্যাঙ্কমেণ্টে দুই ঝাউ গাছের মাঝখানে ভাড়াকরা দড়ির দোলনা টাঙাইয়া সবেগে দুলিতেছেন! লাঞ্চের অর্ডার দেওয়া ছিল; সম্ভবত ক্ষুধা চানকাইবার জন্য এই ব্যবস্থা।

ডাকবাংলাতে এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাঁহারা কিছুই অবগত ছিলেন না। ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা তরুণ অসীম জোয়ার্দার টের পাইলে আমাদের গল্প এইখানেই অসমাপ্ত থাকিত। কিন্তু পাঠকেরা ভাগ্যবান, ঘামিয়া নাহিয়া দুইজনে দুইটি তালপাতা-খেজুরপাতার টুপি মাথায় দিয়া বিচিত্র মূর্তিতে রীতিমত কলরব তুলিয়া যথাসময়ে বাংলার হাতায় প্রবেশ করিলেন। "পেয়ার"টিকে অশ্রুমালা দেবীর বেশ ভাল লাগিল। প্রবীণ বন্ধ্যার চিত্ত স্বতঃই অপত্যরসে সিক্ত হইল। কবি অসীম জোয়ার্দার তখনও কিন্তু রাগে ফুলিতেছেন।

লাঞ্চ চুকিয়া গেল। বারান্দার গোল টেবিলের দুই পাশে সামনা-সামনি অসীম জোয়ার্দার ও অসীম জোয়ার্দার এবং অশ্রুমালা দেবী ও অশ্রুমালা দেবী বসিলেন। ছোট অসীম জোয়ার্দার ঢোক গিলিয়া ঘামিয়া লাল হইয়া যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই:

সূত্রপাত তিন বৎসর পূর্বে। কলিকাতার সুবিখ্যাত বিজলী-ল্যাম্পের কারখানার মালিক শ্রীবরেন রায়ের একমাত্র পুত্র তপন সায়েন্স কলেজে ফিজিক্সে এম. এস-সি পড়িতেছিল। বিশেষ বিষয় বিদ্যুৎ ও চুম্বক। চৌম্বকশক্তি পরীক্ষার ফীল্ড কিন্তু প্রস্তুত ছিল স্কটিশ চার্চেস কলেজের থার্ড ইয়ার ক্লাসে। সেখানে নিগেটিব পোলে শ্রীমতী তপতী দাম পজিটিবের আকর্ষণে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। পরিচয় দেশপ্রিয় পার্কে টেনিস জালের ফাঁক দিয়া। তপতীর পিতা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধর দাম সায়ান্স কলেজেই নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষণা এবং গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে অধ্যাপনা করেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুর দিকে ঐকান্তিক দৃষ্টি নিবদ্ধ। একটা পরিপুষ্ট গোটা মানুষ

কখন কিভাবে রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের গেট খুলিয়া ড্রইংরুমে এবং সেখান হইতে সময়ে সময়ে তপতীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তাঁহার দৃষ্টি স্বভাবতই এড়াইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক-গৃহিণীর সায় ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যবসায়ী বরেন রায় অটল। ছেলে এম. এ পাস করিয়া বিলাত যাইবে, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের চূড়ান্ত করিয়া আসিয়া বিজলী-ল্যাম্প কারখানার ভার লইবে। তবে ওসব ফালতু কথা। কাজেই তপ্ত তপন নিজের গতিপথ নিজেই করিয়া লইয়াছে। সহযাত্রী তপতী এবং সহায় তস্য মাতা। তপনের মা নাই, কাজেই বরেন রায়ের কঠোরতাকে নরম করিবার লোক ছিল না।

এই যখন অবস্থা তখন বাবার সুবৃহৎ মাস্টার বুইক গাড়িখানি কালেভদ্রে কাজে লাগাইতে তপনের সঙ্কোচ ছিল না। তপতীকে পাশে চাপাইয়া মাস্টার বুইক হাঁকাইয়া কোথায়—যাই, কোথায়—যাই করিতে করিতে একদিন সন্ধ্যার মুখে সে ডায়মণ্ডহারবারের ডাকবাংলাতে উপস্থিত। রেজিস্টার-বহির বিপদের কথা তাহার মাথাতেই আসে নাই। তাহা হইলে সে সাবধান হইত, মাসতুতো বোন সীমাকে সঙ্গে আনিবারও অসুবিধা ছিল না। তাই খানসামা যখন রেজিস্ট্রি-বই আগাইয়া দিয়া সহির কথা নিবেদন করিল তপনের তখন হুঁশ হইল। নিজের ও তপতীর নাম লেখা যে চলিবে না—এইটুকু মাত্র বোধ তাহার ছিল। সে এক মুহূর্ত চিন্তা করিল, কি যে দুর্বুদ্ধি তাহার হইল—হঠাৎ খস খস করিয়া কবি অসীম জোয়ার্দার ও অশ্রুমালা দেবীর নাম লিখিয়া দিয়া সে হাঁফ ছাড়িল। দুইজনেই বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে বিখ্যাত ব্যক্তি। পণ্ডিতিয়া রোড পর্যন্ত জানা ছিল কিন্তু নম্বরটা মনে ছিল না।

এই পর্যন্ত নিবেদন করিয়া তপন রায় ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কবির বেশ কৌতুক বোধ হইতেছিল। যথেষ্ট কৌতূহলীও হইয়াছিলেন। তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তারপর ?

ঔপন্যাসিক অশ্রুমালা দেবী প্লটের বাঁধনটা তেমন জোরালো কিনা ভাবিতেছিলেন। তিনি একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন।

তপন বলিল, তারপর তপতীই স্রেফ সেবা করে বাবার শক্ত মনকে নরম করেছে। বাবার সেই ধর্ম্মভঙ্গ পণটা এখনও বজায় আছে বটে, তবে টাইম-টেবিলটা একটু পাল্‌টে। আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে পাস করে শ্বশুর মশায়ের আণ্ডারে এখানেই রিসার্চ করছি।

অসীম জোয়ার্দার যেন ধাক্কা খাইলেন। বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, শ্বশুর মশায় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের। তারপর বহুবার দুজনে এসেছি এই ডাকবাংলায় কিন্তু খানসামা এতই পরিচিত হয়েছে যে নাম ঠিকানা পালটাতে আর ভরসা পাই নি। অপরাধ নেবেন না আপনারা।

কবি ধমক দিয়া উঠিলেন, ওসব আমড়াগাছি রাখ হে তপনবাবু। তারপর কি হল বল। ওই দেখ, তুমি বলে ফেললুম, কিছু মনে করো না।

তপন কোনও কথা না বলিয়া পর পর কবি ও ঔপন্যাসিককে আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিল ও তপতীকেও ওইরূপ করিতে ইঙ্গিত করিল।

অশ্রুমালা তপতীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

কবি অসীম জোয়ার্দার হঠাৎ খানসামাকে ডাক দিলেন। সে আসিলে চারজনের একস্ট্রা ফার্স্ট ক্লাস ডিনারের হুকুম দিলেন। পরক্ষণেই কি মনে হইল, বলিলেন, তোমার রেজিস্টারি-বইটা আন তো বাবা।

সেটি আসিলে কবি স্বহস্তে তপন রায়ের তিন বছরের ভুল সংশোধন করিয়া দিলেন।

দুই মাস পরেই শ্রীঅশ্রুমালা দেবীর উপন্যাস 'নামের আড়াল' প্রকাশিত হইল। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। শেষ অধ্যায়ে, ধরা পড়ার পর নায়ককে নামের মালিক কবি যখন প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, তুমি তো কলকাতারই ছেলে, সভা-সমিতিতে কি আমাদের দুজনকে কখনো দেখ নি ? তখন নায়কের মুখে অশ্রুমালা দেবী যে জবাবটি বসাইয়াছেন তাহা পড়িয়া তরুণ পাঠকেরা প্রায় পাগল হইবার দাখিল। ফলে ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটে এক সভায় গিয়া তাঁহার বিপদের একশেষ। ভক্ত তরুণেরা তাঁহাকে কিছুতেই মোটরে চাপিতে দিল না। কোথা হইতে একটা ফিটন ধরিয়া আনিয়া তাহার পক্ষীরাজ দুটিকে খুলিয়া দিয়া নিজেরাই ঠেলিয়া-টানিয়া পণ্ডিতিয়া রোড পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। নায়কের জবাবটা হইতেছে এই—

"দেখুন সার্, মণীষার (উপন্যাসে তপতীর নাম) সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত কাব্য-উপন্যাস কাকে বলে তা জানতুমই না। বাবা বাড়িতেই ল্যাবরেটরি করে দিয়েছিলেন। সেখানে টিউব গ্যাস ব্যাঙ আর বিদ্যুৎ নিয়েই দিন কাটত। জীবনে যখন মণীষার উদয় হল তখন আমাদের সার্কাসে তারের

খেলোয়াড়ের অবস্থা। ত্রিশ ফুট উঁচুতে তার, তার ওপরে সাইকেল চালাতে হবে—হাতের বংশ-দণ্ডটাও সার্কাসের মালিক কেড়ে নিয়েছে। একাগ্রতার একটু এদিক-ওদিক হলেই পতন ও মৃত্যু অনিবার্য। কাজেই বুঝতে পারছেন, অত নাম শোনা সত্ত্বেও আর আপনাদের দেখবার ফুরসত হয় নি।"

একাগ্রতার এমন দৃষ্টান্ত নাকি আজ পর্যন্ত অন্য কোনও কথা-সাহিত্যিক দিতে পারেন নাই। কথা-সাহিত্যিক-সম্রাট শরৎচন্দ্রও নয়।

আশ্বিন, ১৩৬৩

অলৌকিক

অপরাধের মধ্যে একটি পাথর-বসানো আংটি পরিয়াছিলাম। একটি চেনসহ সোনার ঘড়ি ও আংটিটি কোনও সহৃদয় বন্ধু সস্তায় নিলামে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, আংটিটি কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে লাগসইও হইয়াছিল, ধারণের ইতিহাস এইটুকু। রবিবারের আড্ডায় কম্যুনিস্ট-ঘেঁষা শিবু বলিয়া বসিল, আপনিও শেষে এই সব বুজরুকিতে বিশ্বাস করলেন ? সায়ান্সের ছাত্র আপনি—

বি. এস-সি, এম-বি, আই-এম-এস ডাক্তার-বন্ধু হাতে সর্বদাই একটি গোমেদ-সমন্বিত আংটি পরিধান করিয়া থাকে। একটু ঝাঁজালো কণ্ঠেই শিবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, কেন, অপরাধটা হয়েছে কি ? এসবে যে কিছুই হয় না—এ কথাটা জোর করে আপনি বলতে পারেন ? আপনি এইটুকু মাত্র বলতে পারেন যে, আপনি জানেন না। তা আপনি তো অনেক কিছুই জানেন না—বায়োলজি জানেন না, রেডিও-অ্যাক্টিভিটি জানেন না। আপনি জানেন না, সুতরাং এসব শাস্ত্র বুজরুকি ! বাঃ, বেশ তো আপনার যুক্তি !

শিবু চালাক ছেলে, বিলো দি বেল্ট হিট করিবার চেষ্টা করিল। ডাক্তারকে সরাসরি প্রশ্ন করিল, আপনি তাবিজ মাদুলি জলপড়াতে বিশ্বাস করেন ? যে সব রোগ আপনারা দুরারোগ্য বলেন, সামান্য মন্ত্র পড়ে বা গায়ে হাত বুলিয়ে ওসব রোগ কেউ কেউ সারিয়েছে—এ গল্প নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি। বিশ্বাস হয় আপনার ?

ডাক্তার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, বিশ্বাস হয় মানে ? ওরই জোরে আমি এখনও বেঁচে আছি। নইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রমতে আমার মৃত্যু তো অনেক দিন ঘটে গেছে—প্রায় বিশ বছর আগে। কলকাতার সেরা ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। অলৌকিকের কৃপায় আমার এই নবজীবন। আরও অনেক কিছু দেখেছি। সুতরাং এটা কিছু নয়, ওটা বুজরুকি, এসব বলবার সাহস রাখি না।

ডাক্তারের জীবনের এই ঘটনার কথা আমরা কেহই জানিতাম না। সকলেই তাহাকে ধরিয়া পড়িলাম। ডাক্তার প্রথমটা অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শেষে বলিল, সদ্য মেডিকাল কলেজ থেকে বেরিয়ে পুঁথিগত মেডিকাল সায়ান্সকেই মানবীয় দেহ ও জীবন-মরণ-তত্ত্বের চরম বলে জ্ঞান করতাম।

বাড়িতে আমার আখ্যা ছিল—পাষণ্ড, নাস্তিক। এমন কি বিয়ের সময় মন্ত্রগুলোকে রিডিক্লাস মনে করে উচ্চারণই করি নি। গৃহিণী ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমতী। আমার সঙ্গে সংসার করতে আসা অবধি একদিনও বুঝতে পারি নি, দেবদ্বিজে মন্ত্রেতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস আছে। তবে শুনেছিলাম, গোপনে অন্নপূর্ণার পটপূজো করে থাকেন তিনি। ঠাট্টাও এক-আধদিন করে থাকব। তাঁকে নিয়ে একবার পুরী গেলাম। একদিন সমুদ্র-স্নান করতে গিয়ে ঢেউয়ের টানে তলিয়ে গেলাম—জ্ঞান হবার পরে দেখি, হাসপাতালে শুয়ে আছি। সে যাত্রা সেরে উঠলাম বটে, কিন্তু বুকের একটু দোষ ঘটে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই সেটা রীতিমত ক্ষয়রোগ—টি-বিতে দাঁড়িয়ে গেল। রোজই জ্বর হতে লাগল, পৃথিবীর রঙ ছুটে গেল আমার চোখে। কিছুই ভাল লাগত না। যাদবপুর হাসপাতাল তখন হয় নি, মাদ্রাজের দিকে এক জায়গায় এক যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়ে থেকেছিলাম কিছুদিন। ডাক্তারী বুদ্ধিমতে নিজেই বুঝতে পারছিলাম, আর বেশীদিন নয়। শ্বশুরমশায় ধনী ব্যক্তি। তিনি আমাকে কলকাতায় এনে সেরা ডাক্তারদের হাতে যখন সমর্পণ করলেন, তখন দুটি ফুসফুসই আক্রান্ত—রক্তক্ষরণও আরম্ভ হয়েছে। ডাক্তাররা শান্তভাবে শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা করবার উপদেশ দিয়ে সরে পড়লেন।

এমন সময় এক জ্যোতিষীর আবির্ভাব হল আমার শ্বশুরবাড়িতে। আমার কোষ্ঠী ও করকোষ্ঠী বিচার করলেন তিনি। বিশেষ কিছু আশ্বাস দিতে পারলেন না। শেষে গৃহিণীর ঠিকুজিখানা নিয়ে পড়লেন। তাঁর জন্মলগ্ন যাচাই করে আমারই সামনে জোর গলায় তিনি বলে গেলেন, এ মেয়ের বৈধব্য অসম্ভব। যদি হয় জ্যোতিষশাস্ত্রই মিথ্যা।

তিনি কোন উপায় বাতলালেন না—না কবচ, না আংটি, না স্বস্ত্যয়ন। শুধু এইটুকু বলে গেলেন, কোনও অলৌকিক উপায়ে এঁর প্রাণরক্ষা হবে। কি সে উপায়, তা তিনি আন্দাজও করতে পারছেন না।

জ্যোতিষীর প্রতি এঁদের খুব বিশ্বাস ছিল। খুবই আশ্বস্ত হলেন। তবু প্রতিদিন আমাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যেতে দেখে এঁদের উদ্বেগেরও অন্ত ছিল না। এতদিন গোপনে করে এসেছিলেন, গৃহিণী এখন প্রকাশ্যেই দিনরাত্তির পূজার্চনাদি নিয়ে কাটাতে লাগলেন, পট্টবস্ত্র পরিধান করে আমার পাশটিতে এসে বসতেন। লক্ষ্য করতাম, তাঁর চোখ দুটি নিমীলিত, মুখে বিড়বিড় করে কি উচ্চারণ করছেন। কষ্ট হত আমার খুব। বয়স কতই

বা হবে, এর মধ্যে এই পরীক্ষা চলেছে ওঁর ওপর দিয়ে! এক একবার মনে হত, এ পর্ব তাড়াতাড়ি চুকে গেলেই ভাল। আবার ভাবতাম, যতদিন এই মুমূর্ষুকে নিয়ে ভুলে থাকেন থাকুন।

সেদিন আমার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, প্রাণশক্তি ক্ষীণতম হয়ে এসেছিল, সকলেই প্রতীক্ষা করছিলেন মৃত্যুদূত কখন চরম পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়। শ্বশুর-শাশুড়ী সকলেই আমাকে ঘিরে যেন আগলে ছিলেন। লক্ষ্য করলাম গৃহিণী অনেকক্ষণ ধরেই কাছে নেই। কৌতূহল হচ্ছিল, ব্যাকুলও হচ্ছিলাম তাঁর জন্যে। অনুভূতির তীব্রতা বেড়ে গিয়েছিল আমার, সব কিছুই স্পষ্ট বুঝতে ও অনুভব করতে পারছিলাম। আমার ব্যাকুলতা শাশুড়ী ঠাকরুণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে, শ্বশুরমশায় গীতার একাদশ অধ্যায় আবৃত্তি করতে লাগলেন।

তারপর সম্ভবত সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম, একটা আর্ত চিৎকারে সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। চোখ মেলেই দেখি, গৃহিণী স্বপ্ন-চালিতের মত আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পরিধানে পট্টবাস, সদ্য স্নানশেষে কেশপাশ আলুলায়িত, কপালে ও মাথায় সিঁদুরের প্রলেপ, নিমীলিত-চক্ষু। আর্তকণ্ঠে এই কথা জোরে জোরে উচ্চারণ করতে করতে এগোতে লাগলেন, তাই নাও মা, আমার পেটের সন্তানকে নাও, ওঁকে বাঁচিয়ে রাখ। আমি মা হতে চলেছি, সন্তানের চেয়ে বড় সম্পদ মায়ের আর কিছুই নেই। তাই দিচ্ছি তোমাকে, তুমি নাও। আমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখ।

মৃত্যুপথযাত্রী হলেও আমি অনুভব করছিলাম, সমস্ত ঘরটায় একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। গৃহিণী আমার শয্যাপ্রান্ত পর্যন্ত এসে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, আর কেউ তাঁকে ধরবার আগেই মুমূর্ষু আমি বিদ্যুৎগতিতে উঠে তাঁকে ধরে ফেললাম। তিনি তখন বেতসপত্রের মত কাঁপছেন। সহসা শরীরে অমিত বল এল। আমি তাঁকে টেনে আমার বিছানায় তুলে নিলাম। উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। আমার যে কখনও কোন অসুখ ছিল, একটু আগেই আমার অন্তর্জলীর ব্যবস্থা হচ্ছিল—তিন মিনিটের মধ্যেই সে কথা কাহিনীর মত মনে হতে লাগল।

একটি মৃত সন্তান প্রসব করার পর গৃহিণী জ্ঞান ফিরে পেলেন। আমি যেন স্বাভাবিক ভাবেই একটা সাধারণ অসুখ থেকে উঠেছি, এই ভাবটাই দেখাতে লাগলাম। তাঁকে আজও পর্যন্ত এই প্রসঙ্গে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করি নি, কিছু বলিও নি। আমার মনে হয়, তিনি কিছু বলতেও পারতেন না। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁরও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাইরে ঘটেছিল। তাঁর আর সন্তান হয় নি এবং আশ্চর্যের কথা, তা নিয়ে কখনও তাঁকে অনুযোগ করতেও শুনি নি।

ডাক্তার থামিল। ঘরটার আবহাওয়াই বদলাইয়া গেল। যেখানে কিছুক্ষণ পূর্বে রসিকতার বান ডাকিয়াছিল, সেখানেই কেমন একটা গাম্ভীর্য থমথম করিতে লাগিল। শিবুও বদলাইয়াছিল, তবু একটু রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিল, হ্যাঁ, এ বিষয়ে আপনার বলবার অধিকার আছে স্বীকার করছি—বউদিকে একদিন প্রণামটাও সেরে আসতে হবে। কি বল হে?

সেই সুগম্ভীর পরিবেশে শিবুর কাষ্ঠহাসির চেষ্টা আর্তনাদের মত শুনাইল। আর কাহারও মুখে কিছুক্ষণ কোনও কথা জোগাইল না। সেই অস্বস্তিকর অবস্থাটাকে হালকা করিবার জন্য ডাক্তারই শেষ পর্যন্ত গোমেদ-আংটি-প্রসঙ্গের জের টানিয়া বলিল, গৃহিণী এ বিষয়ে কখনও কিছু বলেন নি বটে কিন্তু এই ঘটনার পরে ঘটা করে অন্নপূর্ণা-পূজা করেছিলেন। নৈবেদ্যের থালায় সর্বপ্রথম এই গোমেদের আংটিটি দেখতে পেয়েছিলাম এবং সেই রাত্রে ঘুমের ঘোরে অনুভব করেছিলাম যেন দেবী স্বয়ং আমার হাতে আংটিটি পরিয়ে দিলেন। আমার সকল সন্দেহ, সকল যুক্তি এবং সকল বিজ্ঞান-বুদ্ধি সত্ত্বেও এটিকে আমি শিরোধার্য করেছি। কেন করেছি তার জবাব কোনদিনই দিতে পারব না।

আশ্বিন, ১৩৫২

পান্নালাল

যাঁহারা তরুণ বলিতে নরুনপাড় ধুতি-পরিহিত, অতিরিক্ত কাব্যপাঠের দরুন চশমারূপ যন্ত্রের সাহায্যে পথ চলিতে চলিতে যে কোনও চওড়াপাড় চলিষ্ণু শাড়িকে তরুণী কল্পনা করিয়া করুণভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া বরুণ দেবতার কোলে দেহরক্ষা করিতে দ্বিধা করে না এরূপ এক সম্প্রদায়ের বাঙালী ছোকরার কথাই মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের পান্নালাল হাজরাকে দেখেন নাই। পান্নালাল তরুণ বইকি। যে বৎসর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, পান্নালাল সে বৎসর হামাগুড়ি দিয়া দরজার চৌকাঠ ডিঙাইতে শুরু করিয়াছে, অভিধানে পাওয়া যায় এমন দুই-চারিটি শব্দও উচ্চারণ করিতেছে এবং মায়ের কোমর ধরিয়া প্রায় উদয়শঙ্করী ভঙ্গিতে নাচিতেও আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং পান্নালালকে পোস্ট-ওয়ার তরুণও বলা চলে। তাহা ছাড়া সে যখন এম. এ পড়িতেছে এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে গত বৎসর বি. এ. ডিগ্রী লইয়াছে, তখন একই অধ্যাপকের নাকের সম্মুখে আধুনিক তরুণীদের পাশে বসিয়া ক্লাস করিয়াছে নিশ্চয়ই, একই গেট দিয়া বাহির হইয়া তাহাদের পিছনে পিছনে সদর রাস্তা পর্যন্ত যে যায় নাই অথবা একই ট্রামে বা বাসে ক্বচিৎ কখনও ভ্রমণ করে নাই, এমন কথা হলপ করিয়া বলা যায় না। চোখোচোখি বা ছোঁওয়াছুঁয়ি নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে, তবে তাহাতে সাধারণত যে রোমান্সের কল্পনা করিয়া আমাদের মনে পুলক-সঞ্চার হয়, পান্নালালের ক্ষেত্রে তাহা দানা বাঁধিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই ; সে কটমট করিয়া চাহিয়াছে এবং ধাক্কা দিয়া নিজের পথ করিয়া লইয়াছে মাত্র।

পান্নালালের চেহারা ভাল, শরীর রীতিমত মজবুত, চুল ব্যাক-ব্রাশ করা, চওড়া কপাল, চশমাহীন চোখ, মানানসই নাক, গোঁফের রেখামাত্র আছে, শ্যামবর্ণ, হাফ-হাতা শার্ট, মালকোঁচা-মারা ধুতি, মুখেচোখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি ; সমস্ত দেহে চপল তারুণ্য—পাঞ্জা কষিয়া, ঘুষি ছুঁড়িয়া ও নানাবিধ দুষ্টামি করিয়া তাহার প্রকাশ ; কবিতা লিখিয়া, প্রেমপত্র ছাড়িয়া বা চোরা চাউনি ছুঁড়িয়া নহে। কলেজে স্পোর্টসে সর্বাগ্রে তাহার নাম ; প্রফেসর

জব্দ করার পাণ্ডা সে। এক কথায়—পান্নালাল তরুণ হউক আর নাই হউক, অত্যন্ত মডার্ন।

কলেজে তাহার সহপাঠীদের মধ্যে তথাকথিত তরুণের অভাব নাই। তাহারা জটলা করিয়া দেখে, একলা একলা মজে; বারোয়ারি বউদিদিদের কাছে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বায়রন অনুবাদ করিয়া প্রেমপত্র লেখে, কলেজ হইতে লুকাইয়া পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করে এবং মাঝে মাঝে মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে টাকাখানেকের রজনীগন্ধা অথবা গোলাপফুল কিনিয়া শয্যায় বিছাইয়া মরিয়াও বসে; তাহারা অতি-আধুনিক গল্প-কবিতা নিজেরা পড়িয়া সহপাঠিনীদের পড়াইতে চায়, ঠিকানা ভুল করিয়া তাহাদের দুই-একখানা উদগ্র সাইকলজিকাল উপন্যাস সহপাঠিনীদের বইয়ের বোঝার মধ্যে চলিয়া যায়, ছবিও যে দুই-চারখানা এদিক ওদিক গিয়া না পড়ে তাহা নয়। কোন্ বান্ধবী কবে কোন্ সিনেমায় যাইবে, তাহার হিসাব তাহারা রাখিয়া থাকে এবং মাসিক-সাপ্তাহিকে দুই-একটা উদ্দেশ্যমূলক কবিতাও ছাপাইয়া থাকে। পান্নালাল এই সব পিঁচুটিমার্কা ছেলেদের সুনজরে দেখে না।

পান্নালাল যখন ফোর্থ ইয়ার আর্ট্‌সে, মিস্ করুণা মিত্রের সে বছর থার্ড ইয়ার। একেবারে যাহাকে বলে অপরূপ—সে ছিল তাহাই। বাপ বড়লোক, ভবানীপুর হইতে মোটরে কলেজে আসিত। সে যে দেখিবার মত একটা বস্তু—এ কথা কলেজের খোঁড়া দারোয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়া প্রফেসরগুলা পর্যন্ত মনে মনে স্বীকার করিতেন; ছেলেদের তো কথাই নাই। এক পিরিয়ড হইতে অন্য পিরিয়ডে ঘর বদলের সময় পথে বারান্দায় একেবারে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত, করুণা ঘামিয়া চুমিয়া একেবারে লাল হইয়া তবে ক্লাসে ঢুকিতে পারিত।

এ হেন করুণা মিত্র পান্নালাল হাজরার প্রেমে পড়িয়া গেল। সহপাঠিনীদের নিষ্কাম দূতীগিরির চোটে পান্নালালের গায়েও একদিন আচমকা ইহার আঁচ আসিয়া লাগিল। সে প্রথমটা একটু থতমত খাইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া ক্রিকেট-মাঠের ফিল্ডিঙের চোখে একবার আপাদমস্তক করুণাকে দেখিয়া তাহার মন্দ লাগিল না। বাস্, সেই এক সেকেণ্ড। তারপর গুজগুজ ফুসফুস না করিয়া সে একেবারে স্ট্রেট করুণার গাড়ির কাছে গিয়া বলিল, সোজা বাড়ি যাবেন তো? আমি আপনার সঙ্গে রসা রোড পর্যন্ত যাব। দেবেন একটা লিফ্‌ট?

বিষম অবাক হইলেও করুণা খুশী হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করা উচিত—প্রথমটা হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া একবার ড্রাইভারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, তা বেশ তো, আসুন না।—কলেজের গেটের সামনে তখন অর্ধোদয় স্নানের ভিড়।

গাড়ি ছাড়িতেই পান্নালাল ভূমিকামাত্র না করিয়া বলিল, শুনলুম, আপনি নাকি আমাকে ভালবেসেছেন?

ড্রাইভারের সামনে লটকানো আয়নাটায় করুণার লজ্জিত মুখখানা মন্দ দেখাইল না। সে যেন একটা ধাক্কা খাইল, এই অপ্রত্যাশিত অভদ্র প্রশ্নের জবাবই বা সে কি দিবে? খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু ঠেস দিয়াই বলিল, আপনার আত্মপ্রত্যয় তো দেখছি অসাধারণ!

আন্‌ডণ্টেড পান্নালাল এবার অবাক। এক মিনিট মাথা চুলকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, তা হলে গুজবটা মিথ্যে। ধন্যবাদ। এই ড্রাইভার, রোখো।

লজ্জায় নিজের গাড়ির তলায় পড়িয়া করুণার মরিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহার সময় ছিল না। সুতরাং লজ্জার মাথা খাইয়াই সে পান্নালালের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, যা শুনেছেন সত্যি, কিন্তু—

চট করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পান্নালাল বলিল, ওসব কিন্তু-টিন্তু আমি বুঝি না। প্রেমে পড়ে থাক, ভাল। তবে আরও দু বছর সবুর করতে হবে। এম. এ.টা পাস করে নিই। এর মধ্যে এক ছত্র চিঠি লিখবে না বা কখনও আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইবে না। রাজি?

করুণার হাসি পাইল, ভাল লোককে সে বাছিয়া লইয়াছে। গম্ভীর হইয়া বলিল, রাজি। কিন্তু—

আবার কিন্তু?

বাবা মা যদি এর মধ্যে অন্য কোথাও আমার বিয়ে দিয়ে ফেলেন?

খুন হয়ে যাবেন, খুন হয়ে যাবেন।—বলিতে বলিতে পান্নালাল চলন্ত গাড়ির দরজা খুলিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল। গাড়ি তখন পোড়াবাজারের মোড় ফিরিতেছে।

বি. এ. পাস করিয়া পান্নালাল যখন ইউনিভার্সিটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হইল, তখন দুইজনে প্রথম ছাড়াছাড়ি। তথাপি ছাত্রছাত্রী-মহলে সকলেই জানিত, রামের যেমন সীতা, সত্যবানের যেমন সাবিত্রী, পান্নালালের তেমনই করুণা—দুইজনের সম্পর্ক জ্যামিতির যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু করুণার বাপ-মায়ের তাহা জানিবার কথা নয়। অমন চেহারা এবং এমন গুণ—মেয়েকে যে কোনও আই-সি-এস. লুফিয়া লইবে; নিদেন পক্ষে একজন ব্যারিস্টার। মোদ্দা কথা, পয়সাওয়ালা বিলেত-ফেরত একজন চাই-ই।

পান্নালালের সেদিকে হুঁশ নাই। সে কলেজে বরাবর রাইট-অ্যাবাউট-টার্ন করিয়াছে, করুণাদের বাড়ির দরজা কখনও মাড়ায় নাই। সে জানিত, যেদিন দরজা মাড়াইবে, সেদিন একেবারে শ্বশুর-শাশুড়ীকে করণীয় প্রণামটাও সারিয়া লইবে; তৎপূর্বে যাতায়াত, লেগ-বিফোর-উইকেটের মত, ভাল নয়। করুণা নিজের স্বার্থ ভাবিয়া বাবা-মার সহিত পান্নালালের আলাপ করাইতে ব্যস্ত হইত, কিন্তু পান্নালালের ধমকে চুপ করিয়া যাইত। তাহার ব্যস্ততার আরও একটা কারণ ধীরে ধীরে গজাইয়া উঠিতেছিল—ব্যারিস্টার বারিদবরণ রায় সম্প্রতি বড় ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করিয়াছে। মায়ের তাহাকে ভারী পছন্দ, এবং মায়ের পছন্দই বাবার পছন্দ।

করুণার শাড়ি ও ব্লাউজের রঙমিল বা রঙছুট লইয়া ব্যারিস্টার বারিদবরণ আজকাল মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কলেজ হইতে ফিরিতে দেরি হইলে এক্স্‌প্লানেশন চায়। করুণা ভিতরে ভিতরে রাগে গরগর করিতে থাকিলেও ভয়ে পান্নালালকে কিছু বলে না। টাকের উপর আবার পান্নালালের টাঁক বেশী।

পান্নালালের এম. এ. পরীক্ষার আর বছরখানেক বাকি, করুণা বি. এ. পাস করিয়া ঘরে বসিয়া আছে; ভারতীয় বাছাই টীমের সঙ্গে পান্নালালের সাউথ আফ্রিকা যাইবার কথা উঠিয়াছে। করুণা প্রমাদ গণিল। নানা দিক বিবেচনা করিয়া একদিন ইউনিভার্সিটির দরজায় পান্নালালকে ধরিয়া বলিল, আমার খিদে পেয়েছে।

পান্নালাল তখন বেলেঘাটায় ভিজিয়ানাগ্রামের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে স্থির করিয়াছে। ভয়ানক ব্যস্ত, চ্যালারা সব তাহার পিছনে। চটিয়া উঠিয়া বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়া পুঁটিরামের দোকানটা দেখাইয়া বলিল, ওইখানে যাও, এটা ইউনিভার্সিটি।

করুণাও চটিল, বলিল, তা জানি। তোমাকে এখনই আমার সঙ্গে আসতে হবে, কথা আছে।

পান্নালাল রাগিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু করুণার মুখ দেখিয়া তাহার

মনে হইল, ব্যাপারটা সিরিয়াস। হাতের ইশারায় চ্যালাদের কি বলিল বুঝা গেল না। করুণাকে বলিল, চল।

রয়াল হোটেলে চায়ের অর্ডার দিয়া একটা পার্টিশন-করা খোপে ঢুকিয়া পান্নালাল বলিল, ব্যাপার কি বল তো ?

করুণা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ব্যারিস্টার বারিদবরণ।

চড়াৎ করিয়া পান্নালালের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল, বলিল, গড্ ব্লেস হিম।

করুণা তাহাকে আরও চটাইবার জন্য বলিল, গড্ নয়, পুরুত—আসছে অঘ্রাণে।

বটে !—বলিয়া রাগে পান্নালাল একটা আট আনা দামের আস্ত কেক মুখে পুরিল।

করুণা ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিল, বলিল, কর কি ? অসুখ করবে যে !

করুক অসুখ। আমি যাব না সাউথ আফ্রিকা। বয় !

করুণা বলিল, বয় নয়, এবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হুঁ, তোমার বাবা নয়—একেবারে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করব। জড় মেরে দেব একেবারে। বয় !

করুণা ভয় পাইয়া বলিল, আবার বয় ! পালিয়ে বিয়ে করবে নাকি আমাকে ?

পান্নালাল এবার ভীষণ চটিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, অ্যাম নট এ কাওয়ার্ড। তোমার বাবা সম্প্রদান করবেন, তবে বিয়ে করব।

করুণা বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, আরও ক্রিকেট খেলে বেড়াও। মেয়ে না হয়ে ক্রিকেটের বল হলেও—

ফাজলামি করো না। বয় !

করুণাকে পান্নালাল যখন বাড়ি পৌছাইয়া দিল, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা হইবে। ব্যারিস্টার বারিদবরণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাহিরের ঘরে করুণার মায়ের সহিত গল্প করিতেছে, দেখা গেল। করুণা অনুভব করিল, পান্নালালের হাতের মাস্‌ল ক্রমশ শক্ত হইতেছে। ভয় পাইয়া বলিল, প্রতিজ্ঞা কর, বিশ মিনিটের মধ্যে হ্যারিসন রোড পৌছবে, নইলে আমি ঘরে ঢুকব না। বল।

পান্নালাল প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, চাপিয়া গিয়া চলিতে চলিতে বলিল, আচ্ছা—আচ্ছা।

বক্সিঙের চ্যালা হরেকৃষ্ণ শীল হইল স্পাই। সে যথারীতি রিপোর্ট দাখিল করিতে লাগিল।

৩রা সেপ্টেম্বর—রাত্রি ৭½টা হইতে ৯টা—করুণার গান, পাঁপরভাজা, চা।

৫ই সেপ্টেম্বর—বৈকাল ৫½টা—মা, বারিদবরণ, করুণা—লেক, জলে ঢিল ছোঁড়া।

১৯এ সেপ্টেম্বর—ঐ তিনজন—মার্কেট, গিয়াসুদ্দীন—কেক, চকোলেট, বারিদবরণের মানি-ব্যাগ। চ্যাটার্জির ফুলের স্টল—বারিদবরণ, ফুল।

২৩এ সেপ্টেম্বর—বাড়ির ছাদ—করুণা, মা, পরে বারিদবরণ। মা নীচে, পরে করুণাও।

২৪এ সেপ্টেম্বর—বারিদবরণ—ডিনার—রাত্রি ১২টা।

১লা অক্টোবর রাত্রি আটটায় রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এল্. সি. মিত্র মহাশয়ের 'হার্মিটেজ' নামক বাড়ির দরজার কোলাপ্সিব্ল গেটের সামনে একজন লম্বা জোয়ান পুরুষ হিন্দুস্থানী দারোয়ানের সহিত তর্ক করিতেছে, দেখা গেল। তাহার বাম বগলে বালিশমোড়া একটি শতরঞ্জি এবং ডান হাতে একটি প্রমাণসাইজ স্যুটকেস। দরোয়ান যত বলিতেছে, ই বাড়ি নেহি হ্যায় বাবু, সে ব্যক্তি ততই জিদ চড়াইয়া বলিতেছে, আরে বাবা, এহি বাড়ি, ই তো বিশ নম্বর হ্যায়? শেষ পর্যন্ত কোলাপ্সিব্ল গেট ফাঁক হইতে লাগিল, দারোয়ান আর রাখিতে পারে না। দারোয়ান হাঁকিল—সাব!

বারিদবরণ তখন ড্রয়িং-রুমের সোফায় বসিয়া করুণার ছেলেবেলার ফোটোর অ্যাল্বাম দেখিতেছিল, করুণার মা চোখে চশমা আঁটিয়া কি একটা পত্রিকা পড়ার ফাঁকে ভাবী জামাতা বারিদবরণের সহিত বার্তালাপ করিতেছিলেন। 'সাব' অর্থাৎ মিঃ মিত্র কাছাকাছি কোথাও গিয়া থাকিবেন।

দারোয়ানের চিৎকার শুনিয়া বারিদবরণ ছুটিয়া আসিল, বলিল, কোন্ হ্যায়?

দারোয়ান তখন প্রায় ঘায়েল হইয়াছে। ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, হুজুর, বোলতেঁহে সাবকা দামাদ, বাকি—

আগন্তুক চিৎকার করিয়া বলিল, বাকি কি রে ব্যাটা? নগদ জামাই।

মিসেস মিত্র এতক্ষণ ড্রয়িং-রুমের পর্দা ফাঁক করিয়া ব্যাপার কি দেখিতেছিলেন, তাঁহার পিছনে করুণা উঁকি মারিতেছিল। পান্নালাল ইহার মধ্যে ঠোঁটে আঙুল দিয়া করুণাকে চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল। করুণা ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

বারিদবরণ ব্যারিস্টার ছুটিয়া মিসেস মিত্রের কাছে আসিল, বলিল, আপনাদের কোনও জামাই হবে।

মিসেস মিত্র আকাশ হইতে পড়িলেন। অমন একটা গলাবন্ধ কোট গায়ে বোঁচকাসম্বলিত লোকের সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতে তাঁহার লজ্জা হইবার কথা। বলিলেন, জামাই? তা হবেও বা, মিত্তিরগুষ্টির সবাইকে আমি আবার চিনিও না। ডালপালা নিয়ে বংশটি তো সোজা নয়! তা বাপু, উনি আসা পর্যন্ত ওই ঘরে বসতে বল, ও চোয়াড়ে চেহারার সামনে আমি বেরুতে পারব না।

মায়ের কথা শুনিয়া করুণা মনে মনে গজরাইতে লাগিল—চোয়াড়ে চেহারাই বটে!

বিপদ বুঝিয়া ব্যারিস্টার বারিদবরণ সেদিন বিদায় লইল।

যে ঘরে পান্নালালকে বসিতে দেওয়া হইল, সেটা চাকরবাকরদের ঘর—এক রকম খালিই থাকে। একটা তক্তাপোশ পাতা আছে, তাহাতে অনেককালের বাসী ধূলা। পান্নালাল তাহারই উপরে শতরঞ্চিটা পরিপাটি করিয়া পাতিয়া লইল। দুই দিকের দেওয়ালে দুইটা তাক, ধূলিমলিন জীর্ণ বই দিয়া ঠাসা; তাহারই একটা টানিয়া লইয়া ধূলি ঝাড়িয়া পড়িতে বসিবে—পিছনের দরজা দিয়া করুণা পা টিপিয়া টিপিয়া উপস্থিত। বলিল, এ করছ কি? তোমার জ্বালায় কি শেষে আত্মহত্যা করব?

পান্নালাল গম্ভীর ভাবে বইয়ের পাতা উলটাইতে উলটাইতে বলিল, তার দরকার হবে না। তুমি শুধু কালা-বোবা সেজে বসে থাক।

করুণা রাগিয়া বলিল, সোজা কথা কি না! তোমাকে যা-তা সব বলবে—

বলুক গে।

করুণা আর থাকিতে পারিল না, পান্নালালের হাত হইতে জীর্ণ বইখানা

কাড়িয়া লইয়া বলিল, আর ভালছেলেগিরি ফলাতে হবে না। ওঠ, তক্তাপোশটা ঝেড়ে দিই।

দারোয়ানটা যেখানে বসে সেখান হইতে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, দিদিমণি আগন্তুক বাবুকে উঠাইয়া তক্তাপোশের ধূলা ঝাড়িতেছে। সে স্থর করিয়া তুলসীদাস পড়িতে লাগিল।

ব্রিজ খেলায় হারিয়া উত্তেজিতভাবে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মিঃ মিত্র বাড়ি ফিরিলেন। গৃহিণীর মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, সর্বনাশ করেছ। জামাই, না, আমার মুণ্ডু। ও নিশ্চয়ই স্বদেশী ডাকাত, ফেরারী, আজকাল এ রকম আকছার হচ্ছে। চল, কোথায় দেখি।

আমি বাপু পারব না, তুমি একাই যাও।

মিঃ মিত্র অগত্যা শঙ্কিত চিত্তে কম্পিত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া পান্নালালের হাতকাটা গেঞ্জি চড়ানো শক্ত-সমর্থ চেহারাটা দেখিয়াই যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, তা বাবজী, মুখ-হাত ধুয়েছ তো, জল-টল—

পান্নালাল দ্রুত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে, সে হবে'খন।

তা বাবা তুমি বুঝি—

পান্নালাল মাথা চুলকাইতে লাগিল। তাহার লজ্জাটা মিঃ মিত্র নিজেই যেন অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি বুঝি আমাদের স্থরেশের জামাই ? অনেকদিন তো তাদের সঙ্গে—

মরিয়া হইয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য পান্নালাল বলিল, আপনাদের শরীর ভাল আছে তো ? আর রুবি ? তাকে সেই—

রুবি করুণার ডাকনাম।

মিত্র মহাশয় হঠাৎ লজ্জা অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, অন্যায় হইতেছে, ছোকরা স্বদেশী ডাকাত নয়, নিকট-আত্মীয়ই কেহ হইবে। নেহাত চাকরদের ঘরটায় তাহাকে—

তা বাবা, মুখ হাত ধোও, খাওয়া-দাওয়া কর। ওরে হরে !

হরি আসিতেই বলিলেন, দেখ, দক্ষিণের কুঠুরিটা—

খুড়তুতো ভাই সুরেশের কাছে পাছে অপ্রস্তুত হইতে হয় এই ভাবিয়া তিনি শঙ্কিতই হইয়া পড়িলেন।

প্রথম রাত্রের ফাঁড়া নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। করুণা কিন্তু সে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই পান্নালাল হরিকে ডাকিয়া পোয়াটাক ছোলা ভিজাইতে বলিয়া ঘটা করিয়া ডন-বৈঠক শুরু করিল। ছোলা-ভিজার কথা শুনিয়া সদ্য-ঘুমভাঙা মিত্রগৃহিণী চটিয়াই আগুন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, করুণা চাপা দিবার জন্য বলিয়া উঠিল, তুমি জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে না মা?

দায় পড়েছে আমার।—বলিয়াই তিনি একবার দক্ষিণের কুঠুরির বারান্দাটা ঘুরিয়া আসিলেন, খালি গায়ে মাস্‌ল-ফোলা পান্নালাল তখন দরদর করিয়া ঘামিতেছে ও গুনগুন করিয়া একটা ভজন গাহিতেছে। দৃশ্যটা মিত্র-গৃহিণীর মন্দ লাগিল না। চমৎকার শরীর! নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মন স্নেহসিক্ত হইতে লাগিল। মিঃ মিত্রের কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি যাও একবার, ভাল করে জামাইয়ের সঙ্গে—

এই ফাঁকে করুণা চট করিয়া একবার ঘরে ঢুকিল, বলিল, খুব রঙ্গটাই শুরু করেছ যা হোক! শেষরক্ষে কিসে হবে শুনি?

পান্নালাল যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনভাবে বলিল, আদা আছে? নুন আর আদা?

কি বুদ্ধি তোমার! আমি আনব কি করে? হরিকে ডেকে বল।

ছোলা-ভিজা, নুন, আদা, মধু, দাঁতন! সাহেব-আখ্যাত রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে যেন সত্যই ডাকাত পড়িয়াছে। যে কোনও মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত আশঙ্কা করিয়া করুণা ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল। পান্নালাল নির্বিকারচিত্তে হুকুম দিল, খাঁটি সরষের তেল চাই আধ পোয়া।

হরি অনেককাল এ বাড়িতে কাজ করিতেছে, কিন্তু এমনটি কখনও দেখে নাই। ফিরিঙ্গী বারিদবরণকে দেখিয়া দেখিয়া তাহার মেদিনীপুর-মার্কা প্রাণে মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরিত। আগন্তুকের ধরনটা নূতন হইলেও দেশী। সে খাঁটি সরিষার তেল আনিতে ছুটিল।

গতরাত্রের জামাই-আসার ব্যাপারটা কতদূর গড়াইল তাহা দেখিবার জন্য বারিদবরণ সকালেই আসিয়াছিল। তেল মাখিয়া স্নান সারিয়া পান্নালাল

তখন চা খাইতে ড্রয়িংরুমে আসিয়াছে, বারিদবরণের ঠিক পাশেই তাহার চেয়ার। দৈনিক বাজার করা মিঃ মিত্রের বিলাস, তিনি বাজারে গিয়াছেন। চা আসিয়াছে, করুণা এক কোণে বসিয়া গম্ভীরভাবে পাশাপাশি উপবিষ্ট বারিদবরণ ও পান্নালালকে দেখিতেছে, মিত্রগৃহিণী রান্নার তদারক করিতে ভিতরে গিয়াছেন।

কথায় কথায় বারিদবরণ প্রশ্ন করিল, আপনি থাকেন কোথায়?

কাহারও দিকে না তাকাইয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে পান্নালাল বলিল, কলকাতা—হ্যারিসন রোড।

বারিদবরণ চমকিয়া উঠিল, বলিল, মানে!

করুণা বিপদ গণিল, সে আর ঘরে থাকিতে সাহস করিল না।

পান্নালাল শান্তভাবে পেয়ালাটা সামনের ট্রেতে রাখিয়া চেয়ারটা ঘুরাইয়া বারিদবরণের মুখামুখি বসিয়া বলিল, মানে অতি সোজা, আপনাকে তাড়াতে, এসেছি।

পান্নালালের দেহটার দিকে আপাদমস্তক চাহিয়া বারিদবরণ একবার টাকে হাত বুলাইল, তারপর খামকা চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, তার মানে? হোয়াট ডু ইউ মীন?

আই মীন হোয়াট আই সে।

বারিদবরণ আরও চেঁচাইতে যাইতেছিল। পান্নালাল বলিল, চুপ, চেঁচিয়েছেন কি ঘাড় ধরে—

কি?

কিছু নয়, সামান্য ব্যাপার। করুণার আশা আপনাকে ছাড়তে হবে, ট্রাই ইওর লাক এল্‌স্‌হোয়্যার। ও আমার।

বারিদবরণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল, কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, গায়ের জোরে নাকি? মিঃ মিত্রকে—

সোজা এখান থেকে বাড়ি যাবেন। মিঃ মিত্র কিংবা মিসেস মিত্রকে কিছু বলেছেন কি ফাটিয়ে দোব আপনার টাক। পান্নালাল হাজরার নাম শুনেছেন?

বক্সার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই আপনার সম্মুখে। গুড বাই।

বারিদবরণ ব্যারিস্টার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও

নাই। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বাহির হইয়া গেল। একেবারে ল্যান্সডাউন মার্কেটের পথে।

মাঝ রাস্তায় হরেকৃষ্ণ তাহাকে ধরিল, বলিল, এদিকে নয় মিঃ রায়। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার হুকুম আছে আমার ওপর। একটা ফিটন ডাকব?

বারিদবরণ ভাবিল, গুড গড, ইংরেজ-রাজত্ব কি আর নাই!

বারিদবরণকে বাড়ির দরজা-তক পৌঁছাইয়া দিয়া হরেকৃষ্ণ বলিল, নমস্কার, আমরা আশেপাশেই থাকব। মিঃ মিত্রের বাড়ির দিকে কদিন যাবেন না যেন, দেখবেন। নমস্কার।

রাগে ও গরমে বারিদবরণের টাকে ঘাম দেখা দিল। টেলিফোনও ছাই মিঃ মিত্রের বাড়িতে নাই যে! তাহা ছাড়া সেই গুণ্ডাটা সেখানে আস্তানা গাড়িয়াছে।

বারিদবরণ-সমস্যা যতক্ষণে শেষ হইল, ততক্ষণে পান্নালাল চা খাইয়া দক্ষিণের ঘরে নিশ্চিন্ত আরামে খবরের কাগজ পড়িতে বসিয়াছে। মিঃ মিত্র বাজার হইতে ফিরিয়াছেন এবং বারিদবরণ তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া যাওয়াতে গৃহিণীর উপর তম্বি করিতেছেন। করুণা এই অবসরে চুপিচুপি পান্নালালের কাছে গিয়া বলিল, এসব করছ কি বল তো? আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না দেখছি। ধরা পড়লে—

পড়লে কি? ধরা তো পড়বই।

বাবা যদি পুলিস-টুলিস ডাকেন, যদি তোমায় অপমান করেন?

সতী দেহত্যাগ করবে, আমি দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দোব। তোমাকে কাঁধে ফেলে ধেই ধেই করে নাচব।—বলিয়া পান্নালাল করুণাকে কাঁধে তুলিতে গেল। করুণা পলাইয়া বাঁচিল।

মিঃ মিত্র ও পান্নালাল টেবিলে সামনাসামনি খাইতে বসিয়াছে। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মিঃ মিত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তা হলে সুরেশের—

মিসেস মিত্র চাটনি আনিতে রান্নাঘরে গিয়াছেন। করুণা সামনের বারান্দায় পায়চারি করিতেছে। তাহার ঘোর সবুজ রঙের লালপাড় শাড়িটা পান্নালালের

মগজে রঙ ধরাইয়া দিল। সে হঠাৎ হাত গুটাইয়া লইয়া বলিল, আজ্ঞে, আমি সুরেশের কেউ নই।

মিত্র সাহেব চমকাইতেই দইয়ের প্লেট হইতে চামচটা ঝনাৎ করিয়া মেঝেতে পড়িল। এমন ভয় পাইয়া গেলেন যে মনে হইল, তিনি একটা রিভল্‌বারও যেন দেখিয়াছেন। গোড়ায় যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই বুঝি ঠিক; স্বদেশী ডাকাতের আসামী না হইয়া যায় না। চটিয়া পুলিস ডাকাও ঠিক হইবে না।

মিঃ মিত্রের গোড়ার সন্দেহের কথাটা পান্নালাল করুণার কাছে শুনিয়াছিল। বিনীতভাবে বলিল, কোনও উপায় ছিল না আমার। পুলিসে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, আমি নিরুপায় হয়ে—

সর্বনাশ! চট্টগ্রাম?

আজ্ঞে না, হিলি। কটা দিন আমাকে আশ্রয় দিন, আপনাকে বিপদে আমি ফেলব না। দুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেই—

এতদিন পরে মিঃ মিত্র ইষ্টদেবতার শরণ লইলেন। তাঁহার মনে হইল, টিকটিকি পুলিসে তাঁহার বাড়ি ঘেরাও করিয়াছে, থানায় এজাহার আর আদালতে সাক্ষী দিতে দিতে ওষ্ঠাগত প্রাণে হয়তো আসামীর কাঠগড়াতেই তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইতে হইবে, গৃহিণী এবং করুণার উপরও নিশ্চয়ই জুলুম চলিবে, আর মাসিক পেনশনের টাকাগুলি—মিঃ মিত্র আর ভাবিতে পারিলেন না; চট করিয়া এঁটো হাতেই পান্নালালের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, তুমি আমার ছেলের বয়সী, আমাকে বাঁচাও বাবা।

মিত্র-গৃহিণী চাটনি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, স্বামীর কাণ্ড দেখিয়া তিনি অবাক। সাহেব তো সকালে কখনও সেই ওষুধটা খান না, তবে?

জানলার ফাঁক দিয়া করুণা ঘটনাটা দেখিয়া গিয়াছে। পান্নালাল আঁচাইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত পান চিবাইতে চিবাইতে দক্ষিণের ঘরটায় প্রবেশ করিতেই সে ঝড়ের মত সেখানে গিয়া বলিল, দেখ, বাবাকে নিয়ে যদি অমন রসিকতা শুরু কর, তা হলে আমি মার কাছে সব ফাঁস করে দোব কিন্তু। বাবা বুড়ো মানুষ—

পরে সুদে-আসলে সব শোধ দোব রুবি, এখন বেগতিক। তোমার টেকো ব্যারিস্টারটার চিঠি এসে পড়বে আজ সন্ধ্যায়, না হয় কাল সকালে,

তখন? আসল লোকটাকে না হয় হরেকেষ্টর জিম্মায় রেখে দিয়েছি, এখন ডাকঘরকে ঠেকাই কি করে?

ওই বুদ্ধি নিয়েই তুমি শেষরক্ষে করবে ভেবেছ, না? মশাই, চিঠির ব্যবস্থা আমি করব, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু এদিকে অঘ্রাণ মাস যে এসে পড়ল, তার হিসেব আছে?

পান্নালাল যেন সদ্য আকাশ হইতে পড়িল, চোখ দুইটা ছানাবড়ার মত করিয়া সে একবার করুণার দিকে চাহিল। পরক্ষণেই চট করিয়া মালকোঁচা মারিয়া লইয়া ডান হাতের চাপড়ে বাঁ হাতের বাইয়ে কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে আওয়াজ তুলিতে তুলিতে বলিল, কুছ পরোয়া নেহি।

করুণা আর অপেক্ষা না করিয়া বাবার ঘরে আড়ি পাতিতে ছুটিল।

স্বামী-স্ত্রীতে ততক্ষণে পরামর্শ স্থির হইয়া গিয়াছে। রুবির বিয়েটা লইয়াই যত গোল, নতুবা তাঁহারা আজই শিমুলতলা রওনা হইয়া আত্মরক্ষা করিতেন। বারিদবরণের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা হওয়া দরকার। সে পর্যন্ত ডাকাতটাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই।

সন্ধ্যার দিকে মিঃ মিত্র বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রি আটটা নাগাদ তিনি রাগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া যখন বারিদবরণের বাসা হইতে ফিরিলেন, তখন এদিকেও বিষম বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে।

পান্নালাল এবং করুণার কলেজঘটিত ব্যাপারের বিবরণ সংগ্রহ করিতে বারিদবরণকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ছাত্রছাত্রী-মহলে তাঁহারা উভয়ে বিশেষ পরিচিত। তাঁহাদের প্রেম এত পুরাতন যে, সকলে প্রায় তাহা ভুলিতে বসিয়াছে। কেবল মিঃ মিত্র, মিসেস মিত্র এবং ব্যারিস্টার বারিদবরণই যেন চোখ বুজিয়া কাল কাটাইতেছিলেন।

মিঃ মিত্র বাড়ির বাহির হইয়া যাওয়ার পরেই মিসেস মিত্রও ছাতে উঠিয়া পায়চারি শুরু করিয়াছিলেন। হঠাৎ কি একটা কাজে নীচে নামিয়া করুণাকে আপেলের পুডিংটা সম্বন্ধে একটা জরুরি কথা বলিতে গিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, করুণা ঘরে নাই। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিলেন, কোথাও নাই। হঠাৎ মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হওয়াতে পা টিপিয়া টিপিয়া দক্ষিণের ঘরের খোলা দরজার কাছে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া গেল। স্বদেশী ডাকাতটা চিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে, আর তাঁহার

আদরের কন্যা পাকা গিন্নীর মত তাহার শিয়রে বসিয়া চিরুনি দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইতেছে। যুগপৎ বিস্ময়ে এবং ক্রোধে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পান্নালালই প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা শয়তানী বুদ্ধিও যে তাহার মাথায় খেলে নাই, তাহা নয়। সে যেন মিসেস মিত্রকে দেখে নাই—এই ভাবে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া করুণার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিবে ভাবিয়াছিল, আমরা স্বদেশী ডাকাত, হত্যার চাইতেও নিদারুণ, খুনের চাইতেও নির্মম, তোমার গয়না-গাঁটি যা আছে দিয়ে ফেল। দেশের কাজ, মায়ের—

কিন্তু প্রহসনটাকে আর বেশীদূর টানিতে ইচ্ছা হইল না। সে বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মাথা নীচু করিয়া ঘরের এক পাশে দাঁড়াইল। করুণা মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, মা, আমাকে মাপ কর। তাহার চোখে জল।

মা মেয়ে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শুনিয়া মা বলিলেন, অ্যাদ্দিন বলিস নি কেন? বললে এত গোল হত না। আর ওই বা এত গোঁয়ার-গোবিন্দ কেন, একেবারে বাড়ি চড়াও হয়ে জামাই হতে এসেছে?

অবনত মস্তকে আমতা আমতা করিয়া করুণা বলিল, ওই ওর কেমন বদস্বভাব মা, কোনও কাজই আর পাঁচজনের মত করবে না।

তা হলে তো ওর হাতে পড়লে কষ্ট পাবি তুই।

আমার সয়ে গেছে মা।

এবারে মায়ের কথা জোগাইল না। প্রসঙ্গটা ঘুরাইবার জন্য বলিলেন, তুই যা মা পান্নালালের কাছে। আহা, বাছাকে কালকে একটা মশারিও দেওয়া হয় নি। এক কাপ চা খাবে কি না জিজ্ঞেস কর্।

এমন সময়ে কাটা টিকটিকির লেজের মত লাফাইতে লাফাইতে লাঠিহস্তে মিঃ মিত্রের প্রবেশ। কোথায় সে হারামজাদা, দেখে নোব, আমার সঙ্গে চালাকি! রুবি—রুবি!

মিসেস মিত্র তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আঃ, কর কি? কাকে হারামজাদা বলছ? ও তোমার জামাই যে। বুড়ো বয়সে—

জামাই, না, তোমার মুণ্ডু! বাড়ি চড়াও হয়ে জামাই হতে আসবে? চাই না অমন—

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর। ওই ওর কেমন স্বভাব!

তিনি করুণার কাছে যেমন শুনিয়াছিলেন, ঘটনাটা স্বামীর কাছে বলিতে লাগিলেন। পান্নালাল ও করুণা ইতিমধ্যে আসিয়া মিত্র সাহেবের পায়ের ধূলা লইয়াছে। রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মেয়ে ও ভাবী জামাইকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তা দেখ বাপু, তোমার চ্যালাকে বারিদবরণের ওখান থেকে—

পান্নালাল তাঁহার কথা শেষ হইতে দিল না। বলিল, আজ্ঞে, আমি এখনই যাচ্ছি।

১৩৪৩

চার পয়সা

হরিদাস দোতলা বাস হইতে পাকা আমটির মত টুপ করিয়া নামিয়া পড়িয়া ব্যস্তসমস্তভাবে দ্রুত নিকটস্থ হইয়া আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় কহিল, শুনেছ ?

ইতিমধ্যে সমস্ত কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট সচকিত করিয়া অকস্মাৎ মাকে হারাইয়া-ফেলা শিশুর মত আর্তস্বরে বার তিনেক 'কেবলরাম, কেবলরাম' বলিয়া চেঁচাইয়া বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টার ও আরোহীগণকে সে ভীত চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার কান ও তাহার মুখ পরস্পর সান্নিধ্যে আসিতে এক মিনিট মাত্র সময় লইয়াছিল। দেখিলাম, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আমার পাশে আট-দশজন লোক জড়ো হইয়া গিয়াছে। বাসের কণ্ডাক্টার হাতল ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিহ্বলভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। হরিদাস একবার আড়চোখে সেদিকে চাহিয়া সমবেত জনতাকে যেন লক্ষ্য না করিয়াই অবাক হইয়া গেল। একটু জোর গলায় বলিল, সত্যি বলছ, শোন নি ? অবাক কাণ্ড! অ্যাদ্দিন কলকাতায় ছিলে না নাকি ?

বলিলাম, না থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু কলিকাতাতেই ছিলাম। এইমাত্র গৃহিণী এবং তাঁহার মাসতুতো ভাই অবিনাশের সম্মুখেই দুই মাসের বাকি টাকার জন্য গয়লার নিকট যে ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম যে, সে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ না করিয়া বাসায় ফিরিব না; পথে হরিদাসের এই কাণ্ড।

ঠনঠনে কালীতলার মোড়, দেখিতে দেখিতে লোক বাড়িতে লাগিল, বাসটিও চলিয়া গিয়াছে। হরিদাসকে বলিলাম, চল, হাঁটতে হাঁটতে শুনছি।

কিন্তু হরিদাসের এই আকস্মিক সঙ্গ আমার ভাল লাগিল না। বাসা হইতে ঠনঠনের কালীতলার মোড় পর্যন্ত আসিতে আসিতেই একটা মতলব ঠাওরাইয়া ফেলিয়াছিলাম। দুই হাজার টাকার একটা ইন্‌সিওরেন্স-পলিসি ছিল, চার বছর ধরিয়া প্রিমিয়াম চালাইয়াছি, লোন যতটা লওয়া যায় লইয়াছি; ভাবিতেছিলাম, গাড়িচাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়া গয়লার টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিব—শেষ পর্যন্ত অন্য উপায়ে না হউক, এই রাস্তা কেহ বন্ধ করিতে

পারিবে না। বুকে অনেকটা ভরসাও হইয়াছিল—হরিদাস ব্যাঘাত না ঘটাইলে মা কালীকে একটা প্রণাম করিয়াই আসিতাম। গৃহিণীর একটু কষ্ট হইবে—তা হোক। না খাইতে পাইয়া সকলে মরার চাইতে বিধবা করিয়া স্ত্রীকে দুই মুঠা খাইতে দেওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গৌরব আছে। একজন নিঃসন্তান বিধবার ১৭৮২৲ (দেনা দুই শত ও গয়নার আঠারো টাকা বাদ) টাকা আজীবন ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছিল।

দুইজনে চলিতে শুরু করিলাম দেখিয়া কুতূহলী জনতা ক্ষুণ্ণ হইয়া এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়িল। হরিদাস একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া পরম স্নেহে আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, শোন নি? সকাল থেকে এক কাপ চাও জোটে নি—খাওয়াবে এক কাপ চা?

আমার এক কাপ চা শুধু কেন, এক পাত্র হালুয়াও জুটিয়াছিল; সুতরাং হরিদাসের সম্বন্ধে অনুকম্পা হইল। বলিলাম, এই এক কাপ চায়ের জন্যে এত কাণ্ড? বাস ছেড়ে নামতে হল?

হরিদাস হাসিল। বলিল, নামতে হতই, না নামলে নামিয়ে দিত। রাস্তায় লোক খুঁজছিলাম, কণ্ডাক্টার আর একটু কাছে এসে পড়লেই অচেনা লোককেই চেনা নাম ধরে ডেকে নেমে পড়তে হত। তবু যা হোক, তোমাকে পেলাম, মানটাও বাঁচল, চাও হবে। হবে না ভাই?

আমি হাসিলাম। বলিলাম, হবে বইকি। শুধু চা কেন, দুটো করে হাফ বয়েল, টোস্ট। মরিতেই যখন বসিয়াছি তখন আর মায়া কেন? হরিদাসের সাধ মিটাইয়া তবে মরিব।

হরিদাস যেন শিহরিয়া উঠিল। বলিল, যে মাগ্যিগণ্ডার বাজার ভাই, শুধু চা-ই জোটে না—ওসব নয়, ওসব নয়।

আমার মেজাজ তখন চড়িয়া গিয়াছে। বলিলাম, একদিন তো। তোমার সঙ্গে তো আর রোজ দেখা হচ্ছে না। একটা দিন না হয়—

হ্যারিসন রোডের দিকে চলিতেছিলাম, হরিদাস হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া শ্যামবাজার-মুখো হইল। আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, খরচই যখন করবে, চল, বাড়ি যাই। পয়সাটা গিন্নীকে ফেলে দিলে চাও হবে, দু-চারখানা করে নিমকি—

আমার মনটা ছোট হইয়া গেল। হিমালয়ের শীর্ষদেশ হইতে যেন

তরাইয়ের জঙ্গলে পড়িলাম। তবু আজ সব কিছু সহিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম বলিয়া হরিদাসকে বাধা দিলাম না। বলিলাম, চল।

নীট্‌শে বা শোপেন্‌হাউয়েরের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তবু মনে হইল, আজ এই মুহূর্তে জীবন সম্বন্ধে আমার মনে যে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই—হয়তো গয়লার টাকা দিতে না পারার দুঃখ তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় নাই। হরিদাসের প্রতি যেমন, তাঁহাদের প্রতিও তেমনই অনুকম্পা হইল।

হেদুয়ার মোড়ে একটা দ্রুতগামী মোটরের তলায় পড়িয়া একটা পথের কুকুর রক্তাক্ত পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল। হাসিয়া হরিদাসকে বলিলাম, কুকুর না হয়ে একটা মানুষ হলে ভাল হত।—বলিয়া আবার হাসিলাম। হরিদাস কথা কহিল না, আমার দিকে একটা বিস্ময় ও ঘৃণা মিশ্রিত দৃষ্টি হানিয়া ছুটিয়া গিয়া কুকুরটাকে কোলে তুলিয়া ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়ার জল খাইবার একটা জলাধারের নিকট লইয়া গিয়া জল দিয়া পা ধোয়াইতে শুরু করিল। হরিদাসের প্রতি এবার আমার অত্যন্ত করুণা হইল, মনে মনে বলিলাম, ফুল! হাঁকিয়া বলিলাম, কি হে, অ্যাম্বুলেন্স ডাকব?

হরিদাস কুকুরটিকে একটি গাছের ছায়ায় সন্তর্পণে নামাইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, পয়সা থাকলে একটা রিক্‌শায় চাপিয়ে ওটাকে বাড়ি নিয়ে যেতাম, পট্টি লাগিয়ে দিলেই সেরে উঠবে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে, হাসছ কেন?

বলিলাম, পয়সা আছে, ডাক রিক্‌শা। এই—

হরিদাস অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, কথা বলিল না।

কুকুরসমেত হরিদাসের বাসায় যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা হইয়াছে। হরিদাসের বাসায় ইতিপূর্বে কখনও আসি নাই। দেখিলাম, ছেলেতে মেয়েতে কুকুরে পাখীতে খরগোশে এঁদো গলির চুনবালি-ওঠা একতলা বাড়িখানা গমগম করিতেছে। বাহিরের ঘরেই না হোক বারোজন; ভিতরে অন্তত তিনজন যে আছে, আভাস পাওয়া গেল।

দুইখানি মাত্র ঘর। হরিদাসের পৈতৃক, হয়তো বন্ধক পড়িয়াছে, তবু ছিল বলিয়া এখনও নীলাকাশ হরিদাসের মাথার উপর চাঁদোয়া খাটায় নাই। হরিদাস কুকুরটাকে লইয়া ভিতরে যাইতে যাইতে বলিল, ননুকে কিছু পয়সা

দাও ভাই। ও ততক্ষণে ময়দা, একটু ঘি আর চিনি নিয়ে আস্থক—বাকি জিনিস বোধ হয় বাড়িতেই আছে।

বাকি জিনিস—অর্থাৎ চা এবং চুলা। এবার হরিদাসের উপর শ্রদ্ধা হইতে লাগিল। নন্কু পয়সা পাইয়া লাফাইতে লাফাইতে অন্তর্ধান করিল। একটা ক্যাংলাগোছের মেয়ে বৈঠকখানা-ঘরের এক কোণে কয়েকটা ইষ্টকখণ্ড লইয়া ঘর সাজাইতে ব্যস্ত ছিল। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই, তোর নাম কি?

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, কথা বলিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, হরিদাস তোর কে হয় রে?

জবাব নাই, তবু অপলক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। কেমন অস্বস্তি বোধ হইল, ভাবিলাম, কালা বোবা নাকি? বেশীক্ষণ গবেষণা করিতে হইল না, আট-দশ বছরের একটি ছেলে হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া বলিল, ও হাবী, কথা বলতে পারে না যে।

বলিলাম, বটে, কিন্তু ও তোমার কে হয়?

ছেলেটি বলিল, কেউ নয়, বাবা ওকে দেওঘর থেকে কুড়িয়ে এনেছে। ওর কেউ নেই কিনা।

মাথার ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। আর কাহাকেও কিছু প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না। হরিদাস খালি গায়ে থেলো হুঁকার কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া উপস্থিত। বলিল, গিন্নীর জিম্মা করে দিয়ে এলাম ভাই, সারবে বলেই মনে হচ্ছে।

প্রথম দর্শনেই মনে হইল, উঠিয়া হরিদাসের পায়ে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করি, কিন্তু এই ভাব মুহূর্তমধ্যেই কাটিয়া গিয়া দারুণ বিরক্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, হরিদাসের গালে কষিয়া এক চড় বসাই, তারপর রাস্তা তো আছেই। তবু মানুষের দুর্বলতা। জিজ্ঞাসা করিলাম, হাবীর মত কতগুলি আছে?

হরিদাস হাসিল। বলিল, এর মধ্যেই খবর পেয়েছ; মটরু-গেজেট খবর দিয়েছে বুঝি? নতুন কেউ এলেই তাকে প্রথমেই সব খবর দেওয়া চাই। তা ভাই, বেশী আর পারি কই? তিনটি মানুষ আর পাঁচটি পশু।

বলিলাম, পশু ছটি—তোমাকে নিয়ে। কিন্তু দেখ, আর নয়, এখানে আমার দেবতার অপমান হচ্ছে, আমি চললাম।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কোথা দিয়া কি ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া হরিদাস থতমত খাইয়া গেল। বলিল, নন্‌কু এল বলে ভাই, দেরি হবে না। চা-টা না খেয়ে গেলে গিন্নী মনে ভাববেন, আমারই দোষ—

বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে কাঁদিয়া ফেলিব ভাবিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। ঈশপের গল্প মনে পড়িল। অপদস্থ পীড়িত লাঞ্ছিত খরগোশেরা একবার দল বাঁধিয়া পুকুরে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ব্যাঙেরা ভয় পাইয়াছে জানিয়া জীবনে তাহাদের শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমার আবার বাঁচিতে সাধ হইতেছিল। গয়লার টাকা কষ্টেস্বষ্টে শোধ দিলেই হইবে, না হয় একটু অপমানিত হইব। গিন্নীকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইল। থপ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া হাবীকে কোলে তুলিয়া লইলাম। হাঁকিলাম, আন তোমার নিমকি, আজ খেয়েই ফতুর হব।

হরিদাসের মুখে আর হাসি ধরে না। নিমকির প্লেট সামনে আগাইয়া দিয়া বলিল, খেয়ে দেখ, গিন্নী একেবারে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী।

চোপ!—বলিয়া হরিদাসের গালে এক চড় মারিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের উত্তাপ জল হইয়া গিয়া চোখের কোণ আশ্রয় করিল। পকেট হইতে চারটি পয়সা বাহির করিয়া বলিলাম, এই নাও ভাই, আর কণ্ডাক্টারকে ফাঁকি দিও না।

খোঁড়া কুকুরটা ততক্ষণে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিমকির লোভে পাশে আসিয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াছে।

১৩৩৯

আকাশ-বাসর

ললিতমোহনের শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে; এই অল্প বয়সেই কপালে ও চুলে বার্ধক্য দেখা দিয়াছে। বেচারা অনেক আশা করিয়াছিল। কল্পনার রঙিন স্বপ্নে অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত হতাশাই তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। আশার ক্ষীণালোক তাহার মনে এখনও ধিকিধিকি জ্বলিতেছে—স্ত্রী অশোকার সহানুভূতি ও প্রীতি পাইলে সে এই ভগ্ন শরীরেই একবার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে পারে। তাহার আন্তরিক বিশ্বাস যে, অশোকা যদি এমন করিয়া তাহার প্রত্যেক কাজে বিরক্তি না দেখাইয়া তাহাকে সামান্য মাত্র উৎসাহও দেয়, তাহা হইলে সে বাহিরের সমস্ত অনাদর অকাতরে সহ্য করিয়া এখনও সবলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু বেচারার ভাগ্যে এতটুকু উৎসাহ-বাক্যও আজ পর্যন্ত জুটিল না।

আজ পাঁচ বৎসর হইল, সে সসম্মানে এম. এ. পাস করিয়াছে; একটু চেষ্টা করিলেই প্রফেসারি হউক কি মাস্টারি হউক, কিছু একটা ভাল চাকরি সহজেই জুটাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করে নাই। কাব্য-সরস্বতী তাহার স্কন্ধে বহুদিন হইল ভর করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীকে তাঁহার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝাইয়া দিয়া উদ্বৃত্ত সবটুকুই সে কবিতা কাব্য ও সাহিত্যচর্চাতে দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও তাই সে কবিতার কমলবন পরিত্যাগ করিয়া কমলার রত্ন-সিংহাসনের পাশে আসিয়া জুটিতে পারিল না, কাব্য-সরস্বতী ও অলক্ষ্মী দুইজনকেই একসঙ্গে বরণ করিয়া লইল। সে অবিশ্রাম কাব্যচর্চা করিতে লাগিল এবং মাসিকে সাপ্তাহিকে গল্প উপন্যাস কবিতাদি প্রকাশ করিয়া কোন রকমে মনের আনন্দে পেটের খোরাক জোগাইতে লাগিল। আসলে তাহার পেশা হইল সাহিত্য-সাধনা।

ইহাতে মুষড়িয়া পড়িবার কিছু ছিল না, কারণ বন্ধন বলিতে যাহা বুঝায় আমাদের ললিতমোহনের তাহা একটিও ছিল না। অল্প বয়সেই তাহার বাবা মারা যান, মাও অনেককাল গত হইয়াছেন। এক দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা পিসীমা ছাড়া সম্প্রতি তিনকুলে তাহার আর কেহ নাই। তিনি দেশে থাকিয়া ললিতমোহনের পৈতৃক ভিটাটুকু আগলাইতেন ও তাহার

পৈতৃক সম্পত্তির আয় ২১৷৶০ নিয়মিতভাবে মাসে মাসে তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন। সুতরাং বন্ধন না হইয়া পিসীমা তাহার এই কাব্য-সাধনায় একটু মুক্তির আনন্দই দিতেন। এই ২১৷৶০র উপর লিখিয়া-টিখিয়া সে যাহা পাইত তাহাতেই তাহার কলিকাতায় বাস ও উদরের সংস্থান দুই-ই হইত, এমন কি মাসিক চার-পাঁচ টাকার বই কিনিবার অভাবও তাহার কোনদিন হয় নাই।

ললিতমোহনের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সে এমনই করিয়া সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধনায় জীবন কাটাইবে; বাঁধা পড়িবে না। কিন্তু কেমন করিয়া যে সব গোলমাল হইয়া গেল, সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। এম. এ. পাস করার দুই বৎসরের মধ্যে সে অশোকাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল এবং সেইদিন হইতেই তাহার দুর্দশা আরম্ভ হইয়াছে।

সাহিত্য-রোগে আক্রান্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি মস্ত উপসর্গ আসিয়া জোটে—সেটি পাঠক বা শ্রোতা সংগ্রহ করা। রাত্রি জাগরণ করিয়া মনের আনন্দে লিখিয়া গেলাম আর সেখানেই আনন্দের সমাপ্তি হইল, এমন মনোভাব লইয়া কোনও নির্বিকার সন্ন্যাসী সাহিত্যিক কোথায়ও জন্মিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু ললিতমোহন মনের সমস্ত রস দিয়া যাহা লিখিত, মনের সমস্ত রস দিয়া যদি কেহ তাহা উপভোগ না করিত, তাহা হইলে তাহার সব আনন্দ মাটি হইল বলিয়া মনে হইত। তাই সে রাত্রের লেখা সকালে অতি সন্তর্পণে চায়ের দোকানে লইয়া গিয়া পরিচিত লোকের অপেক্ষায় থাকিত এবং অর্ধ বা সিকি পরিচিত লোক দেখিলেও কথায় কথায় লেখাটির কথা পাড়িয়া তাহা শোনাইতে বসিত। এখানেই অশোকার মামাতো ভাই অজিতের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। অজিত ললিতের লেখার একজন ভক্ত ছিল; অশোকাকেও ললিতের কাব্য-সাহিত্যের পক্ষপাতী জানিয়া সে একদিন ললিতকে অশোকাদের বাড়ি লইয়া গিয়া তাহাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিল। ললিত মধ্যে মধ্যে অশোকাদের বাড়ি গিয়া নূতন গল্প কবিতা বা উপন্যাসের টুকরাবিশেষ শোনাইয়া আসিত। অশোকা ভালমন্দ সমালোচনা করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিত। অশোকার সহিত এই পরিচয় ক্রমশ প্রণয় প্রেম ও পরিণয়ে পর্যবসিত হইল।

অশোকার পিতা রাজীবলোচনবাবু সাব-ডেপুটি হইতে পদোন্নতি করিয়া সম্প্রতি আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ও রায়বাহাদুর হইয়াছেন। ধর্মতলা অঞ্চলে

একটি ত্রিতল বাড়িতে সপরিবারে তাঁহার বাস। পরিবার বলিতে গৃহিণী, অবিবাহিতা তিন কন্যা—অশোকা, রেবা ও ভায়োলেট, এবং গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী সুপ্রভা ও সুপ্রীতি। মেয়েরা সবাই স্কুল কলেজে পড়ে। অশোকার বড় তিন বোন হরিমতি গৌরী ও সুশীলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; তাহারা সিমলা ঝরিয়া ও বালীগঞ্জের স্ব-স্ব স্বামীগৃহে বাস করিতেছে।

অশোকা তখন বেথুন কলেজে বোটানি, হিষ্ট্রি ও বাংলা লইয়া আই.এ. পড়িতেছে; সুপ্রীতি তাহার সহপাঠী। অশোকার বিবাহের কানাঘুষা চলিতেছে। বালীগঞ্জের ব্যারিস্টার এম. সি. ঘোষের পুত্র অবনীচন্দ্র ঘনঘন এ-বাড়িতে যাতায়াত করেন। ইতিমধ্যে অজিতের মারফত ললিতমোহনের আবির্ভাবে সব গোলমাল হইয়া গেল। বুদ্ধিমতী বলিয়া অশোকার খ্যাতি ছিল, কিন্তু সে-ই ললিতের "একরাত্রি" গল্পটি শুনিয়া প্রেমে পড়িয়া গেল। ললিতমোহনের ছেলেমানুষি ও সাংসারিক জ্ঞানের অভাব তাহাকে যতই তাহার বোনেদের ও অবনীবাবুর কাছে বোকা বানাইতে লাগিল, সে ততই তাহার প্রেমকে নিবিড় করিয়া তাহাকে যেন রক্ষা করিতে লাগিল।

এই অকারণ-প্রীতি দেখিয়া ভালমানুষ ললিতমোহনের সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কাব্য-সরস্বতীর দিক হইতে তাহার আংশিক মন এই দুষ্ট সরস্বতীটির উপর আসিয়া পড়িল, সে অশোকাকে ভালবাসিল।

রাজীবলোচনবাবু ও তাঁহার গৃহিণী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, অসম্ভব। ললিতমোহনের দুরবস্থা ও কাব্য-প্রীতির কথা শুনিয়া এই প্রস্তাবকে তাঁহারা ললিতের স্পর্ধা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহারা তো ঠিকই করিয়াছেন, আই-সি-এস ব্যতীত অন্য কাহারও ভাগ্যে অশোকাকে পড়িতে দিবেন না। তা ছাড়া অবনীও তো রহিয়াছে। বাধা পাইয়া অশোকার জিদ চড়িয়া গেল। বাবা ও মা অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন, এই নিঃস্বকে বিবাহ করিলে তাহার দুঃখের অবধি থাকিবে না। আর তাঁহাদের রোজগেরে অন্য তিন জামাইয়ের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে বসাইবেনই বা কি করিয়া? তাহার কাপড়-চোপড় জোগাইতেই তো বেচারার প্রাণান্ত হইবে,—ইত্যাদি। অশোকা কিন্তু টলিল না। মা কাঁদিলেন, বাবা বকিলেন, বোনেরা হাসিল।

মা বলিলেন, অবুঝ মেয়ে, নিজের কিসে ভাল হয় তা বুঝছিস না কেন? তোকে বিয়ে করবার মত যোগ্যতা কি ললিতের আছে?

অশোকা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কেন, ও আমার অযোগ্য কিসে?

মা বলিলেন, পোড়া কপাল আমার, যে জেগে ঘুমোয়, তাকে জাগানো দায়।

বাবা বলিলেন, মেয়ে অবুঝ বলে কি আমাকেও অবুঝ হতে হবে? আমি জেনেশুনে এমন করে ওকে ভাসিয়ে দিতে পারব না।

অশোকা বলিল, তাহা হইলে সে বিবাহই করিবে না। অগত্যা গৃহিণী রাজীবলোচনবাবুকে বুঝাইলেন, আর যাই হউক, ছোঁড়াটা ফার্স্ট ক্লাস এম. এ.। দুরবস্থায় পড়িলে ডিগ্রী ভাঙাইয়াও খাইতে পারিবে। সংসারের চাপ পড়িলেই এই কাব্য-প্রীতি ঘুচিবে। রায়বাহাদুর মেয়েকে নাছোড়বান্দা জানিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত মত দিলেন। নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। বালীগঞ্জের জামাই অধরচন্দ্র আসিলেন। সিমলা ও ঝরিয়া হইতে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের একটি করিয়া স্বরলিপি-সম্বলিত গানের বই উপহার আসিল। অবনীবাবু গোল্ডস্মিথের জীবনচরিত একখানি দিয়া গেলেন।

ললিত প্রথমটা হাতে স্বর্গ পাইল। অশোকাও সাহিত্যিক স্বামীর গর্বে পিতামাতা বন্ধুবান্ধবদের তাচ্ছিল্য গায়ে মাখিল না। তাহারা গড়পার খালধারে একখানা চারতলা বাড়ির একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র সংসার পাতিয়া ফেলিল। বাড়িখানিতে বিশ-পঁচিশটি ফ্ল্যাট। পায়রার খোপের মত ছোট ছোট ঘরগুলি; বারান্দাগুলিও তক্তা দিয়া ভাগ করা; নানা ধরনের ভাড়াটের রুচি-বৈচিত্র্যে বাড়িখানি বিচিত্র। কোন জানলায় সুশ্রী পর্দা, কোথায়ও বা বস্তা-ছেঁড়া, পুরনো লুঙ্গী কিংবা নানা বর্ণের কাপড়ের সংযোগে পর্দা প্রস্তুত হইয়াছে। বারান্দায় কোথাও ছেঁড়া কাঁথা শুকায়, কোথায় রেলিঙের উপর ধুতি-শাড়ির সমাবেশ। ব্রাহ্ম, হিন্দু, শিখ, কেরানী, সাহিত্যিক, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, ডাক্তার, উকীল প্রভৃতি নানা দরের ও স্তরের ভাড়াটে লইয়া সর্বদা বাড়িখানি গমগম করিত। কাহারও সঙ্গে কাহারও বিশেষ পরিচয় নাই; আপন আপন ঘরগুলি গুছাইয়া লইয়া প্রত্যেকেই নির্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সিঁড়িতে কচিৎ কখনও এ-ভাড়াটেতে ও-ভাড়াটেতে দেখা হয়; সন্ধ্যা ও সকালে উনানে কয়লা দিবার সময় উপরের ও নীচের লোকেদের মধ্যে প্রত্যহ দুইবার করিয়া বচসা হয়, আর পাম্পে জল উঠা বন্ধ হইলেই জল লইয়া ঝগড়া বাধে।

ললিতমোহনের চারতলায় দুইটি শুইবার ঘর ও একটি রান্নাঘর। ছাতের সিঁড়িতে চাবি থাকিত, সেটি তাহারই এলাকাভুক্ত।

বেশ দিন চলিতেছিল—কাব্যে গল্পে গানে দুইটিতে 'কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে', সুখেই দিন কাটাইতেছিল। ইতিমধ্যে সিমলা হইতে হরিমতি আসিয়া গোল বাধাইল। তাহার চালচলন, পয়সার জাঁক, সাজের বাহার আর কমিসরিয়েটের বড়বাবুর খাতির সবসুদ্ধ সে একটা মূর্তিমান বিদ্রোহের মত অশোকার সংসারে আসিয়া পড়িল। হরিমতির যখন কিশোর বয়স, তখন রাজীববাবুর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; বাড়িতে স্ত্রী-শিক্ষারও বেশ রেওয়াজ হয় নাই; হরিমতি পাড়া বেড়াইয়া পা ছড়াইয়া সুমতির বর কিংবা কাজলীর নেকলেশছড়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটাইয়াছে—এই অবস্থায় শাশুড়ী ও অভিভাবক-হীন ঘরে পড়িয়া সে একেবারে মাতব্বর হইয়া পড়িল ও নিজের শখের মাত্রা নিরীহ স্বামীর উপর দিয়া পুরাপুরি মিটাইয়া লইতে লাগিল। যাহার কথায় অতগুলি সরকারী কর্মচারী উঠে বসে, সেই কমিসরিয়েটের বড়বাবুই উঠিতে বসিতে তাহার মুখ চাহিয়া থাকেন—ইহাতে তাহার গর্বের অন্ত নাই। স্বামীর জন্য স্ত্রীদের আত্মোৎসর্গের কথা সে ভাবিতেই পারে না। অশোকা প্রথমটা বিরক্ত হইয়া স্বামীর প্রতি দিদির খোঁটাগুলির প্রতিবাদ করিত। হরিমতি ললিতের ঘরের সামান্য অভাবগুলিকেই এত বড় করিয়া দেখাইতে লাগিল যে, প্রথমত অশোকার বিরক্তি ধরিয়া গেল। একদিন হরিমতি মাকে সঙ্গে করিয়া অশোকার বাড়ি বেড়াইতে আসিয়া দেখিল, সে তাহার একটা পুরাতন শাড়ি সেলাই করিতেছে। মায়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরিমতি বলিল, মা, তোমারও কি পয়সার অভাব ঘটেছে নাকি? যখন জানই ললিতের ক্ষমতা নেই, মাঝে মাঝে কাপড়টা ব্লাউজটা কিনে দিলেই পার। মা বলিলেন, আ কপাল, মেয়ের যে দেমাক ভারী, মুখ ফুটে কি কিছু বলে! সেদিন গোয়াবাগানে নেমন্তন্ন খেতে গেল না। বললাম, কাপড় জামা তোর না থাকে বল্, আমি আনিয়ে দিচ্ছি। মেয়ের অভিমান হল, বললে, কাপড়-চোপড় আছে। এখনই কি হয়েছে মা, যে লোকের হাতে ও পড়েছে, আরও কত না জানি ওর কপালে আছে।

অশোকা অভিমান-ক্ষুব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল, বলিল, সব্বাইকার অবস্থা কি সমান হয় মা, ক্ষমতা নেই দেবে কোত্থেকে।

মা ফোঁস করিয়া উঠিলেন, কেন, চেষ্টা করেছে কোনদিন—তোর জন্যে একটু কি ভাবে? খালি লেখা আর পড়া।

অশোকার ইচ্ছা হইল বলে—বড় জামাইবাবুর মত মদে ডুবিয়া থাকা অপেক্ষা সে অনেক ভাল; কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল। ঘা খাইয়া খাইয়া তাহার মনেও বিরক্তি ধরিয়াছে। সে দিনের পর দিন এই ভাবে স্বামীর নিন্দা শুনিতে শুনিতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সব রাগ গিয়া পড়িল ললিতমোহনের উপর, তাই তো, ও তো চেষ্টা করলেই পারে—বিদ্যা বুদ্ধির তো অভাব নাই। তবে সে চেষ্টা করে না কেন? অথচ ললিতকে কিছু বলিতে গেলে সে হাসে। শেষে সেও স্বামীর অপদার্থতা কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি বিরূপ হইতে লাগিল। মা ও দিদি ইন্ধন যোগাইতে কসুর করিল না। আরও দুই-চারিজন বন্ধু জুটিল; তাহাদের সহানুভূতিসূচক হা-হুতাশে তাহার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। সে বুঝিল ও বিশ্বাস করিল, তাহার এই অপরূপ রূপ ও গুণ একজন অপদার্থের হাতে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। ললিত একেবারে তলাইয়া গেল।

একদিকে নিজের কাব্যজীবনের হতাশ্বাস, অন্যদিকে স্ত্রীর বিমুখতা ললিতমোহনকে নিত্যই পীড়া দিতে লাগিল। সে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। এখনও সে মাঝে মাঝে ভাবিতে বসে—হায়, যদি অশোকা তাহার দুঃখ বোঝে, তাহা হইলে জীবনে যশ ও অর্থ সামান্য যাহা কিছু জুটিতেছে তাহা দিয়াই তাহারা স্বর্গ গড়িতে পারে। এত বিফলতার মধ্যেও তাহার ভক্তদের নিকট হইতে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক জুটিত। অশোকার প্রীতি তাহা নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী করিয়া আর্থিক অস্বচ্ছলতার দুঃখ দূর করিতে পারে, কিন্তু মা-বোনের চেষ্টায় অশোকার মনের অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ফাঁকা আনন্দে তাহার আর মন উঠে না; সে চায় সাজ-সজ্জা, বিশ্রাম-বিলাস। এগুলি অর্থসাপেক্ষ এবং ললিতমোহনের আর যাই থাক্, এই অর্থ জিনিসটার অভাব ছিল।

ললিতমোহনের প্রথম উপন্যাস 'কালের কোপ' বেশ কাটিয়াছিল এবং সে ভবিষ্যতের অনেক রঙিন স্বপ্নও দেখিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বই 'মন্টুর মা' একেবারেই কাটিল না। সেই নিশ্চিত ২১৷৷৵০ ও প্রথম উপন্যাসের আয় হইতে গোড়ার দিকে সংসার বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহা প্রায় অচল। বর্তমানের সামান্য আয়েই স্বামী-স্ত্রীর বেশ চলিয়া যাইত, কিন্তু রায়বাহাদুর-কন্যা অশোকার খরচের হাতটা বেশ একটু বেশী ছিল। ভালবাসায়

দিকে আজকাল যেমন সে ভালবাসার দাবি করিত, কিন্তু ভালবাসিত না, খরচের বেলায়ও খরচ করিয়া যাইত, সঞ্চয় করিত না।

সংসার আরম্ভ করিবার প্রথম দিকে মা বলিতেন, বেবী, তোর মত এমন সুন্দরী বউ পেয়ে ললিতের আয়ের দিকে নজর দেওয়া উচিত। দামী কাপড়চোপড়ে তোকে কেমন মানায় এটা লক্ষ্য করা তার কর্তব্য। এই পোড়া কাব্যি-নবেল লেখা ছেড়ে সে কোনও ব্যবসা করে না কেন?

সাহিত্যিক-গৃহিণীর আত্মমর্যাদার নেশা তখনও কাটে নাই। সে মায়ের দিকে রোষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া থাকিত।

এখন তাহার মন ভাঙিয়াছে। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, মা বোন ও সঙ্গীরা সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়া তাহার ঘরে জটলা পাকায়; এই হট্টগোলে বেচারা ললিতের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে নিরিবিলিতে একবারও কাগজ কলম লইয়া বসিতে পায় না। সে ভাবে, আহা, অশোকাকে এরা ভালবাসে, তাই আসে। সে চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু ক্রমশ এসব অসহ্য হইয়া উঠিল, তাহার কাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে, নিষ্ফল আক্রোশে তাহার মেজাজও খিটখিটে হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীর অবিবেচনায় আর মনের সঙ্গে যুদ্ধে সে আজ অসুস্থ।

সে চুপিচুপি এক ডাক্তারের কাছে গিয়া পরামর্শ চাহিল। পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন, পাড়াগাঁয়ে এই হট্টগোলের বাহিরে ফাঁকা জায়গায় কিছুদিন বাস না করিলে তাহার শরীর সারিবে না। রোগের ঔষধ শুনিয়া ললিত একটু হাসিল। স্থান পরিবর্তন—হায় রে, সে না জানি কত টাকার ব্যাপার!

ডাক্তার অবাক হইয়া বলিলেন, হাসির ব্যাপার নয় মশাই, আপনার বুকটা—

ফ্যাকাশে শীর্ণ মুখখানি ডাক্তারের দিকে তুলিয়া ললিত আর একবার হাসিল। ডাক্তার বুঝিলেন ও মৃদু হাস্য করিলেন। ললিত বলিল, আমার বুকটা হাসির ব্যাপার নয়, আপনার প্রেস্‌ক্রিপশন শুনে হাসি পাচ্ছে। আমার পক্ষে বেশ একটু রাজকীয় রকমের ওষুধের ব্যবস্থা করলেন কিনা।

ললিত বাড়ি আসিল এবং হাওয়া পরিবর্তন বুকের অসুখ ইত্যাদি ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে তাহার 'গদ্য-সাহিত্যে স্বরবিন্যাস' পুস্তকখানির তৃতীয় অধ্যায় লিখিতে বসিল। কিন্তু পাশের ঘরে তখন তাহার শাশুড়ী, বড় শালী,

অশোকা ও তাহার দুই-চারিজন প্রাণের বন্ধু মিলিয়া সশব্দে তাস খেলিতেছে। তাহাদের উচ্চ কলোচ্ছ্বাস হাঁক-ডাকে তাহার সমস্ত স্বরবিন্যাস ঘুলাইয়া গেল। সে রাগে কলম কামড়াইতে লাগিল, চুল ছিঁড়িতে শুরু করিল, এবং ভাবিতে ভাবিতে তাহার একেবারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সে সশব্দে মাঝের দরজাটি খুলিয়া দিল। মেয়েরা বিষম বিরক্তিতে তাহার দিকে চাহিল। বিরক্তি-কাতর-কণ্ঠে ললিত বলিল, আপনারা কি আমাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন? একটু আস্তে আস্তে খেলুন না, নইলে আমার এই লেখা-ব্যবসাটা ছাড়তে হবে দেখছি।

ক্ষণকালের জন্য সবাই চুপচাপ; তারপর সুপ্রীতি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শাশুড়ী ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন, অশোকা ঘাড় তুলিয়া ললিতের দিকে চাহিয়া চড়া গলায় বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, তা হলে তো বাঁচি।

ললিত ক্রোধে বিরক্তিতে ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীর বন্ধুদের হাসি তাহার বুকে তীরের মত বিঁধিতে লাগিল, সঙ্কীর্ণ বারান্দা ধরিয়া সে সিঁড়ির সামনে আসিল; ভাবিল, নীচে রাস্তায় জনতার মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার আহত মন একটু নিরিবিলি থাকিতে চায়। হঠাৎ ছাদের সিঁড়ির দিকে নজর পড়াতে সে আশ্বস্ত হইল। সঙ্গে চাবি ছিল—নিঃশব্দে বাড়ির ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল।

ছাদে উঠিতেই একটি দূরের বাড়ির ছাদের দিকে তাহার নজর পড়িল; বাড়ির ছেলেরা ছাদে ব্যায়াম করিতেছে। আকাশের গায়ে মুগুর ডাম্বেল সহ তাহাদের শরীর-সঞ্চালন—ললিতের মনে হাস্যরসের সৃষ্টি করিল। তাহার বিরক্তি ভাব কাটিয়া গেল, দুর্বল শরীর চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

আগে সে দুই-একবার এই ছাদে উঠিয়াছে। কিন্তু তখন ইহা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল না। চারিদিক দেখিয়া তাহার মনে হইল, যেন সে একটি সম্পূর্ণ নূতন রাজ্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং সে যেন পরীর রাজ্য। কলিকাতা শহর যে কত সুন্দর, সে এই প্রথম তাহা দেখিল। প্রাসাদ ও অট্টালিকার চূড়া, কলের চিমনি, নারিকেলগাছের মাথা, সব-সমেত কলিকাতা অপরূপ সৌন্দর্যে শোভা পাইতেছে; গীর্জার চূড়ায় ও দুই-একটি বাড়ির চিলেকোঠায় নানা রঙের পতাকা উড়িতেছে। দূরে খালের জল ইস্পাতের পাতের মত ঝলক দিয়া উঠিতেছে। রাস্তার গাড়ি ঘোড়া ও মানুষের ভিড় যেন পিঁপিড়ার সারি বলিয়া মনে হইল। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যার মেঘে অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য।

বাতাস মৃদু বহিতেছে। ললিতের উত্তপ্ত ললাট কাহার যেন স্নেহ-করস্পর্শে শীতল হইয়া গেল। চিমনির ধোঁয়ার গন্ধই তাহার মনে পুলক-সঞ্চার করিল। শব্দ, গন্ধ, আকাশ, মেঘ, ধোঁয়া, দূরের বাড়ির ছেলেদের কসরত—সবসুদ্ধ তাহাকে তাহার চারতলার ঘরের বিরক্তিকর বাস্তবতা হইতে বহুদূরে লইয়া গেল।

ললিত বিপুল আরামে নিশ্বাস লইতে লাগিল, যেন এত কাল কেহ তাহাকে অন্ধকার গুহায় আটক করিয়া রাখিয়াছিল। ছাদের আলিসায় ভর দিয়া উদাস-আগ্রহে একবার শহরের উপর চোখ বুলাইয়া লইল। পাশেই একটু নীচে একটি বাড়ির ছাদ। চারতলার ঘরটির স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়া ভিতরের খানিকটা দেখা যাইতেছিল। ছবি—ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম ইত্যাদিতে ঘরখানি ভর্তি। কোনও চিত্রকরের স্টুডিও হইবে। চিত্রকর একটি রঙিন রেশমী লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবি পরিয়া আছে, গভীর মনোযোগের সহিত সম্মুখে দেখিতেছে, আনন্দে শিস দিতেছে ও কাগজে আঁচড় কাটিতেছে। সম্ভবত সে কোনও মডেলকে দেখিয়া ছবি আঁকিতেছিল। মডেলটিকে দেখা যাইতেছিল না।

আর্টিস্টের অখণ্ড মনোযোগ, শিসের শব্দ ও কাজের তৃপ্তি দেখিয়া ললিতের বুক জ্বলিয়া উঠিল—কে যেন তাহাকে বাস্তবজগতের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। নিজের বিফলতার চিন্তায় তাহার মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। সে সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। ইহাই তো তাহারও কাম্য! কাজের মধ্যে মগ্ন হইয়া যাওয়া, নিজের সৃষ্টিকে মনের আনন্দে উপভোগ করা, সৃষ্টির মত্ততায় আত্মহারা হওয়া; স্বাস্থ্য আপনিই আসিবে। ডাক্তারের কথা তাহার মনে পড়িল—খোলা জায়গা, নিরিবিলি, বিশুদ্ধ বায়ু।

অনন্ত আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া ললিতমোহন আর একবার চারিদিক দেখিয়া লইল। আকাশে তারা ফুটিতে শুরু হইয়াছে। বাতাসের গতি মৃদুমন্দ। ঠিক, এখানেই তো সব মিলিবে—পর্যাপ্ত বায়ু, বিপুল আলো, নীরব শান্তি। ডাক্তারের নির্দেশমত ললিত হাওয়া পরিবর্তন করিবে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে নয়, এই ছাদের উপরে। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র কয়েকটা লাইন ললিতমোহনের মনে পড়িয়া গেল—

"অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,

এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার !”

সেও এখানে ঘর বাঁধিবে।

এই আকাশ-বাসরের কথা মনে হইতেই সে আরাম পাইল। যাক, শাশুড়ী-শালীসমেত অশোকাকে তো ফাঁকি দেওয়া যাইবে!

ললিতমোহনের হাসিও পাইল। জিনিসটা কত সহজ, অথচ তাহার কাছে কি অপরূপ স্বর্গই না বহন করিয়া আনিবে! পাশের দুইটি বাড়ির চিলে-কোঠার ছায়া দুপুরের দুই-তিন ঘণ্টা ছাড়া সব সময় ললিতের ছাদে পড়ে, একটি মাদুর আর লেখার সরঞ্জাম আনিলেই চলিবে। পাশের বাড়ির আর্টিস্টের চেয়ে এ বিষয়ে সে অধিক ভাগ্যবান। লিখিবার সরঞ্জাম যৎসামান্য।

একদিন তাহার প্রাণে সৃজনের যে অপার্থিব প্রেরণা টলমল করিত—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পঙ্কিলতা ও ধিক্কারে যাহা সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা আবার বুঝি ফিরিয়া আসিবে। হয়তো বা জীবনের আদর্শ ও সার্থকতা সে লাভ করিবে; সেই অদম্য শক্তির আগমনী তখনই তাহার বুকে বাজিতে লাগিল। তাহার মনে বর্তমানের হতাশ্বাসকে চাপা দিয়া ভবিষ্যতের আশা পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। তাহার চিন্তাধারায় চেতনা সঞ্চারিত হইল। সে বাঁচিবে—তাহাকে যে অনেক কিছুই দিতে হইবে।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই ললিতমোহন চুপি চুপি একটি মাদুর, একটি ডেক-চেয়ার ও একটি ছোট্ট জলচৌকি ছাদে রাখিয়া আসিল। সকালে চা খাইয়া সে খাতা পেনসিল হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল এবং অতি সন্তর্পণে ছাদে উপস্থিত হইল। প্রথম কয়েক দিন সে একটি লাইনও লিখিতে পারিল না। মুক্তি ও শান্তির আনন্দ তাহার মনে উপচিয়া পড়িতেছিল। সে ডেক-চেয়ারখানিতে বসিয়া দূরদিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

অশোকার কোনও সন্দেহ হইল না যে, স্বামী তাহাকে এত কাছে থাকিয়া ফাঁকি দিতেছে। কিছুকাল হইতেই স্বামীর দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। খাতা লইয়া ললিতকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া ভাবিল—লাইব্রেরিতে যাইতেছে। এমন সে প্রায়ই যায়।

এমনই করিয়া সাত দিন কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ললিতমোহন বর্ষা-বাদলের দিনে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটি তেরপল সংগ্রহ করিয়া লইয়া পাশের বাড়ির চিলে-কোঠার গায়ে খুঁটি লাগাইয়া তাহা টাঙাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল।

ললিত সকাল-সন্ধ্যা বাহিরে যাইতে লাগিল। শাশুড়ী একদিন বলিলেন, লাইব্রেরিতে বুঝি ঢের কাজ হয়? তাঁহার স্বর শ্লেষপূর্ণ।

অশোকা আহত হইল। তাহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। সম্প্রতি স্বামীর প্রতি বীতরাগ হইলেও সে স্বামীকে ভালবাসিত ও স্বামীগর্বে এখনও সামান্য গর্বিত ছিল। সে নিজেও আজকাল স্বামীর বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কথায় অভিমান আছে, মায়ের মত জ্বালা নাই অবশ্য মেয়ের শুভাশুভ চিন্তায় মাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয় ও মেয়ের অমঙ্গলাশঙ্কায় মায়ের এই কটূক্তির বিরুদ্ধে বলিবারও কিছু নাই। তবু সে ব্যথিত হইল, মা মেয়ের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না।

তাসের আড্ডা নিয়মিত জমিতে লাগিল। রবিবাবুর নূতনতম গানের স্বরলিপি হইতে বালিগঞ্জের আধুনিকতম ফ্যাশন পর্যন্ত কথার আর শেষ ছিল না। অশোকার এসব আর ভাল লাগে না, এত গোলমাল সত্ত্বেও তাহার কাছে ঘরগুলি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। ললিতের অভাব সে এখন অনুভব করে। তাহার মনে হয় স্বামী বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে শুইবার সময় এই দূরত্বটুকু বিশেষভাবে ধরা পড়ে। ললিত তখন কাব্য-সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর! মুখচোখ দিয়া তাহার আনন্দ ঠিকরিয়া পড়ে; অশোকা তাহার ভাগ পায় না। স্বামী যেন তাহার অস্তিত্বও বিস্মৃত হইয়াছে।

স্থান-পরিবর্তনের দশম দিনে ললিতমোহনের মূর্ছাহত বাণী পুনর্জাগ্রত হইল; প্রকাশের বেদনায় তাহার মস্তিষ্ক টনটন করিয়া উঠিল, সে লিখিতে শুরু করিল। বন্যার মত ভাব কলমের মুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে তাহার আংশিক-লিখিত উপন্যাসখানি নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। তাহার 'অন্তর্যামী' তাহাকে লইয়া খেলিতে লাগিলেন। যাহা সে ভাবে নাই, কেমন করিয়া তাহাই সে প্রকাশ করিতে লাগিল! তাহার অন্য দুইটি উপন্যাস যে মামুলী ভাবে লেখা হইয়াছিল এটি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হইল। বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখের আশা-আনন্দের চিরন্তন বারতা সে লিখিতে বসিল। সে যেন এক নূতন মন পাইয়াছে। কিছুদিনের রুদ্ধ আবেগ যেন অদম্য শক্তি সংগ্রহ করিয়া বন্যার বেগে বাহিরে আসিতে চায়। বঞ্চিতের ক্রন্দন,

ব্যথিতের দুর্বলতা এই বন্যাবেগে কোথায় ভাসিয়া গেল; রসে গানে তেজে সৌন্দর্যে তাহার নূতন উপন্যাসখানি অপূর্ব-সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইল।

প্রত্যহ পাঁচ ছয় ঘণ্টা লেখার পর পরিশ্রান্ত অথচ সুখাবিষ্ট চিত্ত লইয়া সে বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে। সমস্তই কেমন যেন অপার্থিব আনন্দে ভরপূর। বিগত তিন বৎসর এই আনন্দ কোথায় যেন লুকাইয়া ছিল। লেখা কাগজগুলি হাতের মুঠার মধ্যে ভাঁজ করিয়া সে ডেক-চেয়ারে আসিয়া বসে; সন্ধ্যার শিশিরে কাগজগুলি ভিজিতে থাকে; শীতল বাতাসের স্পর্শে তাহার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। সে উঠিয়া পায়চারি করিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনের লেখাগুলি মনের মধ্যে গুঞ্জন করিতে থাকে।

শীত আসিয়া পড়িল। প্রথম প্রথম সকালে ও সন্ধ্যায় কাজ করিতে ললিতের কষ্ট হইত। ক্রমে তাহা সহিয়া গেল। তাহার দেহ ও মন ভারি হালকা হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার আগে পাশের বাড়ির ছেলেদের দেখাদেখি সে হাত পা ছুঁড়িয়া ব্যায়াম করিয়া লয়। দৈনন্দিন জাগতিক জীবনযাত্রা হইতে সে এখন বহু উর্ধ্বে।

তাহার এই গোপন-বিহারের কথা সে অশোকার নিকট হইতে সন্তর্পণে ঢাকিয়া রাখে। বারান্দায় দুই-একদিন অশোকার সহিত তাহার দেখা হইয়াছে; সে সোজাসুজি ঘরে ঢুকিয়াছে; অশোকা অনুসন্ধিৎসু নয়—কিছু সন্দেহ করে নাই। না, কিছুতেই তাহাকে এই আকাশ-বাসরের কথা জানিতে দেওয়া হইবে না। সে তাহার উপার্জিত সমস্ত অর্থে সংসার চালাইতে থাকুক, কিন্তু তাহার বড় সাধের সাধনাকে সে যখন অবহেলা করিয়াছে, তখন তাহার সুখদুঃখের খবর সে নাই জানিল। তাহা ছাড়া তাহার আনন্দের খানিকটা এই গোপনতার জন্যই। স্ত্রীর নিকট হইতে তাহার যে এই শারীরিক ও মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ইহাতে সে দুঃখিত নয়। তাহার দিনের কাজে সঙ্গী এখন কেবল সেই পাশের বাড়ির পরিচয়-না-জানা আর্টিস্ট। তাহার শিল্প-সাধনা সে লক্ষ্য করে ও উপভোগ করে। লোকটি খুব পরিশ্রমী। শিস দিয়া গান গাহিয়া সে অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া যায় এবং অবসরমত মডেলদের লইয়া চিত্তবিনোদন করে। অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের নিষিদ্ধ প্রেমাভিনয় সে দেখিয়াছে।

মাঘের এক সন্ধ্যায় তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যবিহারে বাধা পড়িল। যে

সংসারকে সে নীচে ফেলিয়া আসিয়াছে ভাবিয়াছিল—তাহারই এক বেদনা-তরঙ্গ তাহার আকাশ-বাসর আলোড়িত করিয়া দিল।

সমস্ত দিন গুমট করিয়া ছিল; চারিদিকে কেমন একটা নিরানন্দ ভাব; খণ্ডমেঘ-ভরা আকাশ পাণ্ডুর; চিমনিগুলি যেন বিষোদ্‌গিরণ করিতেছিল। সমস্ত শহর মূর্ছাপন্ন; আনন্দ-কলোচ্ছ্বাসের স্থলে শহরের কোলাহল ব্যথিতের ক্রন্দন বলিয়া বোধ হইতেছিল। খালের জল কালো হইয়া আসন্ন কি একটা দুর্যোগের যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথম দিকটা ললিতমোহন এসব কিছুই লক্ষ্য করে নাই; সে আপন মনে লিখিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ অস্তগামী সূর্যের দিকে দৃষ্টি পড়াতে সে চমকিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন সূর্যরশ্মি বেদনায় পাণ্ডুর; চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। সে ছাদের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। আর্টিস্টের স্টুডিওর স্কাইলাইট বন্ধ ছিল; ভিতরের আলো খালি দেখা যাইতেছে। ভিতর হইতে বাঁশীর আওয়াজ কানে আসিতেছে ও বাঁশীর তালে তালে মেঝেতে পা-ফেলার শব্দ শোনা যাইতেছে। সহসা সেই মৌন সন্ধ্যায় ললিতের আকাশ-বাসর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিল; সে যেন জনশূন্য মরুভূমির মাঝে পড়িয়া আছে। তাহার লেখার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ভিতরের আগুন নিব-নিব হইয়া তাহাকে যেন ভস্মমাত্রে পরিণত করিয়াছে। সে একজন সঙ্গী চায়। অনন্ত শূন্যে নিজেকে ভারী একাকী মনে হইল।

হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টি পড়াতে দেখিল সে একা নহে। আর্টিস্টের ঘরের ছাদে একটি মেয়ে স্থির ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে—যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি! মেয়েটির পরনে একটি নীল শাড়ি—যেন সে বাহিরে যাইবার জন্য সজ্জিত; তাহার চেহারাটি ভারী মধুর—বিষাদ-করুণ।

ললিতের অস্তিত্ব মেয়েটি একেবারেই টের পায় নাই—সে একদৃষ্টে নীচে পথের জনতার দিকে চাহিয়া ছিল। পাছে তাহাকে দেখিয়া মেয়েটি কিছু মনে করে, ভাবিয়া ললিত অন্তরালে থাকিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি সহসা আলিসার ধার হইতে সরিয়া আসিয়া অশান্তভাবে ছাদে পায়চারি করিতে লাগিল। ললিত গোপনে থাকিয়া তাহাকে দেখাটা অন্যায় মনে করিল না; কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল তাহার উপস্থিতি প্রয়োজন; মেয়েটি ঠিক প্রকৃতিস্থ নহে। সে ছাদে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। মানুষের বিয়োগান্ত নাটকের

অপরার্ধ—অর্থাৎ নির্যাতিত নারীর দিকটি সে যেন সম্মুখে দেখিতে পাইল। যে বেদনা সে অশোকার কাছে পাইয়াছে, সেই বেদনাই বুঝি ইহাকে এই ছাদে শান্তির খোঁজে টানিয়া আনিয়াছে। এই অসীম আকাশের নীরবতার মধ্যে সে বুঝি তাহারই মত ডুবিতে চায়।

ললিত অবিলম্বে বুঝিতে পারিল, মেয়েটির ব্যথা একটু ভিন্ন ধরনের; সে আরও বেশী নিঃসঙ্গতা চায়—যেন তাহার অবসাদ কিছু করিবার অভাবে নহে, সৃষ্টিশক্তির প্রেরণায় নহে, জীবনের সহিত দ্বন্দ্বে সে ধ্বংসকেই যেন বরণ করিতে চায়। তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তিসম্পন্ন, কানের দুল দুইটি পর্যন্ত ঠিক স্বাভাবিক ভাবে দুলিতেছে না; তাহার মুখাবয়বে ও অঙ্গুলি-সঞ্চালনে একটা উগ্রতা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

মেয়েটি চকিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া হঠাৎ আলিসার উপর দাঁড়াইল। সে কি করিবে ললিত ইতিপূর্বেই স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিল; সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া আসিয়া পাশের বাড়ির ছাদে নামিয়া পড়িল ও মেয়েটি কিছু বুঝিবার পূর্বে অতর্কিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

তাহাকে ধরিয়া টানিয়া নামাইতেই সে উন্মত্তের মত ললিতকে মারিতে লাগিল; আঁচড়-কামড় সত্ত্বেও ললিত তাহাকে সবলে ধরিয়া রহিল। এই ধস্তাধস্তির পরে দুইজনেই আলিসার পাশে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল, মেয়েটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিষম উত্তেজনায় তাহার অধরোষ্ঠ কম্পমান। নীচের রুদ্ধ-দ্বার স্টুডিওতে বাঁশী তেমনই বাজিতেছিল; সশব্দ তালের শব্দ তেমনই চলিতেছিল।

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে ললিতের হাত ধরিয়া মেয়েটি বলিল, আপনি কেন আমায় বাধা দিলেন? আপনি কতবড় নিষ্ঠুরের কাজ করলেন তা জানেন না। আপনি কেন আমার এমন শত্রু হলেন?

মেয়েটি কাঁদিতে লাগিল। ললিতের মনে পড়িল—বিবাহের কিছুদিন পরে তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া একদিন অশোকা শান্তির প্রত্যাশায় তাহারই বুকে মাথা রাখিয়া এমনই কাঁদিয়াছিল। বেদনার সেই মূর্তি! কি অল্প আঘাতেই ইহারা এমন ভাঙিয়া পড়ে!

সে বলিল, কি হয়েছে আপনার? জীবনটাকে নষ্ট করতে চাইছেন কেন? কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখুন—হয়তো আজকের এই অসহ্য দুঃখ

আপনার আর থাকবে না, মিছিমিছি আত্মহত্যা করে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেতে চাওয়া দুর্বলের লক্ষণ। দুঃখ-কষ্টকে এত ভয় কেন?

মেয়েটি কথা বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ললিত বলিল, দুঃখ জিনিসটা বরাবর থাকে না। ওটা আসে আবার চলে যায়। একটু সহ্য করে থাকুন। আমার বিশ্বাস, আপনার যত বড় দুঃখই হোক, বেশীদিন থাকিবে না।

মেয়েটি ব্যথিত দৃষ্টি লইয়া ললিতের দিকে চাহিল। তাহার মুখের অস্বাভাবিক ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুখ ছাইয়ের মত সাদা। সে ধীরে ধীরে বলিল, আমি জানি, আমি ভীরু, কিন্তু যন্ত্রণাও বড় কম পাই নি।

শারীরিক যন্ত্রণা, না, মানসিক? আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসেন না—এই তো কষ্ট?

মেয়েটি প্রায় আত্মগতভাবেই বলিল, ভালবাসেন—খুবই ভালবাসেন, কিন্তু সে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে। তিনি আমার কাছে আসেন বাইরের সব অশুচি গায়ে মেখে; আমি সহ্য করতে পারি না। নিজেকে বড্ড অপমানিত মনে হয়।

ললিত স্তব্ধ হইয়া গেল। ইহার উত্তরে সে কি কথা বলিবে? জীবন্ত প্রাণীকে একেবারে মারিয়া না ফেলিলে যেমন তাহার হৃৎস্পন্দন বন্ধ করা যায় না, এই অশুচির ব্যথা ভুলাইবার জন্য সে আর কিছু বলিতে পারে না। মেয়েটি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, এইসব দেখেশুনে আমার জীবনে ধিক্কার এসেছে—আমি আর পারি না। বুকের উপর ন্যস্ত হাত দুইখানি দারুণ অবসন্নতায় তাহার পাশে ঝুলিয়া পড়িল। সে যেন সহসা বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। ভীতচকিত ভাবে বলিল, আমি কি বলছিলাম? আপনি কে?

ললিত তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া শান্তভাবে বলিল, ব্যস্ত হবেন না। আপনিই তো বললেন, আমি আপনার শত্রু; ধরুন তাই। তবে আপনার জীবনটাকেও শত্রু ভাববেন না। এখন হয়তো জীবনকে ঘৃণা করছেন, কিন্তু কালই আবার জীবনটাকে ভাল লাগবে। দুঃখকষ্ট তো আছেই।

বিহ্বলভাবে ললিতের দিকে চাহিয়া মেয়েটি পূর্বাপর ঘটনাটি ভাবিতে লাগিল; সবটা মনে পড়িল না। ললিতের সরল কথাবার্তায় ও সহজ প্রশ্নোত্তরে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার ধীরে ধীরে নিজের মনের কথা উদ্ঘাটিত

করিতে লাগিল। বলিল, বেঁচে থাকতে আর চাই না—এই ভাঙা বুক আর পীড়িত মন নিয়ে।

আচ্ছা, আপনার স্বামীকে কেন একেবারে শেষ দেখতে দেন না; ঘা খেলেই তিনি হয়তো ফিরবেন।

না না, তার চাইতে মৃত্যু ভাল। বেঁচে থেকে একেবারে তাঁকে ছাড়তে পারব না।

আচ্ছা, আপনার কি স্বামী ছাড়া অবলম্বন আর নেই? ছেলেপিলে?

না।

বড় কোন কাজ, কি গান-টান কিছু?

ছিল, কিন্তু স্বামী সেসব পছন্দ করতেন না। তিনিও আমাকে সম্পূর্ণ নিজের করে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন।

স্বামীর কথায় এইসব ছেড়ে দিয়েই আপনি আত্মহত্যার পথ ধরছেন—মেয়েদেরও নিজস্ব একটা অবলম্বন চাই। স্বামী-সন্তানের অধিকারের বাইরে—

অশোকার কথা মনে হইতেই তাহার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আপনি বুঝি গান-বাজনা পছন্দ করতেন?

হ্যাঁ। আমাকে দয়া করে যেতে দিন; আমি বড্ড ক্লান্ত।

ললিত সরিয়া আসিল। সেও তো ক্লান্ত। সে শুধু বলিল, আপনি একেবারে না মরেও হয়তো এখন শান্তি পেতে পারেন। নিজেকে অত সহজে ধরা দেবেন না, একটু দুষ্প্রাপ্য করে তুলুন নিজেকে। সব ঠিক হয়ে যাবে। মরলেই তো সব গেল। আজকের এই মেঘ কাটতেও পারে। নিজের মধ্যেই বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পাবেন। শুধু নিজেকে একটু অবকাশ দিন।

এতক্ষণে মেয়েটি চারিদিকে চাহিবার অবসর পাইল।—আমি কোথায় আছি ভুলে গেছলুম। আপনাদের বুঝি ওই ছাদ?

হ্যাঁ, ওই ছাদের কোণে আমার আকাশ-বাসর।

নীচের ঘরের বাঁশীর সুর ও পায়ের তাল কানে আসিতেই মেয়েটির ভাবান্তর হইল। বহুকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া সে বলিল, ওই শুনুন।

এ তো সহ্য করতেই হবে।

আচ্ছা, আপনি ছাদে বসে কি করেন?

আমি পৃথিবীর সুখ-দুঃখের আশা-আনন্দের কথা ভাবি আর সেই ভাবনাগুলো লিখে রাখি। দুঃখকে কাটিয়ে ওঠার এ এক সহজ উপায়। পৃথিবীর সবাইকে নিয়ে আমার কারবার—আমি, আপনি, আমার অন্ধ স্ত্রী—

আহা, আপনার স্ত্রী অন্ধ!

শুধু অন্ধ নয়, কিছু শুনতেও পায় না, বলতেও পারে না।

আপনি লেখক বুঝি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, বেঁচে থাকতে আপনার বেশ ভাল লাগছে?

খুব—মরতে চাইব কোন্ দুঃখে?

আমি যখন গান শিখতুম, আমারও তাই মনে হত। আমি বেশ ভাল গাইতে পারতুম—এস্‌রাজও বাজাতে পারতুম।

মেয়েটি কপালে হাত রাখিল। বলিল, আমি নীচে যাই, আমার ভারী লজ্জা করছে।

ভাল লক্ষণ বটে।—বলিয়া ললিত সিঁড়ির দরজা পর্যন্ত মেয়েটিকে আগাইয়া দিল।—আর কখনও ওপরে আসবেন না। যদি কখনও এস্‌রাজটিকে সঙ্গে আনতে পারেন, আসবেন। আমার এই নিভৃত আকাশ-বাসরে আজকের মত কোনও অনাচার আমি সহ্য করব না।

মেয়েটি ললিতের এত সব রুদ্ধ মনের কথা শুনিয়া কি বুঝিল জানি না, বিবর্ণ মুখের কোণে তাহার একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল—বুঝি তাহা প্রাণ ফিরিয়া পাইবার আনন্দের বিকাশ। সে নীচে চলিয়া গেল।

ললিত নিজের উচ্ছ্বাসে লজ্জিত হইল, ভাবিল, যাই হোক মেয়েটি আমাকে আর মুখ দেখাইবে না। কিন্তু সে ইহা ভাবিয়া সুখী হইল না। সেও ক্লান্তমনে শ্রান্তদেহে আপনার নীড়ে ফিরিয়া আসিল।

সে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাসে পায়চারি করিল। ধোঁয়ার ভিতর দিয়া পথের আলোগুলি মিটিমিটি জ্বলিতেছে—হতাশার মধ্যে ক্ষীণ আশার মত। বাঁশীর সুর তখনও থামে নাই। কাগজপত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া সে মনে মনে বলিল, সব ঝুট হ্যায়—সে শুধু শান্তিতে থাকিতে চায়। কিন্তু যাহার উপর এই অভিমান, সেও তখন অভিমানে মনের কপাট রুদ্ধ করিয়াছে—ভুল দিয়া ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

ললিত সন্তর্পণে নামিয়া আসিল।

দিন পনরো পরে সন্ধ্যার খানিক আগে ললিত তাহার উপন্যাসের উপসংহার লিখিতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ এস্‌রাজের মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। নিশ্চয়ই সে। লেখা বন্ধ করিয়া ললিত উঠিয়া পড়িল। কিনারায় আসিয়া দেখিল—সেই বটে। ছাদের এক কোণে বসিয়া আপন মনে এস্‌রাজের তারে ঝঙ্কার দিতেছে। ললিতের মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। তরল ধারার মত সুর যেন গলিয়া পড়িতেছে। রাগিণীটি শেষ হইতেই মেয়েটি উপরের দিকে চাহিয়াই লজ্জায় মুখ নামাইল। এস্‌রাজটি ছাদের উপর রাখিয়া আলিসার ধারে আসিয়া ললিতকে ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, আমি আবার বাজাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু হাত চলে না। অনেক দিনের অনভ্যাস—

ললিত বলিল, কেন, আপনি তো চমৎকার বাজাচ্ছিলেন!

চমৎকার, না ছাই! বা রে, আপনার এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলে তো চলবে না—লিখুন গিয়ে; আমি আপনার কাজে বাধা দিচ্ছি দেখছি।

অপরিচিতার এই আগ্রহ দেখিয়া ললিত একটু হাসিল, কিন্তু তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। অশোকার স্মৃতি? সে বলিল, না না, আপনার ভারী ক্ষমতা, আপনি বাধা দেবেন আমাকে? এ তো আর ঘরের অন্ধকার নয়—এখানে অসীম বিস্তার, প্রচুর অবকাশ। আজকের দিনটি ভারী সুন্দর, না? তেমন শীত নেই।

তা হোক, আমি নীচে যাচ্ছি, আপনার কাজের ক্ষতি হতে দেব না। আপনার লেখা কেমন চলছে?

চমৎকার। বইখানা ভাল ওতরাবে বোধ হয়।

নিশ্চয়ই, ভাল হতেই হবে।—বলিয়া মেয়েটি এস্‌রাজের কাছে গিয়া সেটি কোলে লইয়া বসিল। ললিত ফিরিয়া আসিয়া আবার লিখিতে বসিল। কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া ফিরিয়া এস্‌রাজের ঝঙ্কার আর মেয়েটির শান্ত চোখ দুইটি ললিতের মনে পড়িতে লাগিল।—অশোকার চাইতে বড়, না, ছোট? বড়ই হবে। সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণাতেই তো ওর বয়সে ঢের বেড়ে গেছে। অশোকা তো দুঃখ কাকে বলে এখনও জানে না। সে যে কিশোরী মেয়েটির মতই চঞ্চল। যাক্ গে ছাই, এসব ভাবি কেন?—ললিত বেড়াইতে লাগিল।

এমনই করিয়া অনন্ত আকাশের কোলে দুইটি নীরব সাধকের সাধনা

চলিতে লাগিল। ক্বচিৎ কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়—এস্‌রাজের ঝঙ্কারে তাহার আভাস পাওয়া যায়; কথাবার্তা বড়-একটা হয় না। ললিত যখন উচ্ছ্বসিত মন লইয়া কথা বলিতে আসে, মেয়েটি তখন প্রায়ই নীচে নামিয়া যায়।

একদিন মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, কই, আপনার স্ত্রী তো কোনদিন ওপরে আসেন না?

ললিতের মুখের উপর হাসি ও অশ্রু একসঙ্গে খেলিয়া গেল। সে বলিল, না, ও জানে না—আমি এখানে আসি।

আপনি লুকিয়ে আসেন বুঝি? ভারী অন্যায় আপনার। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী অন্ধ বোবা কালা—সত্যি তো?

ললিত চুপ করিয়া রহিল। কি বলিবে সে!

বলুন না?

আমার সম্বন্ধে ও তিনই—আমি তার অপদার্থ স্বামী; অনেক আশায় ও আমায় বিয়ে করেছিল; আমি সব আশায় ছাই দিয়েছি।

ও, বুঝেছি। আমি কিন্তু অপদার্থ লোককে বিয়ে করলে সুখী হতে পারতুম। জীবন-যুদ্ধে জয়ী যারা তাদের কথা আপনার স্ত্রী যদি জানতেন! আচ্ছা, আপনার এ বইটার যদি খুব কাটতি হয়, তা হলে?

ললিতকে সে যেন কশাঘাত করিল; সে মুখ ফিরাইয়া দূরে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল, বুঝেছি, আপনি এত দাম দিয়ে কেনা সাফল্যের বিনিময়ে তাকে আর ফিরে পেতে চান না। ছি! আপনি কি নিষ্ঠুর!

দুইজনে বিষণ্ণ মনে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল।

ললিতের উপন্যাসখানি শেষ হইল। কিন্তু যতটা আনন্দ সে পাইবে কল্পনা করিয়াছিল, তার সামান্য অংশও পাইল না। সৃষ্টির মধ্যে হয়তো পরশপাথরের সন্ধান ছিল, কিন্তু সমাপ্তিতে তাহা যেন নুড়ি-মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। কেন এমন হইল—ভাবিতে গিয়া অশোকাকেই মনে পড়িয়া গেল।

সে আর একখানি উপন্যাস লিখিতে শুরু করিল।

প্রথম উপন্যাসখানি শেষ হইবার পর রাত্রে খাইবার সময় সে অশোকাকে তাহা জানাইল। অশোকা ক্ষুণ্ণ হইল; তাহার দাবি কি শুধু এইটুকু? বলিল, এক মাস তুমি খুবই খেটেছ দেখ্‌ছি। তাহাকে আরও আঘাত

দিবার জন্য ললিত বলিল, হ্যাঁ, খুবই খাটুনি হয়েছে বটে। অশোকাও খোঁটা দিয়া বলিল, লাইব্রেরিতে খুব শান্তিতে কাজ করতে পাও বুঝি?

হ্যাঁ, সেখানে ভারী নিরিবিলি।

অশোকা গম্ভীরভাবে বলিল, বাড়িতেও তুমি খুব নিরিবিলিতে কাজ করতে পারতে। আর কেউ এখানে আসে না।

সে কি! মা, দিদি—এঁরা?

কেউ না, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি।

ঝগড়া! কেন?

ঝগড়া তোমাকে নিয়েই।—বলিয়াই অশোকা অন্য কথা পাড়িল। সেই অভিমান! ললিত জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি অশোকা? নির্লিপ্তভাবে অশোকা বলিল, সেকথা থাক্—যা হবার তা তো হয়েই গেছে। হ্যাঁ, তোমার এই বইটা যদি ভাল চলে, আমাকে দার্জিলিঙ নিয়ে যেতে হবে। এবার গৌরীদিরা যাবে।

ললিতের মন ভিজিয়া আসিয়াছিল; শেষের কথা শুনিয়া আবার সে কঠিন হইল। বুঝিল, মিলনের চেষ্টা বৃথা—কোথায় যেন কি গোলমাল হইয়া গিয়াছে।

স্বামীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অশোকাও বাঁকিয়া বসিল। পরস্পর আবার বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় উপন্যাসের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অজানিত মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যে ললিতের শরীর আবার ভাঙিতে শুরু হইয়াছে। সে প্রথম বইখানি লইয়া কোথায়ও গেল না। যে যশকে সে এত কাম্য ভাবিয়াছিল, হাতের কাছে তাহাকে পাইয়াও সে ছাড়িয়া দিতে দ্বিধা করিল না। কাজের জন্য প্রচুর নিভৃত অবকাশ, আলো ও হাওয়া ছাড়া আরও কিছু সে চায়, কিন্তু সে যাহা চায় তাহা তাহাকে কে দিবে? যে দিতে পারে, সে নিজের দোষে ও ললিতের হতাদরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ললিতের এমন দুর্বল শরীর সে দেখিয়াও দেখিল না।

সেদিন ললিতের শরীর খুবই খারাপ ছিল, মনও ভাল ছিল না। কিসের প্রত্যাশায় মন্ত্রচালিতের ন্যায় সে অশোকার কাছে গিয়া দেখিল, সে বাক্স ইত্যাদি গুছাইতেছে। কোথায়ও যাইবার আয়োজন। ললিতের মনের আবেগ পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের মত ভাঙিয়া-চুরিয়া ছড়াইয়া পড়িল। সে

বিরক্তভাবে বলিল, কোথা যাওয়া হচ্ছে শুনি? অশোকা সহজ ভাবেই বলিল, দার্জিলিঙ। গৌরীদি চিঠি দিয়েছে সেখানে যেতে।

বেশ।—বলিয়া ললিত ঘরের বাহির হইয়া গেল। হায় রে, যশ আর খ্যাতি! একটি আঘাতেই সমস্ত বিস্বাদ হইয়া গেল।

অশোকা চলিয়া গেল। ললিত ভাঙা শরীরে ছাদের কোণে আশ্রয় লইল; এবার কিন্তু নির্ভয়েই। বুড়ী ঝি মঙ্গলার মা উপরে গিয়া তাহার খাবার দিয়া আসে। সে বেশীর ভাগ সময় ছাদেই কাটায়; কিন্তু কাজ আর বেশী অগ্রসর হয় না। সে নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকে।

কয়েক দিন হইতে পাশের বাড়ির মেয়েটিরও দেখা নাই। ললিতের দুর্বল শরীর আরও দুর্বল হইতে লাগিল। দ্বিতীয় উপন্যাসখানিও শেষ হইল; কিন্তু সুখ শান্তি আসিল কই? মাঝে মাঝে সে ভাবে, বুঝি অশোকার দীর্ঘশ্বাসে তাহার সাধনা অভিশপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পীড়া যে তাহার নিজেরই মনের মধ্যে সেটুকু সে স্বীকার করে না। সে কোনও প্রকাশকের কাছে গেল না। উপন্যাস দুইখানি সযত্নে নিজের কাছে রাখিয়া দিল। কি হইবে প্রকাশ করিয়া?

তাহার আকাশ-বাসরের সঙ্গিনীটিকে একদিন দেখা গেল, বিবর্ণ শরীর লইয়া আলিসার উপরে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া। ললিত তাহাকে কাছে ডাকিল। স্টুডিওতে আলো ছিল না। মেয়েটিও এস্রাজ লইয়া আসে নাই। ললিতের ভয় হইল। আবার বুঝি সেদিনের মত—

বলিল, আপনার এস্রাজ কই?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল, ভয় নেই। আমার স্বামীর বড় বিপদ—উদ্ধারের বুঝি কোনও উপায় নেই।

ললিত চকিত হইয়া উঠিল। বলিল, ব্যাপার কি? সঙ্গিনীর কথা শুনিয়া বুঝিল, আর্টিস্টটি কিছুকাল যাবৎ আয়ের অধিক ব্যয় করিতেছিল—আপনার খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। কোথা হইতে হ্যাণ্ডনোট দিয়া টাকা ধার করিয়াছে। শোধ দিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। তাহার নামে ডিক্রীজারি হইয়াছে। স্ত্রীর গহনা-পত্র যাহা ছিল ইতিপূর্বেই বন্ধক পড়িয়াছে, ছবিও সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পাওনাদার হয় জিনিসপত্র সব ক্রোক করিবে, কিংবা তাহাকে হাজতে লইয়া যাইবে।

মেয়েটির চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল, ললিতের জীর্ণ বুকের

অন্তস্তল হইতে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। হায় রে, ওই স্বামী—তাহার জন্যও কান্না! আর অশোকা!

সে বলিল, দু-একদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। দেখি যদি নতুন বই দুটো দিয়ে কিছু পাই।

মেয়েটি আবেগকম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিল, না না, সে কিছুতেই হবে না। আপনার বুকের রক্ত দিয়ে গড়া জিনিস এমন করে আমি নষ্ট করতে দেব ন। তাড়াতাড়িতে হয়তো কিছুই দাম পাবেন না। আপনার এই রোগা শরীরে সেটা সইবে না। আর আপনার স্ত্রীরও তো একটা দাবি আছে। আমিই বা কে যে আমার জন্যে এত করবেন?

আমার আর কে আছে, যার জন্যে আমি কিছু করতে পারি? এই সামান্য সুখটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। কাল পরশু একবার খবর নেবেন।—ললিত আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, বলিল, আপনি যান।

ডেক-চেয়ারটিতে বসিয়া ললিত তাহার বুক-নিংড়ানো ধন দুইটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। পাতা উলটাইতে উলটাইতে এক জায়গায় চোখে পড়িল—

মানুষের ব্যথার ইতিহাসই চিরন্তন ইতিহাস নয়। মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিনিয়ত বাহিরের ও ভিতরের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইবে, জীবনে বিশ্বাস হারাইবে; কিন্তু একদা রৌদ্রালোকে কুয়াশারই মত সমস্ত ব্যথা, সমস্ত দৈন্য তাহার নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে। সেই শুভ মুহূর্তের জন্য চিরন্তন মানব প্রতীক্ষা করিয়া আছে। হয়তো এ জীবনে সে মুহূর্ত না আসিতে পারে। পথিক মানবের পথ চলাই পথের সমাপ্তি নহে। সঙ্কীর্ণ মন দিনে দিনে প্রসার লাভ করিতেছে। একদিন সে নিঃশেষে সম্পূর্ণ অপরিচিতের হাতে আপনার সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া বিগত দিনের দুঃখযন্ত্রণা ভুলিয়া ভাবিবে, পথের সন্ধান মিলিয়াছে।

তাহারও বুঝি পথের সন্ধান মিলিবে।

ললিত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মঙ্গলাকে ডাকিয়া একটি বিখ্যাত পাবলিশার্সের নামে চিঠি দিয়া তাহার প্রথম উপন্যাসখানি পাঠাইয়া দিল। চিঠিতে লিখিল—বইখানি পছন্দ হইলে তাহার প্রথম সংস্করণের জন্য যে কিছু মূল্য নির্ধারণ করেন, তাহা যেন কল্যাই তাহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

মঙ্গলা ফিরিয়া আসিল। ললিত কম্পিত চিত্ত লইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যদি না মনোনীত হয়! না, তাহার এত পরিশ্রমের ফল কখনই ব্যর্থ হইবে না।

পরদিন সুসংবাদ আসিল। বইখানি পছন্দ হইয়াছে। প্রকাশক প্রথম সংস্করণের জন্য পাঁচ শত টাকার চেক পাঠাইয়াছেন। আকাঙ্ক্ষিত জয়শ্রী তাহার মুখে একটু শীর্ণ হাসি টানিয়া আনিল মাত্র।

পরদিন সকালবেলায় মেয়েটি আসিল। আসন্ন ঝড়ের ভয়ে মুখ বিবর্ণ, শরীর কাঁপিতেছে। আদালতের লোক আসিয়াছে। ললিত হাত বাড়াইয়া চেকখানি তাহার হাতে দিল। সে ছলছল চোখে ললিতের হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল মাত্র। কোন কথাই বলিতে পারিল না। তারপর দ্রুত নীচে নামিয়া গেল।

ললিতের লেখা সার্থক হইল। ইহার চেয়ে অধিক কিছু সে প্রত্যাশা করে নাই। ভগবান তাহার পরিশ্রমের অযাচিত মূল্য দিয়াছেন। তাহার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতে লাগিল। অশোকার কথা মনে পড়িল। আজ আর তাহার বিরুদ্ধে মনে কোনও গ্লানি নাই—শাশুড়ীর বিরুদ্ধেও না।

দিন কয়েক পরে তাহার আকাশ-বাসরের সঙ্গিনী আসিল স্বামীকে সঙ্গে করিয়া। স্বামীটি বোধ হয় শোধরাইয়াছে। মেয়েটি বলিল, ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার অপমান করব না। আমার স্বামী আপনার ঋণ স্বীকার করতে এসেছেন। সামর্থ্য হলেই শোধ দেবেন।

আর্টিস্ট বলিল, আমি আমার স্ত্রীর কাছে সব শুনেছি—আপনি মহৎ লোক। আজ আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন জীবনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারি।

ললিত হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে গেল, কিন্তু তাহার রুগ্ন শরীর এতটা উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিল না। সে সহসা চোখে অন্ধকার দেখিল ও মূর্ছাহতের মত বসিয়া পড়িল। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে একসঙ্গে চমকিয়া উঠিয়া ললিতের ছাদে উঠিয়া আসিল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ডেক-চেয়ারে বসানো হইল। দুইজনেই সভয়ে দেখিল, ললিতের গা বেশ গরম। ললিত বলিল, ভয় নেই, একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছিলুম। এখন সেরে উঠেছি। মেয়েটি শুনিল না, তাহার স্বামীকে ঠেলিয়া ডাক্তার আনিতে পাঠাইল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া শঙ্কিত হইলেন—যক্ষ্মা। স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই

শিহরিয়া উঠিল। ললিতও শুনিল, কিন্তু কিছু বলিল না। তাহার ঠোঁটের কোণে সেই মৃদু হাসিটুকু ফুটিয়া রহিল।

দুর্বল শরীরে সে কঠিন পরিশ্রম করিয়াছে, ঠাণ্ডা লাগাইয়াছে অথচ পুষ্টিকর আহার পায় নাই, স্ত্রীর যত্ন পাইতে পারিত, কিন্তু হতভাগ্যের ভাগ্যে তাহাও জোটে নাই। শরীর আর কতদিন টিকিতে পারে? ডাক্তার বলিলেন, আর বেশীদিন নয়। ওঁকে নীচে নিয়ে যান আর ওঁর বাড়ির লোকদের খবর দিন।

ললিত বাঁকিয়া বসিল—জীবনে যাহাকে চাহিয়াও পায় নাই, মৃত্যুতেও তাহাকে কাছে চাহিবে না। বলিল, না, অশোকাকে খবর দেবেন না— এইটি মাত্র আমার একান্ত অনুরোধ। বরঞ্চ পিসীমা আসুন। আর নীচের ঘরে সে মরিবে না। এই আকাশ-বাসরেই তাহার জীবন শেষ হইয়া যাক— এইখানেই টিন দিয়া কিংবা টালি দিয়া উপরের একটা আচ্ছাদন তুলিয়া দিলেই হইবে; অন্ধকার ঘরে মৃত্যুকে সে বরণ করিতে পারিবে না।

টালি দিয়া ঘর তৈয়ারি হইল। পিসীমা আসিলেন। অশোকা দার্জিলিঙে হাওয়া খাইতে লাগিল, এসবের কিছুই জানিল না।

আর্টিস্ট সকাল সন্ধ্যা আসে। মেয়েটি তো দিনরাত্রি ললিতের সেবায় লাগিয়া রহিল। পিসীমা চিরদিন নির্বাক; আজিও নির্বাকভাবে হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের শিয়রে বসিয়া থাকেন। ডাক্তার আসা বন্ধ হইল। ললিত গভীর পরিতৃপ্তির সহিত মৃত্যুকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইল। বাহির হইতে দেখাইত যেন তাহার মনে কোন ক্ষোভ নাই, কোন দুঃখ নাই, কিন্তু তাহার আকাশ-বাসরের সঙ্গিনী তাহার মর্মকোণের ব্যথার কাহিনী জানিত। জানিত, তাহার বেদনা কত নিবিড়; অশোকার জন্য তাহার দুঃখ হইত। হায় হতভাগিনী, রত্ন চিনিল না। তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিত। ললিত হাসিত। সে হাসি কান্নায় ভরা।

ললিতের সাধের উপন্যাস 'করুণা' বাজারে বাহির হইল। কাগজে অযাচিত প্রশংসা—হুহু করিয়া বই কাটিতে লাগিল। ললিতমোহনের খ্যাতি সবত্র ছড়াইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল, 'করুণা' সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে—লেখক অমর হইয়া থাকিবে।

প্রকাশক 'করুণা'র পরের সংস্করণের জন্য ও লেখকের অন্য কোন বই লেখা থাকিলে তাহার জন্য কন্‌ট্রাক্ট করিতে ব্যস্ত হইলেন। অসম্ভব মূল্য

দিতেও তিনি পিছ্‌পা নহেন। তিনি যেদিন ললিতের কাছে গেলেন, তখন যমের সঙ্গে তাহার কনট্রাক্ট হইয়া গিয়াছে।

দার্জিলিঙে অশোকার কানে স্বামীর বিপুল খ্যাতির বার্তা পৌছিল। স্বামী যে খ্যাতি-নিন্দার বাহিরে যাইতে বসিয়াছেন, সে খবরটুকু পৌছল না। মা দার্জিলিঙে ছিলেন। মা বলিলেন, বেবী, তোর কপাল ফিরেছে। আমি বরাবরই জানি, ললিত একটা কিছু করবেই করবে; তার মত খাতির আর কে পেয়েছে! অশোকা চুপ করিয়া রহিল। মা বলিলেন, বেবী, চল্, কলকাতায় যাই, এ সময় তোর তার কাছে থাকা দরকার। অনেক টাকা হাতে আসবে—হয়তো সব বাজে খরচ করে বসবে।

খরচের ভয়ে বা অর্থলোভে নহে, অন্য কারণে অশোকা ললিতের কাছে যাইতে চায়। নিজের সঙ্গে যুদ্ধে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। তাহাদের এই ঝগড়ার জন্য সে যতবারই স্বামীকে দোষী করিতে চাহিয়াছে ততবারই সে স্বামীর দোষ খুঁজিয়া পায় নাই—নিজের প্রচণ্ড অভিমান ও নীচতাকেই তাহার কারণ বলিয়া মনে হইয়াছে। অভিমান তখনও পুরামাত্রায় আছে, কিন্তু ক্ষমা চাহিবার জন্য মন ব্যাকুল। সে আর পারে না এই অকারণ দ্বন্দ্বকে জীয়াইয়া রাখিতে। হয়তো এখনও সময় আছে—শুধু তাহার নিরীহ স্বামীকে লইয়া আবার সে সুখের স্বর্গ গড়িতে পারে; মা বোন নাই-ই থাকিল।

সেদিন সকাল হইতেই আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন—গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের প্রলেপে নীলাকাশে যবনিকা পড়িয়াছে। ললিতের আকাশ-বাসর কাল-বৈশাখীর তাণ্ডবলীলার প্রতীক্ষা করিতেছে। ললিত মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল ও প্রলাপ বকিতেছিল—খালি অশোকার আর আকাশ-বাসরের কথা। ডাক্তার বলিয়াছেন—সেদিন কাটিবে না। মাঝে মাঝে তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিতেছিল। মেঘভরা আকাশের দিকে চাহিয়া তখন সে প্রবল বর্ষণ কামনা করিতেছিল। সে পিসীমার এক হাত একহাতে ধরিয়াছিল, অন্য হাত তাহার দুঃখদিনের সঙ্গিনীর হাতের মুঠার মধ্যে ছিল। মেয়েটির চোখের জল বাগ মানিতেছিল না।

ললিত শিয়রে হাত দিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল। বালিশের নীচে তাহার দ্বিতীয় উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিল, পিসীমা তাহা বাহির করিয়া ললিতের হাতে দিলেন। ললিত পরম আগ্রহে সেটি হাতে লইয়া নীরবে কিছুক্ষণ তাহা দেখিল। তাহার চক্ষু উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে

তাহার সঙ্গিনীর হাতে সেটি তুলিয়া দিয়া বলিল, দুর্দিনের বন্ধুর এই শেষ দান—আর কিছুই আমার নেই। মেয়েটি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিল। অবিরল জলধারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অদূরে নারিকেলশাখাগুলি বায়ু-তাড়নে হুহু করিয়া উঠিতেছিল—যেন কাহার ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস। ছাদের টালির উপর বৃষ্টিপাতের শব্দ ললিত কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল—যেন কাহার অবিশ্রাম পদশব্দ। ললিত ব্যাকুল আগ্রহে উঠিয়া বসিতে গিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইল।

প্রলাপের ঘোরে সে বলিয়া উঠিল, অশোকা, এস, এস—দেখ, আমার আকাশ-বাসর কেমন নিরিবিলি। কই, তুমি এলে না? বেশ।

সে আবার নিঝুম স্তব্ধ হইয়া পড়িল। সে স্তব্ধতা আর ভাঙিল না। চিরন্তন মানবের চিরন্তন ইতিহাস সমাপ্ত হইল।

১৩৩৩

সতীন-কাঁটা

যে মৎস্যটি পলায়ন করে, সেইটিই যে আকারে বৃহত্তর—এইটাই লোকে মনে মনে স্বীকার করিয়া লয়, কাঁদিতে না বসিলেও হাতছাড়া মাছটিকে লইয়া হা-হুতাশ করিবার প্রলোভনটুকু কেহ ছাড়িতে পারে না। আমাদের নিকুঞ্জবিহারীও তাহার প্রথম পক্ষের মৃত পত্নীকে স্মরণ করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রচুর তুলনামূলক সমালোচনা করিত এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়া বিরজাসুন্দরী অপেক্ষা প্রথমা মালতীলতাকেই সে বেশী নম্বর দিয়া ফেলিত। কিন্তু ইহা তাহার অন্তরতম প্রদেশের গুহ্যতম সংবাদ। বাহিরে সে আদর্শ স্বামী বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে ছাড়িত না; এতটুকু সন্দেহ করিবার কোন কারণ কোনদিন বিরজাসুন্দরীর ঘটে নাই, ঘটিলে নিরীহ নিকুঞ্জবিহারীর দুর্দশার অন্ত থাকিত না।

নিকুঞ্জবিহারী এমন সন্তর্পণে চলিত যে, বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্য কেহ বড় একটা তাহার প্রথম বিবাহের সন্ধান রাখিত না। বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যেই প্রথম পক্ষ হঠাৎ গত হইবার পর নিকুঞ্জবিহারীর জীবন কেমন যেন এলোমেলো হইয়া যায়; স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করিয়া বসে যে, পৃথিবীতে কিছুতেই আর তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। শৌখিন বস্ত্রাদি, প্রসাধন-সামগ্রী ও এম.এ.র পাঠ্যপুস্তকগুলি নিঃশেষে পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া সে ঠনঠনের চটি পায়ে, রুক্ষ কেশে ও মলিন বেশে প্রত্যহ গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় গিয়া আকাশের তারা গুনিতে শুরু করে। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নাই, পড়াশোনা তো অনেক আগেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে চুরুট খাইত না, চুরুট খাওয়া ধরিল। চায়ের দোকানের একটি কোণ অধিকার করিয়া পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাইয়া যায় এবং হস্তস্থিত দৈনিক সংবাদপত্রের মার্জিনে কবিতার নোট লেখে। তাহার অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া তাহার বিধবা মাতা প্রমাদ গণিলেন ও পাড়ার পাঁচজন জানাশোনা লোকের কাছে ইহার ঔষধের সন্ধান চাহিলেন। সবাই বলিল, প্রথমটা অমন হয়, আবার একটি বিবাহ হইলেই সমস্ত উড়ুউড়ু ভাব কাটিয়া গিয়া ছেলে সংসারে থিতাইয়া বসিবে। মা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় ছেলের কাছে কথা পাড়িলেন। ছেলে দৃপ্ত তেজে

জ্বলিয়া উঠিয়া কেবলমাত্র বলিল, ছি মা!—বলিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সেদিন গড়ের মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিকুঞ্জবিহারী ঘর সাজাইতে বসিয়া গেল। স্ত্রীর ফোটোখানি টেবিলের ঠিক মধ্যস্থলে রাখিয়া দিল ও তাহার স্মৃতিরঞ্জিত বস্তুগুলি যাহাতে সহজেই নজরে পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিল। সমস্ত গোছগাছ শেষ করিয়া সে মৃত স্ত্রীর উদ্দেশে কবিতা লিখিতে বসিল।

কবি বলিয়া স্কুলের সহপাঠী-মহলে নিকুঞ্জবিহারীর খ্যাতি ছিল। 'কুজ্ঝটিকা' নামক মাসিকপত্রে তাহার একটি কবিতাও একবার বাহির হইয়াছিল। ইণ্টারমিডিয়েট পাস করার পর মালতীলতার সহিত তাহার বিবাহ হয়। তখন হইতে সে কবিতা লেখা ছাড়িয়া পত্র-লিখনে দক্ষতা লাভ করে। সে বলিত, কবিতার মত ভাল চিঠিও সাহিত্যের অঙ্গ। স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া একটা 'ছিন্নপত্র' ছাপিবার মতলবও নাকি তাহার হইয়াছিল, চক্ষুলজ্জার খাতিরে ছাপাইতে পারে নাই। তবে ভবিষ্যতের জন্য সে তাহার ও তাহার স্ত্রীর চিঠিগুলি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। আজ বহুদিন পরে মায়ের কথায় তাহার সুপ্ত কাব্যাগ্নি ধিকিধিকি জ্বলিয়া উঠিল। স্ত্রীর ছবিখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাব ও মিল সংগ্রহ করিতে লাগিল। মা বারবার তাহাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ভয়ে ফিরিয়া গেলেন। নিকুঞ্জবিহারী মনের আবেগে সে রাত্রে আহার করিল না। প্রথমে একটি ছোট্ট সনেট লিখিয়া পরিষ্কার হস্তাক্ষরে সেটি নকল করিয়া সামনের দেওয়ালে টাঙাইয়া দিল। সেই ছোট কবিতাটিতেই তাহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। কবিতাটি এই—

অন্তহীন অন্ধকারে বসিয়া একেলা
অতীত দিনের কথা মনে মনে ভাবি,
লো মালতী, কেন খেলি দুদিনের খেলা
শূন্য করি খেলাঘর লাগাইলে চাবি!

তব ছবি অন্ধকারে মিটিমিটি হাসে,
বুকফাটা হাহাকারে আমি কাঁদি প্রিয়া,
বুঝি না কেমনে, যেবা যারে ভালবাসে—
তার হতে দূরে গিয়ে রহে গো বাঁচিয়া!

কে বুঝিবে মোর এই অন্তহীন প্রীতি—
সন্দিগ্ধ এ বিশ্বমাঝে সন্দেহিছে সবে ;
আবার বিবাহ নাকি সংসারের রীতি—
শুন প্রিয়ে, সংসারের নই আমি তবে !
যেথা তব গতি প্রিয়া, মোর সেথা গতি,
তুমি বুকে বিরাজিছ শোভনা মালতী !

ইহার পর নিকুঞ্জবিহারী দীর্ঘ-ত্রিপদীছন্দে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ অনেকখানি দমন করিয়া স্ত্রীর ফোটোখানি বুকে করিয়া শয়ন করিল।

ইহার পর কেমন করিয়া কি ঘটিল, জানি না। মাসখানেকের মধ্যে নিকুঞ্জবিহারী দ্বিতীয় বার দ্বারপরিগ্রহ করিল, এবং তাহারও মাস কয়েক পরে শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী তোড়জোড় করিয়া স্বামীঘর করিতে আসিল। নিকুঞ্জবিহারী তখন কাব্যমার্গে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে ; নিজের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে কোনও বন্ধুর নাম দিয়া একটি সরস কবিতাও সে লিখিয়া ফেলিয়াছিল। সেই কবিতাটিতে প্রথম পক্ষের উল্লেখমাত্র ছিল না। কবিতাটির খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

. সেই ভাল, কর তবে বিয়ে—
নিদাঘ-নিশীথকালে থাকিতে না পার যদি
একটানা প্রাণখানা নিয়ে।
জ্যোছনা-যামিনী-ভাগে যদি ফাঁকা ফাঁকা লাগে—
সদা যদি হৃদে জাগে, হ'ত কত সুখ,
এ হেন সময়ে যদি জাগিয়া রহিত বুকে
একখানি কচি কচি মুখ—
টুকটুকে ছোট ছোট নধর অধর-কোণে
ঢলঢল একরাশি মধুহাসি নিয়ে ;
সেই ভাল, কর তবে বিয়ে।
কোকিলের কুহুতানে প্রাণে যদি ব্যথা আনে,
গাহ যদি মনে মনে অভাবের গান,
জীবন কিছুই নয় সদা যদি মনে হয়,
করে যদি টলমল প্রাণ,

পড়ে যদি ফোঁটা ফোঁটা নিরাশার লোনা জল
উদাস আকুল ওই আঁখি-কোণ দিয়ে—
সেই ভাল, কর তবে বিয়ে।

একটু অধিক বয়সে বিরজাসুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল। সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সতীন সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল এবং সতীন-সাহিত্যে গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতি ও সখী-সমবয়সীদের সহায়তায় বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। স্বামীর মন যে স্বভাবতই প্রথম স্ত্রীর দিকে পড়িয়া থাকে, তা সে জীবিতই হউক, মৃতই হউক—এ কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল, এবং সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই সে আসিয়াছিল। স্বামীর শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়াই বিরজাসুন্দরী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথম নম্বর চোখে পড়িল টেবিলের উপর ফোটোখানা, তারপরেই দেওয়ালে টাঙানো ছন্দোবদ্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাস; তারপর বাক্স-পেঁটরা পুঁথিপত্র ইত্যাদি। ভ্যাবাচ্যাকা স্বামীকে ভাবিবার অবসর না দিয়া ধূলিলিপ্ত পদেই সে গৃহ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিল। নিকুঞ্জবিহারী সগর্বে তাহার মাতাকে গিয়া জানাইল যে, নূতন বধূ ভারী গোছালো। ঘণ্টাখানেক পরে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে সত্যসত্যই অবাক হইল এবং তখন হইতেই বুঝিয়া লইল যে, আর যাহাই করুক, দ্বিতীয় পক্ষের কাছে প্রথম পক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। টেবিলস্থিত ফোটোখানি অন্তর্হিত হইয়াছে। দেওয়ালে টাঙানো সনেটের টুকরাগুলি ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, এবং প্রথম পক্ষের সযত্নরক্ষিত বাক্স-পেঁটরাগুলি খাটের নীচে আত্মগোপন করিয়াছে। নিকুঞ্জবিহারীর বুক ধুকধুক করিতে লাগিল—তাহার বাক্স খুলিয়া দেখে নাই তো! সেখানে যে তাহার অতি-প্রিয় পত্রাবলী সযত্নে রক্ষিত ছিল! ফোটো ও সনেটের যাহাই হউক, এই চিঠিগুলিকে সে সত্যসত্যই ভালবাসিত। একবার ফাঁক পাইলেই সে এগুলিকে এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিবে যে, বিরজাসুন্দরী কিছুতেই ইহাদের কোনও সন্ধান পাইবে না।

ঘর গোছানো শেষ করিয়া বধূ যখন স্নানাহার করিতে গেল, নিকুঞ্জবিহারী তখন অতীব সন্তর্পণে আপনার বাক্স খুলিয়া প্রথমটা হতাশ হইয়া পড়িল। বাক্স যে খোলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে;—চিঠিপত্রগুলির স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে, কিন্তু কিছুই খোওয়া যায় নাই; কারণ খোওয়া যাইবার মত চিঠি সেগুলি ছিল না। নিকুঞ্জবিহারীর সৌভাগ্য যে, সে তাহার প্রথমা

পত্নীর পত্রগুলি একটি খাতার মধ্যে আঠা দিয়া আঁটিয়া রাখিয়াছিল। বাম ধারে তাহার চিঠি ও ঠিক ডান ধারে মালতীলতার উত্তরগুলি আঁটিয়া সে একটি খাতা সাজাইয়া রাখিয়াছিল, অবসর-সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য সে প্রায়শই এই পত্রগুলি পাঠ করিত। খাতা দেখিয়া বিরজাসুন্দরী কিছুই সন্দেহ করে নাই। নিকুঞ্জবিহারী তাড়াতাড়ি খাতাখানি সরাইয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় পক্ষের সহিত অল্প কয়েকদিনের ব্যবহারেই নিকুঞ্জবিহারী বেশ বুঝিল যে, বিরজাসুন্দরী পতিপরায়ণা হইলেও কোমল ও ক্ষমাশীল নহে, তাহার মন যোগাইয়া না চলিলে সে কুরুক্ষেত্র বাধাইতে জানে। স্বামীর ঘর করিতে আসার সপ্তাহখানেকের মধ্যে সে তাহার সতীনের সমস্ত পদচিহ্ন এমন নিঃশেষে গৃহ হইতে মুছিয়া ফেলিল যে, নিকুঞ্জবিহারীর মাতারই মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, বুঝিবা বিরজাই তাঁহার প্রথমা পুত্রবধূ। পাড়াপড়শীরা তো মালতীর কথা বিস্মৃতই হইয়াছে। শাশুড়ী ও প্রতিবেশীদের দিক দিয়া বিরজাসুন্দরী নিষ্কণ্টক হইলেও স্বামীর সম্বন্ধে তাহার বরাবরই কেমন একটা সন্দেহ জাগিয়া থাকিত। প্রথম প্রথম সতীনের ধ্যানপরায়ণ স্বামীকে সে প্রায়ই ধরিয়া ফেলিয়া লাঞ্ছনা করিত—মৃতার উদ্দেশেও মধুর বাক্য প্রয়োগ করা হইত না। নিকুঞ্জবিহারী মর্মান্তিক পীড়িত হইত ও চুপ করিয়া থাকিয়া পত্নীর রোষানলে আহুতি প্রদান করিত। সে এখন ভুলিয়াও মালতীর নাম করে না। বিরজাসুন্দরী ক্রমশ স্বামীর অনন্যনিষ্ঠায় বিশ্বাস করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে।

কিন্তু সেই গোপন পত্রগুলি রহিয়া গিয়াছে; বেনামীতে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশ করার কথা এখনও নিকুঞ্জবিহারীর মনে উঁকিঝুঁকি মারে। বিরজাসুন্দরী যখন নিশ্চিন্ত হইয়া শিশুপুত্রের চন্দ্রহার গড়াইতে ব্যস্ত, কবি নিকুঞ্জবিহারী তখন মালতীলতার স্বপ্ন দেখে। অলিখিত কাব্য মনের মধ্যে পাক খাইতে খাইতে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রকলত্রপরিবৃত নিকুঞ্জবিহারী তাহার আদর্শ-পত্নীহারা হইয়া এখন বাদলরজনীতে হাহাকার করে ও সুর করিয়া 'মেঘদূত' পড়িতে বসে। বিরজাসুন্দরী সন্দেহ করিবার আর অবকাশ পায় না; তাহার অনেক কাজ।

স্বর্গগত পিতার দৌলতে খাওয়া-পরার অভাব নিকুঞ্জবিহারীর ছিল না; তবু অবসরযাপনের জন্য ও উপরি আয়ের আশায় একটা মার্চেণ্ট অফিসে সে কাজ লইয়াছিল। একদিন সে তাহার অতি-প্রিয় 'পত্রাবলী'খানি সন্তর্পণে

লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির করিয়া অফিসের দেরাজে চাবি বন্ধ করিয়া আসিল। শনিবার দুইটার সময় অফিস বন্ধ হয়, সে খাতাখানি দেরাজ হইতে বাহির করিয়া সটান ইডেন গার্ডেনে গিয়া কোনও একটি বৃক্ষকুঞ্জে আত্মগোপন করিয়া 'পত্রাবলী' পড়িতে বসিল। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে অতীত দিনের সুখস্মৃতিগুলি তাহার ভাবাতুর চোখে জলজল করিয়া উঠিল। দুই-একটি পাতা উলটাইতেই তাহার চোখে পড়িল—

৫ নং চিঠি

সর্বস্ব আমার !!!

আমার মালতী, আমার লতা, তোমাদের ওখান হইতে এসে অবধি আমার জীবনের খেই হারাইয়া গেছে, কিছুই ভাল লাগে না—তুমি হয়তো হাসিবে, তুমি হয়তো তোমার "গঙ্গাজলে"র সঙ্গে আমাকে নিয়ে কৌতুক করিবে—তা কর, আমি আপত্তি করি না, কিন্তু আমার বুকের গুরুভার আমি কোথায় নামাই প্রিয়তমে! যাদিকে নিকট আত্মীয়-বন্ধু বলে গণ্য করতাম, তোমাকে বুকে পাইবার পরমুহূর্ত হইতে আর তাহাদের চিনিতে পারি না। কেন এমন হইল লতি?

আজ আমাদের বাড়ির ছাদ ছাইয়া জ্যোছনার বান ডাকিয়াছে, পাশের বাড়ির খাঁচায় পোরা কোকিলটার অশ্রান্ত কুহুধ্বনি আমার বুকের মাঝে হাহাকার তুলিয়াছে—তুমি কোথায়? দূরে একটা বাড়িতে এস্‌রাজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোন্ বিরহী গাইছে—

ও মাধবী ও মালতী
হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে
আমায় বলে দেবে কে—

আমার মালতী এখন কি করিতেছে আমায় কে বলিয়া দিবে? বসন্তশারদ-পূর্ণিমানিশীথের সমস্ত বিরহীকুলের ব্যথা আজ ঘনিয়ে উঠছে আমার মনে—রোমিও আজ জুলিয়েটের বাতায়নতলে করুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে হাঁকিয়া গেল, দ্বার খোল জুলিয়েট, আমি আসিয়াছি। জেসিকা আজ তাহার প্রিয়তমের সঙ্গে পিতার আশ্রয়নীড় ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছে; তুমিই কি কেবল অবাধে ঘুমাবে! ফুটফুটে হিমাক্ত জ্যোছনায় বিনিদ্র বুঝি কেবল একলা আমি—আমার মনে হচ্ছে সেদিনের কথা—যেদিন ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা

ধরেছি তোমার মুখে—আর আজ কোথায় আমি, কোথায় আমার লতা—অনন্ত ব্যবধান।

তোমার পত্র না পাইলে পড়াশোনা করিতে পারি না। তুমি শীঘ্র উত্তর দিও—আমার বুকভরা স্নেহ ও—গ্রহণ করিও—ইতি

তোমার
আমি

৫ নং চিঠির উত্তর

বারুইপুর
C/o ডাক্তারবাবুর বাড়ি
ডুকুরবেলা

শ্রীচরণেষু

দেখ তুমি অমন করে আর আমায় চিঠি দিও না। তোমার চিঠি যখন এল, আমি তখন চান করছি—সেজদি চিঠিখানা নিয়ে খুলে, মায়ের কাছে আর বড় বউদির কাছে জোরে জোরে পড়তে লাগল, আমি তো লজ্জায় মরি! মাগো মা, তুমি এত আবোল-তাবোল লিখতেও পার,—গঙ্গাজল পড়ে হেসে খুন—বলে, তোর বর ভাই বেশ ছড়া কাটে। তুমি অমন ছড়া-টড়া আর কেটো না।

কাল বাবার কাছে মায়ের একখানা চিঠি এসেছে, তিনি আমাকে এই মাসেই নিয়ে যাবেন লিখেছেন। আমার ছোট ভাইয়ের ভাত হবে চোত মাসে, লক্ষ্মীটি আমি এ কদিন এখানে থাকব, মাকে বলে দিও। তুমি ভাল করে পড়াশোনা করো, ভাল পাস না দিতে পারলে সবাই আমায় খোঁটা দেবে; সেজ জামাইবাবু এবার ডিপুটি হয়েছেন; সবাই তাঁর কত সুখ্যাত করে।

গঙ্গাজল তোমার বেশ একটি নাম দিয়েছে, শুনে তো হেসে বাঁচি নে। এত রঙ্গও জানে! নামটা কি শুনবে? নি—। না বাপু, আমি লিখতে পারি নে। আমার প্রণাম নিও ও মাকে আমার প্রণাম দিও। আজ তবে আসি,

ইতি শ্রীচরণের দাসী
মালতী

একটার পর একটা পাতা উলটাইয়া যায় আর তাহার কত কথাই না মনে পড়িতে থাকে! হায় রে, হাস্যলাস্যপরায়ণ মালতীলতা ও তাহার গঙ্গাজল! বারুইপুরে গিয়া ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকারও আজ তাহার নাই। নিকুঞ্জবিহারীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, মাথা গরম হইয়া গেল। খাতাখানি হাতে লইয়া সে সবেগে পায়চারি করিতে লাগিল। না, প্রিয়তমা প্রথমা পত্নীর এই স্মৃতিগুলিকে অক্ষয় করিয়া রাখিতেই হইবে, আজই এগুলিকে ছাপিতে দিব।—ভাবিতে ভাবিতে নিকুঞ্জবিহারী শ্যামবাজারের ট্রামে চড়িয়া বসিল।

খাতাখানি কোলের কাছে লইয়া ডিমাই না রয়াল, আর্টপেপার কিংবা অ্যান্টিক ভাবিতে ভাবিতে নিকুঞ্জবিহারী চলিয়াছে, হঠাৎ গোলদীঘির সম্মুখে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল; চমকিয়া চাহিয়া দেখিয়াই তাহার বুকের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; যাদৃশী ভাবনা যস্য—তাহার প্রথম পক্ষের সেজো ভায়রাভাই। সে সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া চলন্ত ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল।

গোলদীঘিতে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া বহুদিন পরে নিকুঞ্জবিহারী একবার প্রাণ খুলিয়া মালতীর কথা বলিয়া লইল এবং পত্রাবলী ছাপাইবার গোপন অভিপ্রায়টুকুও ভায়রাভাইকে বলিতে দ্বিধা করিল না। পত্রাবলীর কথা উঠিতেই তাহার খেয়াল হইল যে, খাতাখানি সঙ্গে নাই। সর্বনাশ! কোথায় খাতা! নিশ্চয়ই ট্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে। বিহ্বল ভায়রাভাইকে কিছু বুঝিবার অবসর না দিয়াই সে ফুটপাথে আসিয়া একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল এবং সোজা শ্যামবাজার ট্রাম-ডিপো অভিমুখে ট্যাক্সি চালাইতে বলিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; খাতাখানি পাওয়া গেল না। ট্রামের নম্বর জানা ছিল না। তারপর অনেক ট্রাম আসিয়াছে; সন্ধান করিবার কোনও উপায় নাই। হায় রে, আজ কি কুক্ষণেই সে বাড়ির বাহির হইয়াছিল! কিন্তু খাতাখানি যে তাহাকে পাইতেই হইবে। অসুস্থ মন লইয়া নিকুঞ্জবিহারী সেদিন বাড়ি ফিরিয়াই শয্যা আশ্রয় করিল, বিরজাসুন্দরী ব্যস্তসমস্তভাবে কাছে আসিয়া প্রশ্নে প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল নিকুঞ্জবিহারী বিরক্ত হইয়া বলিল, অফিসের একতাড়া দরকারী কাগজ সে ট্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে। সেগুলি না পাইলে সর্বনাশ হইবে। বিরজাসুন্দরী তাচ্ছিল্যভরে বলিয়া উঠিল, ও, এই, আমি বলি মাথা-টাতা ধরল বুঝি! তা

এতে আর কি হয়েছে—খবরের কাগজে একটা লুটিস দিলেই কাগজ পাবে, তার আর কি! দাদার একবার—। নিকুঞ্জবিহারী লাফাইয়া উঠিল, ঠিক, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই তো হইবে। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা দিলেই তো সর্বনাশ! অফিসের ঠিকানা দিতে হইবে!

নিকুঞ্জবিহারী 'অমৃতবাজার', 'ফরওয়ার্ড' ও 'আনন্দবাজারে' পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিল; অফিসের ঠিকানা দিতে ভুলিল না, লিখিল—"বিশেষ জরুরী কাগজপত্র—"

কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল, এক দিন দুই দিন করিয়া সাত দিন চলিয়া গেল; কোন উত্তর নাই। নিকুঞ্জবিহারী সকাল সকাল আফিস যায়, দেরি করিয়া বাড়ি ফেবে, কিন্তু ফল কিছুই হইল না, পুরস্কারের লোভেও কেহ আসিল না। নিকুঞ্জবিহারী হতাশ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, ও জিনিস কি কেহ হাতে পাইলে সহজে ছাড়িবে! হয়তো নিজের নামে ছাপাইয়া দিবে, তাহাকে কিনিয়া পড়িতে হইবে। ইহাকেই বলে গ্রহের ফের।

বিরজাসুন্দরী স্বামীর দুঃখে বিচলিত হয় ও নানাভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। বলিল, সাহেবকে একটু ধরাধরি করিলেই আর কোন গোল হইবে না; সাহেব হইলেও মানুষ তো!

কিন্তু নিকুঞ্জবিহারীর মন ভাঙিয়া গেল; আফিসে ছুটি লইয়া মা ও স্ত্রীর কাছে কাজের অছিলা দেখাইয়া একদিন সে বারুইপুর চলিয়া গেল; প্রিয়তমা পত্নীর বাপের বাড়ির আবহাওয়ায় মনটা একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারে।

বিপদ যখন মানুষের আসে, তখন একেলা আসে না। মন সুস্থির করিতে নিকুঞ্জবিহারী যেদিন বারুইপুর গেল, তাহার পরের দিনই তাহার গৃহে একটি লোকের আবির্ভাব হইল—বলিল, বাবুকে তাহার বিশেষ প্রয়োজন, আফিসে খোঁজ করিয়া বহুকষ্টে বাড়ি সন্ধান করিয়া সে আসিয়াছে। বিরজাসুন্দরী দরজার অন্তরাল হইতে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুকে তাহার কি প্রয়োজন? লোকটি ইতস্তত করিয়া বলিল, খবরের কাগজে—। বলিয়া সে একটি বাঁধানো খাতা বাহির করিল।

বিরজাসুন্দরী খুশী হইয়া চাকরকে বলিল, বাবুকে বসতে বল।—বলিয়াই তাহার জলখাবারের আয়োজন করিতে গেল। খাতাখানি হাতে পাইলে স্বামীকে বেশ একটু জব্দ করা যাইবে—একটা কিছু আদায় করিয়া তবে সে খাতা দিবে, ইত্যাদি নানা চিন্তায় তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

লোকটিকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া বিরজাসুন্দরী চাকরের হাত হইতে খাতাখানি লইয়া নিশ্চিন্ত হইল। রান্নাঘরে তাহার কাজ ছিল, খাতাখানি শোবার ঘরে রাখিয়া সে কাজ করিতে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া সে খাতাখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল; এই সামান্য একখানা খাতার জন্য এত ভাবনা, এত ভয়! যাক, তবুও তো তাহার বুদ্ধি লইয়া চলিয়াছিল বলিয়া এটা ফেরত পাওয়া গেল, অথচ এরা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবিয়া মেয়েদের পরামর্শ না লইয়াই চলিতে চায়!

খাতাখানি খুলিয়াই বিরজাসুন্দরী জ্বলিয়া উঠিল, আফিসের কাগজ, না ছাই—এ যে বাংলা চিঠি, স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর! তাহার মাথা দপদপ করিতে লাগিল। ওমা, এ যে সতীনকে লেখা চিঠি! আবার সতীনের চিঠি! তাই এত মাথাব্যথা, এত দরদ! আসুক একবার, কাগজে লুটিস দেওয়া বের করছি। রাগে সে খাতাখানা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

না, কি সব লেখা আছে পড়িয়া দেখিলে ক্ষতি কি! কেমন ভালবাসা ছিল দেখাই যাক না। বিরজাসুন্দরী খাতাখানা পড়িতে লাগিল। এক জায়গায় চোখে পড়িল—

…কবি লিখেছেন "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" প্রিয়তমে, আমি মালাকর হতে চাই না, আমি ফুল হয়ে তোমার হৃদয়-লতিকায় বিকশিত হইতে চাই; তুমি আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে মালতী-প্রসুন হইয়া ফুটিয়া থাক।…

আর এক জায়গায়—

…কাল রাত্রে এক ভারী মজার স্বপ্ন দেখেছি—আমি আর গঙ্গাজল ঘাটে নাইতে গেছি, তুমি যেন নৌকো করে এলে…

বিরজাসুন্দরী আর পড়িতে পারিল না; খাতাখানি কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। স্বামী আসিলে তাহার সাধের জিনিসগুলি উপহার দিতে হইবে।

সেদিন রাত্রে নিকুঞ্জবিহারী প্রথমপক্ষের শ্বশুরালয় হইতে অনেকখানি হালকা মন লইয়া ফিরিয়া আসিল। গঙ্গাজলের সহিত দেখা হইয়াছে, মালতীর নাম করিয়া সে কত কাঁদিয়াছে, শালীরা মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে আবার যাইতে বলিয়াছে।

বিরজাসুন্দরী তখন শয়ন-ঘরে পান সাজিতেছিল। স্বামীকে দেখিয়াই সে উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরিয়া ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটি ঝপ করিয়া স্বামীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, এই নাও গো তোমার সরকারী কাগজপত্তর, খোকা ছিঁড়ে ফেলেছে।

তাহার সাধের খাতাখানির এই দুর্দশা দেখিয়া নিকুঞ্জবিহারী বসিয়া পড়িল। কে ইহার এই অবস্থা করিয়াছে, তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। হায় রে, ইহার চেয়ে খাতাখানি ফেরত না পাওয়াই যে ভাল ছিল। আর কেহ ছাপাইয়া দিলেও এগুলি টিকিয়া থাকিত তো। সে ফ্যালফ্যাল করিয়া একবার স্ত্রীর দিকে, একবার ছেঁড়া খাতাখানির দিকে চাহিতে লাগিল। একটি কথাও বলিতে পারিল না।

বিরজাসুন্দরী এখন নিষ্কণ্টক।

ফাল্গুন, ১৩৩৩

হরিমতি

সকালে হস্পিটালে এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে আমাকে আসিতে হইয়াছিল। একটা কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার আর একটা ইরিসিপেলাস কেস দেখিয়া হাত ধুইতেছি, কে যেন কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ঝাঁকানি দিল। একটু চমকাইয়া মুখ তুলিতেই দেখি, আমাদের শ্যামচরণ অর্থাৎ আমাদের কলেজ-জীবনের উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিক শ্যামচরণ হাজরা। ছেলেবেলা হইতেই আই. এস-সি ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তারপর আমি ভর্ত্তি হইলাম মেডিক্যাল কলেজে, শ্যামচরণ বি. এস-সি ফেল করিয়া সসম্মানে পি অ্যাণ্ড ও ব্যাঙ্কে লেজার-কীপারের কাজ করিতেছিল। এই পর্যন্ত জানিতাম, তারপর প্রায় আড়াই বৎসরের অসাক্ষাতের পর এই দেখা।

বলিলাম, আরে, শ্যামচরণ যে, খবর কি ?

শ্যামচরণ আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে বারান্দায় আনিয়া বলিল, ভাই, বড় বিপদ !

বিপদ তো দেখিতেছিলাম আমার নিজের, স্টুডেণ্ট আর পেশেণ্টরা ফ্যালফ্যাল করিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। কি ভাবিল, কে জানে! মনের বিরক্তি মনেই চাপিয়া বলিলাম, তাড়াতাড়ি বল, অনেকগুলো কেস এখনও—

শ্যামচরণ একটু থতমত খাইয়া বলিল, আমারও একটা কেস ছিল।

বলিলাম, বেশ তো, নিয়ে এস।

শ্যামচরণ অঙ্গুলিনির্দেশে সামনের একটা ট্যাক্সি দেখাইল ; একজন বলিষ্ঠ যুবকের কোলে কে একজন শুইয়া আছে। আমি স্ট্রেচার পাঠাইয়া রোগিণীকে অপারেশন টেবিলে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া প্রশ্ন করিলাম, কে ?

শ্যামচরণ বলিল, আমার একটি আত্মীয়া ; কাল রাত্রে হঠাৎ অ্যাপোপ্লেক্সির একটা স্ট্রোক—

রোগিণী ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে মোটামুটি পরীক্ষা করিয়া হস্পিটালে মেয়েদের জেনারেল ওয়ার্ডে একটা বেডের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। শ্যামচরণকে বলিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, যা করবার আমি করছি। বিকেলে আবার এস।

অনেকগুলি রোগী অপেক্ষা করিতেছিল। আমি তাহাদের লইয়া পড়িলাম।

সেদিন আর সুবিধা হইল না; আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুরেশবাবু পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি শ্যামচরণের রোগীকে নিজে দেখিতে পারিলাম না। বৈকালে শ্যামচরণের সঙ্গেও দেখা হইল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অবস্থা খারাপ। আরও নানা খটকা মনে জাগিল। শ্যামচরণের আত্মীয়া কেমন করিয়া সম্ভব!

বৈকালে অবসর ছিল, শ্যামচরণ আসিলে তাহার সহিত তাহার আত্মীয়াটিকে দেখিয়া বলিলাম, আমার বাসায় চল, এক কাপ চা খাবে, অন্য কথাও আছে।

এ কথা সে কথার পর প্রশ্ন করিলাম, তোমার আত্মীয়া?

শ্যামচরণ একটু ইতস্তত কবিয়া বলিল, ঠিক নয়। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ বল তো?

বলিলাম, কারণ আছে। চিকিৎসার সুবিধার জন্যে হিস্ট্রিটা একটু শোনা দরকার।

শ্যামচরণ কবি মানুষ, সরাসরি ইতিহাস বলা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, সে প্রায় একটা গল্প ফাঁদিয়া বসিল।

* * * *

পাঁচ বৎসর পূর্বেকার কথা। চাকুরিতে সদ্য মাহিনা-বৃদ্ধি হইয়াছে, গৃহিণী এবং হিতৈষী বন্ধুজনেরা সৎ পরামর্শ দিলেন নিজে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিতে। গৃহিণীর পিত্রালয়ে ঘরের সংখ্যা কম, তাঁহার অসুবিধা হইতেছিল। স্বাধীনতা এবং আহারের সুবিধা, কোন্‌টার ওজন বেশী তখনও স্থির করিতে পারি নাই, তথাপি একটা বাসা ভাড়া করিলাম এবং একদিন শুভলগ্ন দেখিয়া বেলেঘাটাস্থিত পিত্রালয় হইতে গৃহিণীকে ট্যাক্সিযোগে নেবুতলাস্থ পতিগৃহে লইয়া আসিলাম। গৃহিণীর বড় মাসী নূতন সংসার পাতিবার সাহায্যার্থে সঙ্গে আসিলেন। আমার প্রথম পুত্র, আমার মহিমান্বিত প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের (waills!) রথাগ্রচূড়া তখন সবেমাত্র দেখা গিয়াছে, সশরীরে আসিতে তখনও তাহার পাঁচ সাত মাস বিলম্ব।

মাহিনায় না কুলাইলেও এই অবস্থায় গৃহকর্মে সাহায্য করিবার জন্য রাঁধুনী বামুন হোক বা দিনরাতের ঝি বা চাকর হোক, একজন লোক আবশ্যক। ঠিকা ঝি সারদা ঘর ঝাঁট দেওয়া বাসনকোসন মাজা ইত্যাদির জন্য পূর্বেই বাহাল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আরও তিন বাড়ির কাজ এবং কোলে রুগ্ন

শিশু। ঠিক দরকারটির সময় তাহাকে পাওয়া যাইত না। পাশের বাড়ির ললিত আমার বন্ধু, সে-ই নূতন বাসা ঠিক করিয়া দিয়াছিল, কাকীমা অর্থাৎ ললিতের মার নিকট দরখাস্ত পেশ করিলাম। ফলে, পরদিন বৈকাল নাগাদ আমার বাড়িতে দিনরাতের ঝিয়ের কাজ করিবার জন্য দুই মূর্তির আবির্ভাব হইল; একজন অপেক্ষাকৃত সমর্থ বয়সের, মেসবাড়ি হইলে তরুণী বলিয়াও চালানো যাইত, রঙ ময়লা, দোহারা গড়ন। অন্যজন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত বিধবা, রঙ ফরসা, বাঁ চোখটা যে কারণেই হোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার মুখে এবং ভাবভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল যাহাতে চট্ করিয়া ঝি বলিয়া মানিয়া লইতে বাধে, গিন্নীবান্নী গোছের কেহ বলিয়াই বোধ হয়।

অফিস হইতে সবে ফিরিয়াছি, দেখি, এই দুইটি জীবকে সামনে লইয়া মাসী-বোনঝিতে পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছেন। আড়চোখে চাহিয়া দাড়ি কামাইতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে গিন্নী পাশে আসিয়া ফিসফিস করিয়া জানাইলেন যে, মেয়েটি মাসিক ছয় টাকা বেতন চাহিতেছে, তাহা ছাড়া দুইবেলা আহার, দুইবেলা জলখাবার, বৎসরে তিনজোড়া কাপড়, শীতে কম্বল। আমি জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া আর একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, অপেক্ষাকৃত তরুণীটি অন্তর্ধান করিয়াছে। ঘোমটাবৃত বৃদ্ধা বসিয়া আছে। মাহিনা এবং আনুষঙ্গিক প্রার্থনা এমন কিছু বেশী নহে, শান্তভাবে প্রশ্ন করিলাম, ও পারবে তো?

চটিবার কোনও কারণ ছিল না, তবু গৃহিণী চটিলেন। ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না পারলে বিদেয় করে দেব। ঝিয়ের তো আর মড়ক হয় নি।

ইহার উপর কথা চলে না। পরের দিন হইতেই নূতন ঝি কাজে বাহাল হইল।

তাহার নাম হরিমতি, প্রথমটা কিছুকাল তাহাকে মূক মনে হইলেও পরে বুঝিলাম হরিমতি মুখরা। ছয় টাকা মাহিনায় রাজি হইয়াছিলাম, দুই মাস যাইতে না যাইতেই হিসাব করিয়া দেখিলাম তাহাকে ৭৸৵০ করিয়া দিতে হইতেছে, ১৸৵০ এক ভরি আফিমের দাম, তাহার সমস্ত মাসের মৌতাত।

প্রথম প্রথম আমাকে হরিমতি ভারি লজ্জা করিত, আধ হাত ঘোমটা টানিয়া কাছে আসিত, কথা বলিত না। নিতান্ত প্রয়োজনে ফিসফিস করিয়া যাহা বলিত, তাহার অর্ধেক বোঝা যাইত না। গৃহিণী খুশী। বলিতেন,

নূতন ঝি মোটেই বেতরবিৎ নয়। অথচ এদিকে ঠিকা ঝি সারদার সহিত তাহার বচসার কথা প্রায়ই শুনিতে পাইতাম; তকতকে ঝকঝকে কাজ বুঝিয়া লইতে হরিমতি ভালবাসে, একচুল এদিক ওদিক হইলেই কথা শুনাইতে বসে। ক্রমশ গিন্নীও কথা শুনিতে লাগিলেন এবং সংসারে খিটিমিটি শুরু হইল।

তিতিবিরক্ত হইয়া তাহাকে জবাব দিব স্থির করিলাম। গিন্নী বলিলেন, লোক না হইলেও তিনি চালাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু সামনে পৌষ মাস। পৌষ মাসে জবাব দেওয়া যায় না। কার্তিকে বাহাল হইয়াছিল, মাঘ পর্যন্ত হরিমতি রহিয়া গেল। ইহার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম, সে এক মুহূর্তের জন্য বাহিরে যাইত না। স্ত্রীপুরুষ কাহাকেও কখনও তাহার নিকট আসিতেও দেখি নাই। কৌতূহলী হইয়া গৃহিণীকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি অপ্রসন্ন মুখে বলিয়াছিলেন, তিন কুলে নেই কেউ তো আবার আসবে কে? সবাইকে খেয়ে তবে ও এখানে এসেছে। পাপ বিদেয় হলে বাঁচি।

শেষের কথা যেন শুনিতেই পাই নাই, বলিলাম, তবু?

তবু আবার কি? তারকেশ্বরের কাছে কোথায় ঘর, জাতে তেলী, ভাজের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তাহার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহার অধিক পরিচয় হরিমতি সম্বন্ধে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অতীত জীবনের কোনও কথাই কোনও অসতর্ক মুহূর্তে তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। বাড়ি ছাড়িয়া এগারো বারো বৎসর এখানে-ওখানে ঝি-গিরি করার পর সে আমাদের বাড়ি আসিয়াছিল। এই বারো বৎসরের কোন কথাও শুনি নাই, শুধু প্রত্যেক পূজার সময় একটি নির্দিষ্ট বয়সের ছেলের জন্য সে আমাকে দিয়া জামা-ইজের খরিদ করাইত এবং ঠিক সপ্তমীর দিন প্রাতঃকালে কাহাকে যেন দিয়া আসিত। সেই শিশুর বয়স প্রত্যেক বৎসরে এক বৎসর করিয়া বাড়িয়াছে এইটুকু মাত্র জানিতে পারিয়াছি।

মাঘের ২রা তারিখে হরিমতির বিদায় হইবার কথা, হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া আমার অর্ধোন্মাদ পিসীমাকে সঙ্গে লইয়া পিসেমশাই, পিসতুতো দাদা-বউদিদি ইত্যাদি আজিমগঞ্জ হইতে একেবারে কলিকাতায় আমার ছোট বাসায় উপস্থিত। হরিমতি রহিয়া গেল, কিন্তু স্থানাভাবে গৃহিণীকে পিত্রালয়ে সরিতে হইল, ছেলে হওয়া পর্যন্ত সেখানেই তিনি থাকিবেন।

বাড়িতে জায়গার অভাব, নীচে অন্য ভাড়াটে থাকে, আমার ভাগে মোট আড়াইখানি ঘর ও একটি রান্নাঘর। ঘর আড়াইখানি পিসীমা পিসেমশাই, দাদা বউদিদি দখল করিলেন, আমি পাশে ললিতদের বাড়িতে আশ্রয় লইলাম। এখানেই হরিমতির সহিত পরিচয় আরম্ভ হইল। রাঁধুনীবামুন রান্না করিয়া যায়। আমার দেরি হইলে হরিমতি আঁচলের তলায় ভাত লইয়া গিয়া আমাকে খাওয়াইয়া আসে। তাহার আধহাত ঘোমটা কমিয়া আঙুল চারেকে দাঁড়াইল এবং "বাবা" সম্বোধনে এক-আধটা কথাও সে বলিতে শুরু করিল। তাহার নিজের অসুবিধার অন্ত ছিল না, ভিজা রান্নাঘরেই শয়ন করিতে ও ঠাকুরের মুখ চাহিয়া চলিতে হইত।

হঠাৎ একদিন কাকীমার (ললিতের মা) মুখে খবর পাইলাম, হরিমতি কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার বাবাকে অর্থাৎ আমাকে দেখাশোনা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছে। সংবাদটি দিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, মাগী যেন কি, আমার চাইতে তার যেন দরদ বেশী।

দরদ বেশী কি কম ভগবানই তাহার পরীক্ষা লইলেন। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ললিতদের বাড়িতেই প্রবল জ্বরে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম এবং বিকারের ঘোরে অনুভব করিলাম, আমার বসন্ত হইয়াছে। পিসীমার অসুখ তখন বাড়িয়াছে। দাদা বউদিদি ইত্যাদি তাঁহাকে লইয়াই ব্যস্ত।

পরে শুনিয়াছি, হরিমতি যেন এই সময়টা পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। নীচের ভাড়াটেদের হাতে-পায়ে ধরিয়া তাহাদের একটি ঘর খালি করাইয়া আমাকে সে সেখানে লইয়া আসে এবং বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া সেই যে আমার মাথাটি কোলে লইয়া বসে, যখনই চোখ মেলি দেখিতে পাই একটি কল্যাণ-হস্ত আমার ললাটে ন্যস্ত, অন্য হাতে সে মাছি তাড়াইতেছে। মা শীতলা তাহার একটি চক্ষু লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার পথে-পাওয়া বাবাকে লইয়াও যে টানাটানি করিতেছেন, এটা সে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। মা শীতলার সহিত হরিমতি যেন ভক্তির আতিশয্যেই লড়াই করিল এবং একুশ দিন পরে আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল। পিসেমশাইরা পিসীমাকে সামলাইতে ব্যস্ত ছিলেন, অন্তঃসত্ত্বা গৃহিণীরও বসন্তরোগীর কাছে আসিবার হুকুম ছিল না। আমাকে খাওয়ানো, ওষুধ মালিশ করা, বাতাস করা—বৃদ্ধার যেন ক্লান্তি ছিল না। ইহারই মধ্যে আমার ঘুমের অবসরে বেলেঘাটায় হাঁটিয়া গিয়া গৃহিণীকে খবর দেওয়া—

কাজের ঝোঁকে হরিমতির চার আঙুল ঘোমটাও ঘুচিয়া গেল এবং আমাকে কোলের শিশুর মত মনে করিয়া সে বকিতে-ঝকিতে লাগিল।

পিসীমাকে লইয়া সকলে খুলনা গেলেন, রাঁধুনীবামুনকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল, হরিমতী ঝি-পদবী হইতে একেবারে রাঁধুনীত্বে প্রোমোশন পাইল এবং সকলের অজ্ঞাতসারে কখন যে সে ঘরের গৃহিণী হইয়া বসিল জানিতেই পারিলাম না। আষাঢ় মাসে সন্তান প্রসব করিয়া আশ্বিন মাসে নিজের বাসায় আসিয়া গৃহিণী দেখিলেন, হরিমতির কর্ত্রীত্ব এড়াইয়া চলা তাঁহার পক্ষেও কঠিন। তাহাতেই গোল বাধিয়া হেস্তনেস্ত যাহোক একটা তখনই হইয়া যাইত, আজ হরিমতির কথা বলিবার জন্য তোমার কাছে উপস্থিত হইতাম না, কিন্তু যিনি রহস্যচ্ছলে এই বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাঁহার অন্য মতলব। কিছুদিন যাইতে না যাইতে গৃহিণী হঠাৎ নিদারুণ বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইলেন। চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় শিশুসন্তানের প্রতিপালনের জন্য এই বৃদ্ধারই মুখ চাহিয়া থাকা ছাড়া তাঁহার অন্য পথ ছিল না; তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে মানিয়া লইলেন। তিন মাসের শিশুকে মানুষ করিবার অধিকার পাইয়া বুড়ী বর্তাইয়া গেল।

খোকনের ভাগ্যে মাতৃস্তন্য জুটিল না, পলিতায় দুধ খাইয়া হরিমতির শুষ্ক বুকে মুখ গুঁজিয়া সে বড় হইতে লাগিল। হরিমতি যে কি করিয়া এই মাতৃস্নেহবঞ্চিত শিশুকে মানুষ করিয়াছে, সে-ইতিহাস ভাল করিয়া আমারই জানা নাই। গৃহিণী জানেন, কিন্তু সকল সত্যের মত এ সত্যটাও স্বীকার করিতে তাঁহার অহঙ্কারে বাধে, এবং বাধে বলিয়াই মা হইয়া তাঁহার শিশুর এই উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা মাকে তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিলেন না। এখান হইতেই যে ট্র্যাজেডির সূত্রপাত, আমার সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত এই বৃদ্ধা শেক্সপীরীয় নাটকের নায়িকার মত সকল আঘাত সহ্য করিয়া আজ অসাড় চেতনাহীন অবস্থায় সেই নাটকের যবনিকা-পতনের অপেক্ষায় তোমাদের হাসপাতালে পড়িয়া আছে। আমি এখানে বসিয়া তোমাকে তাহার ছন্নছাড়া জীবনের ইতিবৃত্ত বলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি।

বিপদ হইল আমার, আমাকে হরিমতি "বাবা" বলিলেও গৃহিণী ঠিক মায়ের পদবীতে উঠিতে পারিলেন না; একটা অকারণ রাগ, ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া একটা অর্থহীন হিংসা তাঁহাকে রোগের মধ্যেই আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, অথচ হরিমতিকে না হইলেও তাঁহার চলিত না। খোকাকে

মানুষ করা ছাড়াও, গৃহিণীর সেবা ও সংসারের অন্যান্য কাজ সে একাই করিতে লাগিল। এখন বুঝিতে পারি খোকনের ভার না পাইলে সে অন্য কোনও কাজ করিতে পারিত না। খোকনও মাকে ভাল করিয়া বুঝিবার আগেই এই নিঃসম্পর্কীয়া বৃদ্ধাকে বুঝিল এবং তাহাকে আঁকড়াইয়া শিশুমনের ক্ষুধা মিটাইতে লাগিল। আমি কথার উপর কথা দিয়া ভুলাইয়া রোগিণীকে ঠাণ্ডা রাখিতে লাগিলাম। গৃহিণী যখন সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিলেন, তখন খোকন মায়ের কাছ হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, মাকে আর তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজনও নাই। সে দিদিকে জানে, দিদিকে বুঝে।

পাঁচ মাসে পড়িতেই খোকনের অন্নপ্রাশনের একটা দিন স্থির হইল; ষষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। খুব যে ঘটা করিয়া হইবে তাহা নয়। সামান্য রকম একটা উৎসব। গৃহিণী সবে সারিয়া উঠিতেছেন, হৈ-হৈ করিবে কে? হরিমতি কিন্তু অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে কারণ দেখাইল, প্রথম ছেলে। কিন্তু খোকন দ্বিতীয় ছেলে হইলেও কারণের অভাব হইত না। ইহা লইয়া একদিন মায়ে-ঝিয়ে তুমুল বচসা হইয়া গেল এবং আমি গরিবের ছেলে মাঝ হইতে মারা পড়িতে বসিলাম।

চাকুরিতে ঢোকার পর মাস তিনেক পর্যন্ত হরিমতি নিয়মিত মাহিনা লইয়াছে, তাহার পর প্রায় নয় দশ মাস সে একটিও পয়সা লয় নাই। শুধু আফিমের ১৸৵০; অনেক টাকা বাকি পড়িয়াছে। গৃহিণীর সহিত কলহের ফলে খোকাকে কোলে লইয়া হরিমতি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া আমার নিকট বিদায় ও বাকি বেতন প্রার্থনা করিল—এখানে থাকা আর পোষাইবে না। একটা পেট যেমন করিয়াই হোক চলিয়া যাইবে। কাঁটাটাকে একটু ভালবাসিয়াছিলাম, তা আমার মত হতভাগীর সেটা বাড়াবাড়ি হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম, অত টাকা এই সময়ে একসঙ্গে যোগাড় করা অসম্ভব। গৃহিণীকে বুঝাইলাম, হরিমতিকে বুঝাইলাম এবং শেষে নিরুপায় হইয়া ধরাধরি করিয়া অফিস হইতে আগাম বেতন লইয়া তাহার মাহিনা চুকাইয়া দিলাম।

কিন্তু একদিন, দুইদিন, তিনদিন—হরিমতি যায় না। ললিতের ভাই অবনী হরিমতির কাছে যাতায়াত করিতেছে দেখিলাম। বোধ হইল তাহার চাকরি জুটাইয়া দিতেছে। এদিকে খোকনের অন্নপ্রাশনের দিনও প্রায়

আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন সকালে অবনী একগাছা সোনার হার আনিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল, কেমন হয়েছে বলুন তো! অবনীর প্রতি চিত্ত অপ্রসন্ন ছিল। আমি সংক্ষেপে বলিলাম, ভাল। অবনী বলিল, হরিমতি এটা খোকনের ভাতের সময় দেবে বলে গড়িয়ে আনিয়েছে।

আমি কথা বলিতে পারিলাম না। এই জন্যই মাহিনার তাগাদা! চাকুরিতে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারটা তাহা হইলে কিছু নয়! বাঁচা গেল। গৃহিণীর মনও ভিজিল, তিনি কিছুদিন ঠাণ্ডা রহিলেন।

গৃহিণীর এই অসুখটার সময় আমার নিত্যসহচর বন্ধুরা হরিমতিকে ভাল মতেই চিনিয়াছিল। আড্ডায় পড়িয়া দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেওয়া আমার স্বভাব। গৃহিণী একা পড়িয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় কাতরাইতেছেন, তাঁহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা নাই, আমি অফিস হইতে আড্ডা দিয়া গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিলাম, দেখি হরিমতি গজগজ করিয়া আমার বন্ধুদের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে খোকাকে কোলে দোল দিতেছে। এই অবস্থায় তাহার কাছে যা-না-তাই শুনিয়া হজম করিতে হইত। দুই-একজন বন্ধু ক্বচিৎ-কখনও বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া হরিমতির বাক্যবাণে আক্রান্ত ও আহত হইয়া ফিরিয়াছে, তাহার পর হইতে আমাদের বাড়িমুখো হইতে তাহারা ভরসা করিত না। হরিমতি তাহাদের কাছে জুজুর মত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পরেই আমার দ্বিতীয় সন্তান মহামহিমান্বিতা শ্রীমতী গৌরীর আগমনী উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। বেদখল খোকনকে হরিমতির কবল হইতে উদ্ধার করিবার পূর্বেই গৃহিণীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। তিনি মুখভার করিয়া শত্রুর হাতে প্রথম সন্তানকে সমর্পণ করিয়া নূতনের অভ্যর্থনার আয়োজন করিবার জন্য পিতৃগৃহে গমন করিলেন। খোকন ও খোকনের পিতা হরিমতির জিম্মায় রহিল।

প্রায় এক বৎসর কাল এভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিল। খোকনের মা গৌরীকে লইয়া ব্যস্ত, খোকনের উপর হরিমতির একছত্র অধিকার। তাহার আনন্দ কত! জীবনে যে কাহাকেও পায় নাই, ভগবান তাহার প্রতি বোধ হয় কৃপা করিলেন, খোকন "দিদি" বলিতে অজ্ঞান। তাহাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া খাওয়াইয়া শোওয়াইয়াও হরিমতির তৃপ্তি নাই। আমি আমার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের জীবনে একুনে যে পরিমাণ প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করি নাই, খোকন

এক বৎসরেই তাহার চাইতে বেশী হেজলিন, পাউডার, এসেন্স মাখিয়া ফেলিল। অমুক বাড়ির অমুক ছেলের জামার ছিটটা কি চমৎকার, খোকনের জন্য ওই ছিটের একটা জামা চাই। দুই দিন অন্তরই খোকার ইজের ছোট হইয়া যাইতে লাগিল, জামায় ঘামের গন্ধ থাকিলে খোকন পরিতে পারে না, তাহার অসুখ করে। আমি পদে পদে বিপন্ন হইতে লাগিলাম।

বহু কষ্টে নিজের শোবার ঘরে একটা সিলিং-ফ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। —গরমে খোকা রাত্রে ঘুমাইতে পারে না, তাহারও একটা পাখা চাই। তোমরা যদি না দাও, আমার মাহিনার টাকা হইতে একটা পাখা কিনিয়া আন। অগত্যা পঁয়ত্রিশ টাকা ব্যয় করিয়া একটা টেবিল-ফ্যানের বন্দোবস্ত করিতে হইল।

গৃহিণী আসিয়া তেলেবেগুনে জলিয়া গেলেন। বলিলেন, আর ওকে রাখা নয়। ছেলে খারাপ হইয়া যাইতেছে। আমি এত সহজে মামলা নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না, ছেলেকে যে বাঁচাইল, ছেলেকে বাঁচাইবার অজুহাতে তাহাকে তাড়াই কি করিয়া? বাড়িতে রোজই অশান্তি ঘটিতে লাগিল। আমি বাহিরে বাহিরে থাকি, বাড়িতে ফিরিলেই ফোঁসফোঁস শুনি, একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম।

হরিমতি গৌরীকে দেখিতে পারে না, তাহার ধারণা খোকনকে যথাযোগ্য সমাদর করিবার পূর্বেই সে আসিয়া ভাগ বসাইয়াছে; তাহা ছাড়া, আজ বাদে কাল যে পর হইয়া যাইবে তাহার জন্যই বা এত কেন? খোকনের জামা জুতা ছোট হইয়া গিয়াছে, গৌরীকে তাহা পরাইবার জো নাই। ছেলের ও মেয়ের জামার কাপড়ের ছিটে যে তফাত থাকিতে পারে, মেয়ের জামার ছিট একটু জমকালো স্বভাবতই হয়, হরিমতি তাহা স্বীকার করে না। গৌরীর কাঁথা কাচিতে কাচিতে প্রাণ গেল, এদিকে কাঁথার ব্যবহার খোকনই করে বেশী। হরিমতি এবং গৃহিণীতে খোলা আদালতে একটা মামলা হইতেই শুধু বাকি রহিল।

টানাটানির মধ্যে পড়িয়া গৌরীর অন্নপ্রাশনই হইল না। মেয়েছেলের আবার অন্নপ্রাশন! গৃহিণীও হরিমতিকে তাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অফিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া হরিমতির কথায় তিনি কাঁদিতেছেন—এরূপ দৃশ্যও দুই-একদিন দেখিলাম। ইতিমধ্যে হরিমতির

বাকি মাহিনার অঙ্ক শ'য়ের কোঠায় এক দুই করিয়া উঠিতেছে। হট করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়াও যায় না।

বাহিরে শুনিয়া আসি, আমার ভাগ্য ভাল, এমন একজন লোক পাইয়াছি। ঘরে শুনি, আমিই তাহাকে নাই দিয়া মাথায় তুলিয়াছি, নহিলে একটা সাধারণ ঝি, কোথাকার কে, ঘরের লোকের মত খায়-দায় শোয় আবার চোখও রাঙায়। খোকা আর গৌরী যেন দুই শরিক, আমি যতটা পারি চোখ বুজিয়া চলিতে লাগিলাম।

বাড়াবাড়ি যে হরিমতি না করিতেছিল তাহা নয়। ঝি-গিরি করিয়া যে জীবনের অর্ধেক কাটাইল, ঠিকা ঝি সারদার সম্বন্ধে তাহার কি সুগভীর ঘৃণা! চার বৎসরের মধ্যেই সে এমন পোক্ত বড়লোক হইয়া গিয়াছে যে, ছোটলোককে ছোটলোক বলিতে তাহার একটুও বাধিত না। ধোপা ছোটলোক, নাপিত ছোটলোক, হিন্দুস্থানী চাকর রামলঘনও ছোটলোক; গণেশ নামক এক ছোকরা কিছুদিন বাড়িতে কাজ করিল, সে শুধু ছোটলোক নয়, চোর,—আমার পয়সা বেশী হইয়াছে তাই সকলকে আশকারা দিতেছি।

আমার উপরেই কি কম অত্যাচার চলিতে লাগিল! ট্যাক্সি করিয়া কোনও দিন বাড়ি আসিবার জো ছিল না,—নবাবের জামাইয়ের খুব পয়সা হয়েছে দেখছি! বন্ধু-বান্ধবদের ডাকিয়া খাওয়ানো তো একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম, মাঝে মাঝে দুই চার কাপ চা—তাহাও সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া দিবার উপায় ছিল না। এমন কি, একবার বাবা আসিয়া আমাদের বাসায় কিছুদিন থাকিয়া গেলেন। হরিমতির রাগ দেখে কে!—নিজের পেনশনের টাকা জমিয়ে ব্যাটার পয়সায় খেতে এসেছেন। থাকো দুদিন অসুখে পড়ে, কে তোমায় দেখে দেখি! কখনও শুনি—আগে দেনাগুলো শোধ কর, তার পর নবাবি ক'রো।

আমি সহ্য করি, আমার সহ্য করিবার কারণ আছে। আমি জানি, পৃথিবীতে এই স্ত্রীলোকটির আর কোনও অবলম্বন নাই, আপনার বলিতে কেহ নাই। ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে একটি আশ্রয় তাহার জুটিয়াছিল, খোকনকে কেন্দ্র করিয়া এই শুষ্ক মৃতপ্রায় বৃক্ষটি পুষ্পিত হইবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছিল, কিন্তু দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর স্নেহচ্ছায়াহীন কঠোরতা তাহার প্রতিবন্ধক। সে কিছুতেই এখানে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না।

কিন্তু গৃহিণী বোঝেন না, আর কেহ বোঝে না। নীচজাতীয়া এই স্ত্রীলোক কোন্ স্পর্ধায় মনিবের সমান হইতে চায়, খোকনের সহিত স্নেহসম্পর্ক তাহাকে কেমন করিয়া খোকনের মায়ের মর্যাদা দিতে পারে, ইহা বোঝা শক্ত। তাহার স্বভাব হোঁচট খায়, ব্যবহারে নীচতা প্রকাশ পায়, অতীত জীবনের অভদ্রতা দুই একটি নীচ কথায় আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে; কিন্তু আমি জানি, তাহার মনের পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং পরিবর্তনই তাহার দুর্দশার কারণ হইল।

খোকন হরিমতির ন্যাওটো, সেইখানেই তাহার জোর। খোকনকে দুধ খাওয়াইবার ক্ষমতা গৃহিণীর নাই। কাঁদিলে হরিমতি ছাড়া কেহ ভুলাইতে পারে না। কোনদিন মাই না পাইয়াও সে এখন পর্যন্ত মাই-টানার শখটা বজায় রাখিয়াছে, রাঁধিতে রাঁধিতে হরিমতি তাহাকে মাই দিতে বসে। সমস্ত রাত্রি হরিমতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া না শুইলে তাহার ঘুম হয় না। মায়ের তাহা সহিবে কেন! পরিশ্রান্ত দেহে রাত্রির অবসর আমার বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী স্বয়ং ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি একটু একটু করিয়া খোকনকে তাহার দিদির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম, দেখিলাম, কিন্তু কি বলিব! গৌরীর ঝঞ্ঝাট অনেকটা কমিয়াছে। খোকনের ঝক্কিও তিনি সহিবেন। তাহা ছাড়া হরিমতির কাছে কাছে থাকিলে সংস্রব-দোষ ঘটিতে পারে; এখন হইতে সাবধান হওয়া ভাল। বেশ বুঝিলাম, ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার হইতেছে।

একচক্ষু হরিণের মত একচক্ষু হরিমতি যে দিক হইতে আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়াছিল, ঠিক সেইদিক হইতেই আঘাত আসিল। এই মূর্খ স্ত্রীলোক হঠাৎ একদিন অনুভব করিল, তাহার একমাত্র আশ্রয়, সীমাহীন সমুদ্রে তাহার নিজ হাতে রচনা করা একটি মাত্র ভেলা তাহার হাত হইতে সরিয়া যাইতেছে। খোকন আর শুধু হরিমতিগত প্রাণ নয়। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, অকারণে খোকনের মায়ের সহিত ঝগড়া করিয়া কাঁদিল এবং আবার একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, সে থাকিবে না। আমি শুধু "আচ্ছা" বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলাম।

তাহার পর হইতেই দেখিলাম, হরিমতির মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে, মুখে আর কিছু আটকায় না, যাহাকে তাহাকে যা-তা বলে। যে ভালবাসা তাহার জীবনে সংযম আনিয়াছিল, সেই ভালবাসা হারাইবার ভয় তাহাকে

অসংযত করিল। খোকনকেই সে কটুকাটব্য করিতে লাগিল। সারদা, রামলঘন, আমাদের বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটে, গৃহিণী, এমন কি পাড়াপ্রতিবেশীরা পর্যন্ত বিরক্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার চুলগুলি রুক্ষ হইল, কপালে নীল শিরা দেখা দিল।

ইতিমধ্যে হরিমতির ঘরের টেবিল-ফ্যানটি হঠাৎ বিকল হইয়া গেল। পাখার হাওয়ায় ঘুমাইতে অভ্যস্ত খোকন বিনাদ্বিধায় দিদিকে ভুলিয়া আমাদের শুইবার ঘরে সন্ধ্যা হইতে আশ্রয় লইল। একদিন, দুইদিন চলিয়া গেল। সকালেই ঘুম ভাঙিতেই শুনি, উপরের কলের জল লইয়া হরিমতি তারস্বরে নীচের কাহাকে গালি-গালাজ করিতেছে। কয়লা-ভাঙা লইয়া ঝগড়া, বাসন-মাজা লইয়া ঝগড়া। তাহার এমন উগ্রমূর্তি আমি কখনও দেখি নাই। আবার এমন নরমও সে কোনদিন ছিল না, একলা বসিয়া বসিয়া প্রায়ই কাঁদিত ; গৃহিণী বলিতেন, বোধ হয় পাগল হইয়া যাইবে।

আমার লোভী ছেলে শৈশবের কথা ভুলিতেছে, তাহার বয়স চার হইয়াছে, এখন তাহার অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা ; শুধু দিদি আর তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বাহিরের জগৎ তাহাকে টানিতেছে, দিদি ভাসিয়া গেল, মাও একদিন ভাসিয়া যাইবে, গৃহিণী সে কথা এখন ভাবিতে পারেন না।

চির-আশ্রয়হীনা এই হতভাগিনী যে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে চলিয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইয়া মরিতেছিল তাহা আমিও সঠিক অনুভব করিতে পারি নাই, একদিন বৈকালে সংবাদ পাইলাম, হরিমতি বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। পদ্মা ভিতরে ভিতরে ক্ষয় সমাপ্ত করিলে পাড় ধসিয়া পড়ে। আমরা পাড় ধসাটাই দেখি, চমকাইয়া উঠি. ভিতরের খবর কতটুকু জানিতে পারি!

বাড়ি আসিয়া দেখিলাম, ডাক্তার আসিয়াছেন। অ্যাপোপ্লেক্সির স্ট্রোক—জিহ্বায় জড়তা আসিয়াছে। কথা বলিতে পারে না, শূন্যদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে সে চাহিল। কি বলিতে চেষ্টা করিল। আভাসে বুঝিলাম, খোকনকে খুঁজিতেছে।

দিনের পর দিন, সাতদিন চলিয়া গেল, হরিমতি তেমনই পড়িয়া রহিল। চোখ বন্ধ, বিকৃত বিশীর্ণ মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছে ; তাহার দক্ষিণাঙ্গ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। বহুকষ্টে নিঃশ্বাস লইয়া বহির্মুখ প্রাণটাকে সে দেহে রাখিতে চাহিতেছিল। অন্য চেতনার লক্ষণ নাই। কিন্তু যেই খোকন

কাঁদিল, কি কাছে কোথায়ও কথা কহিল, অমনই ঘোলাটে চক্ষুটি মেলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া সে এদিক-ওদিক তাহাকে খুঁজিত। হরিমতির ঘরে খোকন খাইতে বসিলে সে একদৃষ্টে তাহাকে দেখিত ; খোকন এক-আধ বার কাছে গিয়া 'দিদি' বলিয়া ডাকিলে হরিমতি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিত, পারিত না। অকৃতজ্ঞ শিশু এ দৃশ্য দেখিতেও চাহিত না। পলাইয়া যাইত। আমি জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতাম, সামনে বসিতে বলিতাম। তাহার খেলায় মন ; হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইত। হরিমতির নষ্ট চোখটি ছাপাইয়া জল ঝরিত।

গৃহিণী হরিমতিকে তাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, সে নিজেও চলিয়া যাইবে বলিয়াছিল, কিন্তু এভাবে যে সে যাইবে তাহা কে জানিত! গৃহিণী শেষে কথা বলিতেন না, নিঃশব্দে এই অসহায়া বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। রাত্রে দেখিতাম, তিনি ঘন ঘন হরিমতির কাছে যাইতেছেন। আমাকে শুধু বলিতেন, বড় কষ্ট হচ্ছে ওর, না গো? ছেলের অকৃতজ্ঞতায় তিনিও লজ্জিত। 'পাজি' ছেলেকে তাহার দিদির কাছে হাজির থাকিবার জন্য তিনি কাতর অনুরোধ করিতেন, কিন্তু চার বৎসরের শিশুর মনস্তত্ত্ব কে বুঝিবে?

হরিমতি যদি মরে, তবে বুঝিব এই স্নেহই তাহার কাল হইল। জীবনের পঞ্চান্ন বৎসর সকল স্নেহ-বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা যেমন করিয়া এঁটোকাঁটা-সকড়ি লম্বা লম্বা পদক্ষেপে ডিঙাইয়া যায়, তেমনই করিয়া সকল আকর্ষণকে সে ডিঙাইয়া আসিয়াছিল, খোকনকে ভালবাসিয়া স্বধর্মচ্যুত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িল। যে ভালবাসা মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করে, সেই ভালবাসাই মৃত্যুর মুখে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। ইহা কাহারও পরিহাস কি না তোমরাই ভাল বলিতে পারিবে। নিরুপায় হইয়া উহাকে তোমাদের নিকট আনিয়াছি, দেখিও ও যেন শান্তিতে মরিতে পারে। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

* * * *

শ্যামচরণ চুপ করিল, তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে, চোখের কোণে জলও যেন চকচক করিল। অস্বীকার করিব না, আমিও কিঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পেয়ালায় অর্ধভুক্ত চা ঠাণ্ডা জল লইয়া গিয়াছে।

দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলাম, সবই তো বুঝলাম শ্যামচরণ, তুমি তো বেশ নিঃশব্দে তোমার গৃহিণী আর সন্তানের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে মনে মনে বীরত্ব অনুভব করছ—আমরা ডাক্তার মানুষ, সব জিনিস আমাদের রয়ে-সয়ে নিতে হয়। সাইকলজিক্যাল গল্প হিসেবে তোমার গল্পটা ভাল, কিন্তু নিছক গল্প ওটা।

শ্যামচরণ যেন আহত হইল। ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না। বলিলাম, বুঝতে ঠিকই পারছ, সত্যের খাতিরে এমন একটা কল্পনাকে মাঠে মারা যেতে দিতে চাও না।

শ্যামচরণ অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম, অর্থাৎ, খোকনের সংস্রবে না এলেও, আজ হোক, দুদিন বাদে হোক এ স্ট্রোক ওর আসতই। নিজের অপরাধে যে বিষ ওর শরীরে ঢুকেছে স্বয়ং ভগবানেরও ওকে বেকসুর খালাস দেবার ক্ষমতা ছিল না। স্ট্রোকটা সিফিলিটিক।

শ্যামচরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ অত্যন্ত আবেগে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া ধরা গলায় বলিল, তা হোক, তবু—

আমি তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম, নিশ্চয়ই, আমার ডিউটি, আমি করব বইকি। এস।

বৃদ্ধা তেমনই অসাড়ভাবে পড়িয়া ছিল। শ্যামচরণ কাছে যাইতেই একবার চোখ মেলিয়া দেখিল এবং আরও যেন কি খুঁজিতে লাগিল।

আমি সস্নেহে তাহার ব্যাকুল চোখের পাতার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্যামচরণকে বলিলাম, এবার যখন আসবে তোমার খোকনকে সঙ্গে এনো।

১৩৪০

দেখে যা পাগলী

রামহরি চাটুজ্জে আজ বিশ বৎসর ধরিয়া উল্টাডিঙি স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার; বেতন সাড়ে বাইশ টাকা, কিন্তু বিশ্রাম নাই। দিন ও রাত্রি সকল প্রহরেই একটা না একটা ট্রেন হয় এদিক, নয় ওদিক—থামিবার বালাই নাই, গমগম করিয়া ছোট্ট স্টেশনটির বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া যায়। রামহরিকে প্রত্যেকটি ট্রেন পাস করাইবার জন্য স্টেশনে হাজির থাকিতে হয়। রামহরির ভালই লাগে।

কিন্তু পত্নী কালীতারা গোল বাধায়; বলে, মুয়ে আগুন এমন চাকরির। রেতে ঘুম, দিনে বিশ্রাম নেই, খালি ডিউটি আর ডিউটি। তবু যদি এক মিনিটের জন্যেও একটা থামত!

অপ্রস্তুত রামহরি একগাল হাসিয়া বলে, পাগলী, এও কি কম অনার রে! দার্জিলিঙ মেল, শিলঙ মেল, চাটগা মেল, লাটের স্পেশাল—আমি পাস না করলে কই যাক দেখি!

কালীতারা একটু চঞ্চল হয়, বুকটা স্বামী-গর্বে যে একটু না ফোলে তা নয়, তবু অভিমান বজায় রাখিয়া বলে ভারী তো অনার, তবু মাইনে যদি সাড়ে বাইশ টাকার বেশী হত, এর চাইতে বুকের পাটা থাকে, চল, শিয়ালদার মোড়ে পানের দোকান করি; খেয়ে-পরে সুখ হবে।

এ বিষয়ে রামহরির বুকের পাটা সত্যই ছিল না। কালীতারা একে সুন্দরী, তায় বন্ধ্যা। বয়স ত্রিশ হইলে কি হয়, আঁটসাঁট গড়ন। না-থামা ট্রেনের গার্ড আর ড্রাইভারগুলা যে ভাবে লোলুপ দৃষ্টি হানিতে হানিতে চায়, রামহরির হাত নিশপিশ করিতে থাকে; ভাবে, দিই একটা কয়লার চাপ ছুঁড়িয়া। কিন্তু কালীতারা তেমন নয়, জানালায় বড় একটা দাঁড়ায় না।

স্টেশনের খুব কাছেই কোয়ার্টার্স; একতলা বাড়ি—দুইখানা ছোট্ট ছোট্ট কুঠরি; একটুখানি বারান্দা, সেখানে রান্না হয়; খানিকটা উঠান। এইখানেই রামহরি আজ কুড়ি বৎসর বাস করিতেছে। পয়েন্টস্‌ম্যান দুখিয়া অবসর সময়ে এটা সেটা ফাই-ফরমাশ খাটিয়া দেয়, জল তুলিয়া দেয়। সাড়ে বাইশ টাকাতেই কোনও রকমে চলিয়া যায়।

এমনই করিয়াই বেশ দিন যাইতেছিল। শোবার ঘরের দেওয়ালে কখন কোন্ ট্রেন আসিবে মিনিট ধরিয়া চার্ট করা আছে—দেখিয়া দেখিয়া কালীতারারও মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। সময়ের বদল হয়, রামহরি সঙ্গে সঙ্গে টুকিয়া রাখে। স্থানীয় লাইব্রেরি হইতে রামহরি রহস্যলহরী সিরিজের 'পিশাচ পুরোহিত' কিংবা 'রূপসী বোম্বেটে' অথবা ওই ধরনের একটা কোনও বই একটা টাকা জমা রাখিয়া লইয়া আসে। জোরে জোরে কালীতারাকে শুনাইয়া শুনাইয়া সে পড়িয়া যায়; কালীতারা পান সাজিতে সাজিতে অথবা দোক্তা গুঁড়া করিতে করিতে একাগ্র চিত্তে শোনে, হঠাৎ চার্টের দিকে চাহিয়া রামহরি লাফাইয়া উঠে, বলে, আমার পাৎলুন!

কালীতারা পাৎলুন পরাইয়া দেয়; রামহরি 'রূপসী বোম্বেটে'র পাতায় ছেঁড়া মাদুরের একটা কাঠি গুঁজিয়া দিতে দিতে বলে, খবরদার, তুমি নিজে পড়ো না বলছি—সিক্সটিন আপকে পাস করে দিয়ে আমি এলাম বলে। বেল্ট আঁটিতে আঁটিতে রামহরি বাহির হইয়া যায়। কালীতারা উঠিয়া ভাতের ফেন গড়াইয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়ায়। মেঘে মেঘে রাত্রির অন্ধকার আরও কালো হইয়াছে। দূরে দূরে রাস্তার এবং বাড়ির ইলেক্ট্রিক আর গ্যাসের ভিজা আলো তাহার মনে মোহ বিস্তার করে। সে শ্রীরামপুরে তাহার বাপের বাড়ির কথা ভাবে। এত কাছে, কিন্তু এত দূর! দাদার ছেলেমেয়েরা কত বড় হইল! খেন্তীর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইল কি না! আহা, তাহার একটা মেয়েও যদি হইত! বসিয়া বসিয়া সময় আর কাটিতে চায় না। কত আজগুবী কথা মনে হয়—ভাল, মন্দ। সামান্য একটা মেয়ে, তাহাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া ধোয়া-পোঁছা করিয়া সময়টা কেমন করিয়া কাটিয়া যাইত! বুড়া বয়সে পুতুল খেলা আর ভাল লাগে না। প্রথম পাঁচ সাত বৎসর সে খুব ঘটা করিয়া পুতুল খেলিয়াছিল। কিন্তু অন্য মানুষের পুতুলশাবক দুই একটি না আসিয়া জুটিলে এ খেলাও জমে না। ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে, ফুলশয্যা, পূজা, জামাই-ষষ্ঠীর তত্ত্ব—মাদুলিও তো সে কম লয় নাই। ঘোষপাড়ার শিবের কাছে ধন্নাও দিয়া আসিয়াছে—একটা সন্তান, একটা ছেলে—

পিছন হইতে রামহরি পাৎলুন খুলিতে খুলিতে হাঁকে, শেষ করে ফেলেছ বুঝি? নাঃ, তোমাকে নিয়ে পারবার জো নেই, একাই পড়তে হবে আমাকে।

কালীতারা আলোটা উসকাইয়া দেয়; পা ধুইবার জল গামছা। আসন পাতিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে বসে।

গোল বাধিল রামহরির মেজো শালীর অপ্রত্যাশিত আগমনে; নিটোল স্বাস্থ্যবতী যুবতী, একটি মাত্র পাঁচ বৎসরের শিশু কোলে; স্বামী সি. পি.তে বন-বিভাগে কাজ করে। ঘুষঘাষ লইয়া প্রচুর রোজগার, এবং সেই রোজগারের বার্তা শ্যালিকা সুহাসিনীর সর্বাঙ্গ ছাপিয়া উপচিয়া পড়িতেছে। দিদির জন্য সুহাসিনী একটা পীস-সমেত আলপাকার শাড়ি আনিয়াছিল—ধূলা পায়েই সে তাহা দিদিকে পরাইতে বসিয়া গেল। দেওর পৌছাইয়া দিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে; জামাইবাবু স্টেশনে। কালীতারা চোখের জল মুছিতে মুছিতে হাসিতে লাগিল। খোকাকে লইয়া সে যে কি করিবে!

শ্যালিকার আগমন-সংবাদ রামহরির প্রাণেও যেন নূতন যৌবনের জোয়ার আনিল। উল্টাডিঙি স্টেশনটাকেই মনে হইল যেন শিয়ালদার চাইতে অনেক বড়; কিন্তু সে কথা কালীতারা না হয় বুঝিল, শ্যালিকাকে সে বুঝাইবে কেমন করিয়া? তাহার প্রতিপত্তির পরিচয় সে কি করিয়া দিবে।

আপ দার্জিলিঙ মেলকে বিদায় দিয়া রামহরি যখন বাসায় ফিরিল, তখন দুই বোনের মনের হিসাব-নিকাশ হইয়া গিয়াছে। দুঃখী কালীতারার দুঃখে সুহাসিনী কাঁদিতেছে। রামহরি ঘরে আসিতেই সুহাসিনী ঢিপ করিয়া তাহাকে একটা প্রণাম করিয়াই বলিল, সিগন্যাল ডাউন করে দিয়ে এলেন তো দাদাবাবু, না আবার এখুনি ছুটতে হবে? ধন্যি লোক আপনি যা হোক!

বুঝিতে না পারিয়া রামহরি ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কালীতারা বলিল, তুই থাম সুহাস, খেটে-খুটে এল—

সুহাস দাদাবাবুর জন্য গাড়ু গামছা ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল, পোড়া কপাল অমন খাটুনির, সবার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেড়ে এমন চাকরি না করলেই নয়! তার চাইতে চলুন আমাদের ওখানে, ওঁর হাতে অনেক চাকরি আছে। একসঙ্গে দু বোনে—

রামহরি আহত হইল। বিশ বছরের মোহ—এমন নিন্দার চাকরিই বা কি! শহরের কাছেই; হুট বলিতেই কলিকাতায় যাওয়া যাইতেছে। বাপ রে, সি. পি.র জঙ্গলে সে যাইতে পারিবে না।

রাত্রে শোওয়ার পর কালীতারা আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, যেখানে ট্রেন থামে না, সেখানকার স্টেশনমাস্টারের চাকরি লোকে নাই করিল!

কালীতারা এখান হইতে পলাইবার জন্য কেন ছটফট করিতেছে, রামহরি তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া? খোকাকে দেখিয়া অবধি কালীতারা নিজের কাছ হইতেও পলাইতে চায়—অসহ্য, অসহ্য; রেল-লাইনের দিকে চাহিয়া চক্ষু তাহার ধাঁধিয়া গেল।

রামহরি বুঝিল না, তাহার অভিমান হইল।

পরের দিন সকালে দার্জ্জিলিঙ মেল পাস করিবে, সুহাস খোকাকে লইয়া স্টেশনে হাজির। বলিল, আপনার চাকরি দেখতে এলাম চাটুজ্জে মশাই।

রামহরি হঠাৎ প্রথমটা খুশী হইয়া গম্ভীর হইয়া গেল। সুহাস যে গায়ে পড়িয়া অপমান করিতে আসিয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। দুখিয়াকে এক গ্লাস জল আনিতে বলিয়া সে ট্রেনের তত্ত্ব করিতে গেল। ইয়েস, টু নাইন সিক্স এইট। হাতলটা টিপিয়া দিতেই ঘড়াং ঘড়াং করিয়া দুই বার আওয়াজ হইয়া লাইন-ক্লিয়ারের বলটা বাহির হইয়া আসিল। লাল পতাকার উপর নীল পতাকাটি জড়াইয়া লইয়া টলিতে টলিতে রামহরি প্ল্যাটফর্মে আসিল। সুহাস ছুটাছুটি করিয়া খোকাকে খেলা দিতেছে; দুখিয়াও কাছে কাছে ঘুরিতেছে, বেটা সুহাসের গয়না-কাপড়ের জমকে ভুলিয়াছে।

রামহরির মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কালীতারা বাসার দরজার বাহিরে আসিয়া আমগাছের আড়াল হইতে ব্যাপারটা দেখিতেছে। মাথায় আধঘোমটা। সে কি ভাবিতেছে, কে জানে!

সুহাস চাকরি দেখিবে! দেখ চাকরি। সে কি একটা কেউকেটা! তাহার হুকুম না পাইলে ট্রেন কই যাক দেখি! নাগপুরের জঙ্গলে জঙ্গলে কাক তাড়াইয়া বেড়ানোর চাইতে এ অনেক ভাল। সেখানে কে কাহাকে খাতির করে! সুহাস একবার দেখিয়া যাক, কালীতারাও বুঝুক, কে বড়—ভগিনীপতি, না স্বামী!

দূরে ধোঁয়া দেখা গেল; গমগম আওয়াজে সামনের লাইনগুলা পর্যন্ত কাঁপিতে লাগিল! সুহাস খোকাকে টানিয়া লইয়া প্ল্যাটফর্মের ধার হইতে একটু ভিতরে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। কালীতারার মাথার গুণ্ঠন একেবারে খসিয়া পড়িয়াছে। স্টেশনে বেশী লোক নাই। রামহরির দুঃখ হইল। লাইব্রেরিয়ান অধরবাবু ভারী ঠাট্টা করে। ভদ্রলোক এই সময় থাকিলে ভাল হইত।

দার্জিলিঙ মেল বিদ্যুৎগতিতে স্টেশন-ইয়ার্ডে প্রবেশ করিল, নিমেষমধ্যে প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইয়া তাহাকে উপহাস করিতে করিতে কলিকাতায় গিয়া পৌছিবে। সুহাস পাশে দাঁড়াইয়া হাসিবে, কালীতারাও সম্ভবত মনে মনে ঠাট্টা করিতে ছাড়িবে না।

রামহরি হঠাৎ পাগলের মত নীল পতাকাটি পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া লাল পতাকাটি দুই হাতে ধরিয়া মাথার উপর তুলিয়া সবেগে ঘুরাইতে লাগিল। ভুল হল বাবু, ভুল হল বাবু।—বলিয়া দুখিয়া ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ততক্ষণে কাজ হইয়া গিয়াছে। ঘড়াং ঘড়াং ঘড় কোঁচ কাঁচ করিতে করিতে সেই লৌহ-সরীসৃপ থামিয়া পড়িয়া গজরাইতে লাগিল।

রামহরির সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে তখনও পতাকা নাড়িতেছে আর মুখ ফিরাইয়া কালীতারার দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, দেখে যা পাগলী, দেখে যা, আমার কথায় দার্জিলিঙ মেল থামে কি না! দেখে যা পাগলী, দেখে যা, দেখে যা পাগলী—

হৈ হৈ রব উঠিল। সুহাস বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। কালীতারা আত্মবিস্মৃত হইয়া ছুটিয়া স্টেশনের দিকে আসিতে লাগিল। উত্তেজনার পর দারুণ অবসাদে রামহরি তখন প্ল্যাটফর্মের উপর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

১৩৪০

পঞ্চম বাহিনী

পৃথিবীর সর্বত্র, এমন কি আমাদের দেশেও, নারী জাতি আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বামীর নাম ধরিয়া ডাকিতে বাধা নাই, পতি-দেবতার পাতে প্রসাদ খাওয়া কম্পালসারি বা "বাধ্যতামূলক" নয়, তাঁহারা হাতে মনিব্যাগসমন্বিত "দেমাক-ব্যাগ" বহন করিতে পারেন, প্রয়োজনমত রোদে-বৃষ্টিতে ছাতা ব্যবহার করিবারও বাধা নাই, "লেডি'জ ফার্স্ট" এই অসম্মান-সূচক পুরাতন গালাগালি আর চলে না, "লেডি" বা "মহিলা"ও অচল হইয়া আসিয়াছে, পুরাতনপন্থী 'প্রবাসী' "মহিলা-সংবাদ" এখন পর্যন্ত দিতে থাকিলেও অন্যত্র "নারীর কথা"ই শুনিতেছি, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর "লেডি'জ আওয়ার" বা "মহিলা-মজলিসে"র বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছে। এখন সর্বত্রই "নারী" প্রধান—নারী এবং নর। অর্থাৎ মেয়েদের স্ট্যাটাস পুরুষদের সমান হইয়াছে, শুধু ট্রেনে, ট্রামে ও বাসে তাঁহাদের স্ট্যাটাস একটু বেশী, রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে তপসিল-ভুক্তদের মত তাঁহাদের স্বতন্ত্র আসন। "শুন হে মানুষ ভাই" ইহাই এখনকার মন্ত্র এবং "মানুষ" বলিতে মেয়েমানুষ নিশ্চয়ই বাদ পড়ে না; সহজিয়া চণ্ডীদাসের সে বাসনা কখনই থাকিতে পারে না।

পাঠিকারা মাপ করিবেন, আমরা দুই চারি বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি; যখন আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদিগকে বারংবার ঋতু মধ্যে এবং ঋতুর বাহিরেও (in season and out of season) রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' আওড়াইয়া বলিতে হইত—

> পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
> পিছে সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
> মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
> যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
> কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
> যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী।
> আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
> আমি……

সে বালাইও তখন ছিল, বার্থ কণ্ট্রোলের এতটা রেওয়াজ হয় নাই। তখন সাংখ্যমতে পুরুষ কর্তা, প্রকৃতি কর্তিত হইতেন, খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ছিল। মেয়েরা ছিলেন এক একটি দেশ বা রাজ্য বিশেষ—তাঁহাদিগকে ছলে বলে কৌশলে জয় করিতে হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজ্যলাভের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সহজ, প্রায় নিলামে ডাকার মত। কিন্তু সহজও কাহারও কাহারও ভাগ্যে হইয়া উঠিত অত্যন্ত কঠিন।

সুনীল রায় এই দুর্ভাগাদের একজন। বিধবা মা একমাত্র-পুত্রগত-প্রাণ। সেদিক দিয়া কোনও বাধা ছিল না। পিতার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ মন্দ ছিল না, কিছু জমিদারিও ছিল। কলিকাতায় গোটা তিনেক বাড়ি, ভাড়ার টাকাতেই মা-বেটার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত।

বেশ দিন যাইতেছিল; বি. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত চায়ের পেয়ালা ও টেনিস র‍্যাকেট আশ্রয় করিয়া সুনীল সুখেই ছিল। ইউনিভারসিটি পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে আসিয়া একটা অজানা এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর অনুভূতি সুনীলের মানস-আকাশে বিদ্যুৎ-চমকের মত খেলিয়া গেল এবং পরে মুহুর্মুহু খেলিতে লাগিল। শেষে আর থামিতেই চায় না। এখনকার ঘটনা হইলে বলিতাম, সুনীল প্রেমে পড়িল; কিন্তু তাহা বলিবার উপায় নাই। কিছুকাল পূর্বেকার ঘটনা।

সুনীল একটি রাজ্য আবিষ্কার করিল এবং তাহা অধিকার করিবার জন্য লোলুপ হইল। রাজ্যের অবস্থা ভাল, নিলামে চড়িবার মত নয়। শ্রীমতী রেখা সেন বেথুন কলেজ হইতে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া বি-গ্রুপে ভর্তি হইয়াছে। তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবামাত্র সুনীলের তৃতীয় রিপুটি প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজ্যই হউক, আর যাই হউক, প্রথম শ্রেণীর অনার্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পাস কোর্সের কাহাকেও গ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করে না। সুনীলের মত সাধারণ চেহারার লোক হইলে তো কথাই নাই।

সুনীলের একটা গুণ ছিল, সে ভাল কবিতা লিখিত। কিন্তু কবিতার বই ছাপা হয় নাই, মাসিকপত্রের তরণীতেও তখনও খেয়া শুরু হয় নাই। বলা নাই, কহা নাই, ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে কবিতা লিখিয়া নীচে নাম সহি করিতে সুনীলের বাধিল, সুতরাং পাসে-অনার্সে বৈদ্যুতিক সংস্পর্শ ঘটিল না।

বক্তিয়ার খিলিজি অথবা লর্ড ক্লাইবের ভাগ্য সকলের হয় না; রাজ্য জয় করিতে হইলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধের জন্য যে কোনও সেনাপতি পুরাতন

মতে চারি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য। প্রথম নৌসেনা, দ্বিতীয় গোলন্দাজ সেনা, তৃতীয় অশ্বারোহী সেনা এবং চতুর্থ পদাতিক—নেভি, আর্টিলারি, ক্যাভালরি ও ইনফ্যান্ট্রি। এই চতুরঙ্গবাহিনীর যে কোনও একটিতে কাজ হইতে পারে অথবা চারিটিকেই একসঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। সুনীল একে একে প্রত্যেকটির প্রয়োগ করিতে লাগিল।

* * *

জুলাই মাসে সেসন আরম্ভ হইয়াছিল, আগস্ট মাসেই উদ্দিষ্ট রাজ্যের বিরুদ্ধে নৌ-বল প্রয়োগের সুযোগ উপস্থিত হইল। সুনীল কৌশলী সেনাপতির মত তৎপরতার সহিত সুযোগ গ্রহণ করিল।

ডক্টর চাটুজ্জের ক্লাস চলিতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, একেবারে ভাদুরে বৃষ্টি! সুনীলের কবি-মন সহসা "শূন্য মন্দির মোর" "শূন্য মন্দির মোর" বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল; ঘণ্টা বাজিয়া গেল, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। অধ্যাপক নিজ বিশ্রাম-কক্ষে চলিয়া যাইতেই ছেলেরা এবং মেয়েরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ক্লাসের মধ্যেই এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িল। দুই চারিজন বাউল-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্র গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। সুনীলের লক্ষ্য স্থির ছিল, সুতরাং সে একাকী একটা জানালার ধারে গিয়া ধূমপান করিতে করিতে অপেক্ষা করিতে লাগিল; রেখা সেন একটি দলের কেন্দ্রস্থলে আসর জাঁকাইয়া বসিয়া ছিল। এত কথা বলিতেও পারে মেয়েটা! কিন্তু কথাগুলি কি মিষ্টি!

হঠাৎ হাতঘড়ি দেখিয়া রেখা উঠিয়া পড়িতেই সুনীলও আই-বি-পুলিসের পথে-অপেক্ষমান প্লেন-ড্রেস স্পাইয়ের মত সচকিত হইয়া উঠিল, এবং রেখার পিছনে পিছনে ক্লাসের বাহিরে সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। রেখা লিফ্‌ট ব্যবহার করিল না। বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া অপাঙ্গে একবার বারান্দায় সমবেত ছেলেদের দিকে চাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। চুম্বক অধোগামী হইলে লৌহের অধোগমনও অনিবার্য! সুনীলও এক-পা দুই-পা করিয়া নিম্নগামী হইতে লাগিল।

রেখা বাহিরে পা দিতেছে, আর অপেক্ষা করা চলে না। সুনীল দ্রুত তাহার সঙ্গ ধরিয়া মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, ভিজে যাবেন না, দেখছেন বৃষ্টির তোড়!

রেখা সবই অনুভবে বুঝিতেছিল, যেন আকাশ হইতে পড়িতেছে এই ভাবে

পিছনে ফিরিয়া বলিল, ভিজব বলেই তো বেরিয়েছি, সঙ্গে ছাতা বা ওয়াটার-প্রুফ যখন নিই নি।—রেখা অগ্রসর হইল।

আক্রমণের সুযোগ কোনও সেনাপতিই ছাড়ে না। সুনীল বলিল, যদি কিছু মনে না করেন আমার ওয়াটার-প্রুফটা—

গতি রুদ্ধ হইল। বিস্ময়ের ভান করিয়া রেখা বলিল, আপনাকে তো আমি চিনি না। তবে ক্লাসে দেখি বটে।

সুনীল নিজে অপ্রস্তুত হইয়া বুঝিল, প্রতিপক্ষ অপ্রস্তুত নয়। একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, তাই কি যথেষ্ট নয়?

মহারাণী যে ভঙ্গিতে প্রজার সেলামী গ্রহণ করেন, ঠিক সেই ভঙ্গিতে রেখা হাত বাড়াইয়া দিল এবং ওয়াটার-প্রুফটা গায়ে দিতে দিতে বলিল, কাল ক্লাসে আসছেন তো? সেখানেই ফেরত দেব।

ভঙ্গির আঘাতে সুনীল কেমন বিমূঢ় হইয়া গেল, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আপনার সঙ্গে গেলে আপত্তি হবে আপনার? বৃষ্টিতে ভিজতে ভালই লাগবে আমার।

রেখা সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, বলিল, অদ্ভুত লোক তো আপনি! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি দিয়ে। তা ছাড়া ভিজতে আমারই বা ভাল লাগবে না কেন? এই নিন আপনার ওয়াটার-প্রুফ। আমি চললাম

সুনীল আরও বিমূঢ় হইয়া গেল। কাতর ভাবে বলিল, সে ভাবে আমি বলি নি কথাটা, মাফ করবেন—

সিঁড়িতে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল, আর দেরি করিলে হাস্যকর দৃশ্যটা সকলের চোখে পড়িবে। রেখা বলিল, তর্ক করবার সময় নেই আমার, নিন আপনার ওয়াটার-প্রুফ।

বৃষ্টির মধ্যেই রেখা বাহির হইয়া গেল। সুনীলের বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। সামান্য চালের ভুলে তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া নৌ-বল অর্থাৎ ওয়াটার-প্রুফের আক্রমণ বিফল হইয়া গেল।

* * *

ইহার পর আর্টিলারি বা গোলন্দাজ সৈন্য। সুনীলের এখন ক্লাসে একটি মাত্র কাজ। রেখা ক্লাসে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে; চোখ দিয়া অবিরত মিনতি, ভিক্ষা, বিস্ময়, বিহ্বলতা

প্রভৃতি তীক্ষ্ণ ও ভোঁতা অস্ত্রসকল নির্গত হইতে থাকে, কিন্তু রেখা অবজ্ঞার বর্মে আবৃত থাকাতে অস্ত্র প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। শেষ পর্যন্ত ক্লাসের সকলেরই ইহা লক্ষ্যগোচর হইল, ইঙ্গিত ইশারা হাসাহাসি চলিতে লাগিল, কিন্তু সুনীল দমিল না। পাকা মাছ-ধরিয়ে যেভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ ফেলিয়া ফাতনার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে, সুনীলও ঠিক তেমনি অপলক দৃষ্টিতে রেখার মুখের দিকে চায়। রেখার অসহ্য হইল, একদিন ইউনিভারসিটির গেটের সামনে সুনীলকে তাহার ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা না দিয়া পারিল না। শেষ পর্যন্ত বলিল, আপনি যদি নির্লজ্জের মত এমন করতে থাকেন, তা হলে হয় আপনার নামে নালিশ করতে হবে, নয় আমাকেই লেখাপড়া ছাড়তে হবে। তবে প্রথমটা আমি করতে চাই না, ক্লাসই ছাড়তে হবে দেখছি।

এ সম্ভাবনার কথা সুনীলের মনেও উদিত হয় নাই। সে আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে বলিয়া উঠিল, না না, সে আপনি করবেন না, তার চাইতে আমিই বরং—

সুনীল ভাল অভিনয় করিলেও কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর হইল না। তাহার কবিতার খাতার সাদা পাতাগুলি কেবল কালো হইয়াই চলিল।

* * *

শেষ পর্যন্ত ক্যাভালরি বা অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে এই কবিতা-অস্ত্রই প্রয়োগ করিতে হইল। আগে ঘোড়ার ডাক বসাইয়া চিঠিপত্র চালাচালি হইত। এ যুগে ঘোড়ার ডাক নাই বটে, কিন্তু চিঠিপত্রগুলিই অশ্বারোহী সৈন্যের কাজ করিয়া থাকে। রেখার ঠিকানা সংগ্রহ করা কঠিন হইল না। রেখার উদ্দেশ্যে লিখিত বাছা বাছা কবিতা বেনামী চিঠি মারফত তাহার নিকট পৌঁছিতে লাগিল। কবিতাগুলি মন্দ নয়—ভিতরে আবেগ আছে। রেখা ঠিক ধরিতে পারে না, অনুমান করে। কিন্তু প্রত্যহ বেনামী চিঠি আসিতে থাকিলে, যে কোনও ভদ্র কুমারী মেয়ের আতঙ্কিত হওয়ার কথা। মা-বউদিরা রোজই প্রশ্নালু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চান, রেখার মুখ কান লাল হইয়া উঠে। শেষে একদিন আন্দাজে ভর করিয়া আবার সুনীলকে ধরিল। বলিল, আপনার কবিতাগুলি ভালই, কিন্তু দোহাই আপনার, এই রাহুর প্রেম থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। সমাজে বাস করতে হয় আমাকে।

সুনীল যেন কিছুই জানে না, এরূপ ভঙ্গি করিল। বলিল, কার কবিতার কথা বলছেন? কিছুই বুঝতে পারছি না তো!

রেখা চটিয়া উঠিয়া বলিল, খুব ন্যাকা আপনি! ডাকঘরকে অতগুলো পয়সা দিয়ে মরছেন কেন? খাতা থাকে তো দেবেন, পড়ে দেখব।

সুনীল বোকা সাজিয়া বসিল, কবিতা? কবিতা তো আমি লিখতে পারি না মিস—

মিস সেন, রেখা সেন আমার নাম, জানেন না আপনি?

না তো।

না তো! আমার সঙ্গে তবে অমন করেন কেন?

দেখুন মিস সেন, আপনাকে আমার ভাল লাগে। ছেলেবেলায় একটা কবিতা লিখেছিলুম; আপনাকে দেখে এই বয়সে আবার কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয়।

রাগে রেখার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, আপনাকে আমার একটুও ভাল লাগে না মশাই, স্নীক কাপুরুষ আপনি। আমাকে আর জ্বালাবেন না বলে দিচ্ছি।

রেখা গটমট করিয়া চলিয়া গেল। অশ্বারোহী দলও কোন কাজে আসিল না।

* * *

সুতরাং সাধারণ যুদ্ধে, বিশেষ করিয়া এদেশে, যাহা শেষ অস্ত্র—ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি বা পদাতিক প্রয়োগ করিতে হইল। বর্তমানে এ সৈন্যদল ঘটক সম্প্রদায় নামে পরিচিত; পায়ে চলেন বলিয়া ইঁহাদের সর্বত্র গতিবিধি; আকৃতিতে সাধারণ, কিন্তু প্রকৃতিতে অতিশয় নির্ভীক ইঁহারা। একমাত্র ছেলে, মা তবু বলিলেন, ছি ছি, আমি বরের মা—আমি মাথা নোয়াব ওদের কাছে! তোর কি হল বল্ তো!

সুনীল মুখখানাকে যোগী তপস্বীদের মত কঠোর করিয়া বলিল, রেখার সঙ্গে বিয়ে হল তো হল, নইলে সেদিন মঠে স্বামী প্রণবানন্দের সঙ্গে কথা বলে এসেছি; তখন যেন কান্নাকাটি করো না।

মা যখন, তখন নিরুপায়। ঘটক আসিল; শত্রু-দুর্গ আক্রান্ত হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ভগ্নদূত হইয়া যে খবর দিয়া গেলেন তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। রেখার বাপ-মায়ের কোনই আপত্তি নাই। ছেলের পয়সা আছে,

দেখিতেও চলনসই, লেখাপড়াও করিতেছে, কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজি নয়। সে এম. এ. পাস করিয়া ইংরেজি সাহিত্যে রিসার্চ করিবে, এখন বিবাহ করার ফুরসত তাহার নাই।

সব উপায় ভেস্তিয়া গেল। ঘটনাগুলি যেভাবে সংক্ষেপে লিখিত হইল, অত সহজেই যে ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই; প্রত্যেকটি অস্ত্র প্রয়োগের ব্যাপার লইয়া এক একটা স্বতন্ত্র কাহিনী রচিত হইতে পারে; প্রত্যেকটি যে স্বতন্ত্রভাবে ঘটিয়াছে তাহাও নয়। আমরা পরিণামটা দেখাইতেছি বলিয়া ইতিহাসের আকারে লিখিলাম। ইতিহাস নীরস; অতি প্রয়োজনীয় ঘটনাকেও সে অনাবশ্যক বলিয়া বাদ দেয়।

পরাজিত এবং বিধ্বস্ত সুনীল কিন্তু দমিল না। সে ব্রুস ও মাকড়সার কাহিনী পড়িয়াছে, মহাবীর নেপোলিয়ানের জীবনও তাহার অজ্ঞাত নয়। প্রাচীন মিডিভাল ও আধুনিক রণকৌশলী সেনানায়কদের রণনীতিবিষয়ক যাবতীয় সাহিত্য সে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। একটুও হতাশ হইল না। তাহার মনের আশাই ক্রমশ কবিতার আকারে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কবি কিন্তু নিজের নাম গোপন করিল। দেখিতে দেখিতে কবি অদ্বৈত রায় বাংলাদেশের সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিল।

কিন্তু কবি স্বয়ং বাহিরে ধীর স্থির—প্রশান্ত মহাসাগর। ক্লাসে যায়, চুপচাপ বসিয়া থাকে, ক্লাসে যে অন্য ছাত্রছাত্রী আছে তাহার মুখের ভাব দেখিয়া তাহা বোঝাই যায় না। রেখার অস্তিত্ব যেন সুনীলের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। অনেক দিনের অভ্যাস, রেখারও কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। অকারণে সে সুনীলের দিকে চায়, সুনীলের কথা ভাবে। কি হইল ভদ্রলোকের? আশ্চর্য তো!

কিছুই আশ্চর্য নয়। সুনীল তখন গভীরে মন দিয়াছিল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, এ যুগের হালকা মেয়েদের ছেলেমানুষি এবং বেকুবির ভাব দেখাইয়াই সহজে কাত করা যাইবে; রেখার বেলায় সে অস্ত্র খাটিল না। ওরই মধ্যে একটু অসাধারণ সে। সুতরাং সুনীল বাহিরের জাল গুটাইয়া ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। এতদিন হেলাফেলায় যে অভিনয় করিয়াছে, তাহার জন্য লজ্জা হইল তার। নিজেকে বড়ই খেলো করিয়াছে তাহার ভাবী পত্নীর নিকট—"কেস"টা প্রায় কাঁচিয়া আসিয়াছিল।

ভাবী পত্নী বইকি! উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী—তাহার আত্ম-বিশ্বাস এতটুকু টলে নাই। ভুল করিয়াছে বটে, কিন্তু সে ভুল নিজেই শোধরাইবে। অধুনা রণনীতির কত কৌশলই না বাহির হইয়াছে, এবং প্রত্যহ ডেভেলাপ করিতেছে।

নেপোলিয়ানের প্যারিস দখলের কাহিনী পড়িতেছিল সুনীল। নেপোলিয়ান স্বয়ং লিখিয়াছেন, আমি আর্টিলারি, ক্যাভালরি, ইনফ্যান্ট্রি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবার পূর্বে ফিপ্‌থ কলাম বা পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যে অর্ধেকের উপর যুদ্ধ জয় করিয়া রাখিয়াছি—এখন কেবল প্রবেশের অপেক্ষা!—এই ফিপ্‌থ কলাম কথাটিও মহাসেনাপতি নেপোলিয়নের আবিষ্কার। ফিপ্‌থ কলাম বা পঞ্চম বাহিনী লইয়া যুদ্ধ এ যুগে কি উন্নতিই না করিয়াছে! নিঃশব্দে কাজ হাঁসিল করিবার এমন কৌশল আর নাই। কিন্তু পঞ্চম বাহিনী পাওয়াই বা যায় কোথায়?

কলিকাতা শহরে পয়সা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, পঞ্চম বাহিনীরও অভাব হইল না। সন্ধান পাওয়া গেল ললিত দাশগুপ্তের—রেখার আপন মাসতুতো ভাই। সৌম্যদর্শন হাসি-হাসি-মুখ মিশুকে ছোকরাটি, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র—এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার বিভাগের। রেখার সঙ্গে মাঝে মাঝে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিয়া যায়। কখনো কখনো ক্লাসের ভিতরেও আসে। প্রথমটা অন্যরূপ সন্দেহ করিয়া সুনীলের রাগ হইয়াছিল। সুনীল একদিন শুভক্ষণে নির্ধারণ করিল ললিতই উপযুক্ত পঞ্চম-বাহিনী, পঞ্চম বাহিনীর নম্বর ওয়ান সেনা।

টেনিস মাঠে আলাপ পরিচয়। তার পর—পরের পয়সায় কাফে হোটেলে খাইতে কে না ভালবাসে। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে মায়ের হাতের শুক্তো, দই-মাছ। ললিত এক মাসের মধ্যে কেনা গোলাম হইয়া গেল। রিটার্ণ ভিজিটও চলিতে লাগিল। ললিতের দুটি ছোট বোন ও তিনটি ভাই, সুষমা বেথুনে থার্ডইয়ারে পড়ে, মেনকা ম্যাট্রিক ক্লাস। ভাইগুলি সব ইস্কুলের ছাত্র। সুনীল নিজের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই এদের বশ করিল—পঞ্চমবাহিনী প্রতিদিন সংখ্যায় বাড়িতে লাগিল।

কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত কাজের কথা কিছুই পাড়া হয় নাই। সুনীল যায় আসে, সুষমার সঙ্গে ফ্লার্ট করে, মেনকার সঙ্গে করে খুনসুটি। বাচ্চাদের 'আবোল-তাবোল' আর 'কথা ও কাহিনী' মুখস্ত করাইয়া আবৃত্তি

প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেয়। মাসখানেকের মধ্যে মনে হয় সুনীল যেন ঘরের ছেলে। রেখা মাঝে মাঝে আসে মাসীর বাড়ি। তাহার সময়টা সুনীল হিসাব করিয়া লইয়াছিল, সে সময়ে ওদিক মাড়াইত না।

রেখা ছেলেদের কাছে সুনীলদার গল্প শোনে। ভাবে, কে না কে! সুষমার কাছে শোনে প্রশংসা। ইহা লইয়া সুষমাকে সে ঠাট্টা করে। এই সুনীল যে তাদেরই ক্লাসের সুনীল, এ সন্দেহই তার মনে জাগে না। সুনীল আর ললিতকে সে একসঙ্গে কখনো দেখে নাই। সেটা অবশ্য সুনীলেরই সাবধানতার গুণে।

প্রথম জানিল সুষমা। সে খুব হাসিল, বলিল, খুব মজা হবে কিন্তু। রেখাদি এবারে জব্দ হবে। সুনীলই যে প্রসিদ্ধ কবি অদ্বৈত রায়, ইহা জানা অবধি সুষমা রেখার উপর হিংসাই করিয়াছে—রেখাদির ভাগ্য ভাল। সুষমা মেনকাকে তালিম দিল, মন্ত্রগুপ্তির মধ্যে ললিতকেও লওয়া হইল। পঞ্চম বাহিনীর লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল। এইখান পর্যন্ত ভূমিকা। এইবারে আমাদের গল্প আরম্ভ হইল এবং সে গল্পও অতিশয় সংক্ষিপ্ত।

* * * *

সেদিন রবিবার। রেখার নিমন্ত্রণ ছিল মাসীর বাড়িতে, সকালে যাইবে, সেখানেই স্নান খাওয়া দাওয়া করিয়া সমস্ত দিন থাকিয়া সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফিরিবে। পঞ্চম বাহিনী প্রস্তুতই ছিল। চা খাইতে খাইতে এবং সে মাসের 'প্রবাহিনী' পত্রিকাখানা উলটাইতে উলটাইতে ললিত যেন হঠাৎ অদ্বৈত রায়ের কবিতাটি আবিষ্কার করিল। অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল, এত রাবিশও ছাপে এরা!

রেখা বলিল, কি দেখি!

ললিত "প্রবাহিনী"টা দিল। সে জানিত কোনও বিষয়ে কোনও মন্তব্য করিলে রেখা তাহার প্রতিবাদ করিবেই। তাহার অনুমান মিথ্যা হইল না। পড়িয়া রেখা বলিল, কেন, এ তো চমৎকার কবিতা।

চমৎকার না ছাই, মেয়েদের ওই বড় দোষ, কিছু বুঝবে না সুঝবে না, একটা না একটা মত দেওয়াই চাই। কবিতা হয়েছে কোন্‌খানটায় শুনি? তার চাইতে আমাদের সিদ্ধার্থ বসু, চামর সেন, মরণানন্দ দাশগুপ্ত, গৌহাটি-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা ঢের ভাল।—বলিয়া ললিত কয়েকটি কবিতার অংশ আবৃত্তি করিতে লাগিল।

রেখা বিষম রাগিয়া গেল। রাগিয়া গেলে তাহার মুখে খই ফুটিতে থাকে। রাবিশ যদি বলতে হয় তো ওই—মাথা নেই মুণ্ডু নেই কতকগুলো বদহজম শব্দের আর ভাবের খিচুড়ি। তা ছাড়া কবিতা পড়তে পার না, ভাল লাগবে কেন তোমাদের। আমি পড়ছি শোন—

আবৃত্তি-দক্ষতা ছিল রেখার, অতি শিশুকাল হইতে বরাবর আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে সে। এই সেদিনও ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে ভাইসচ্যান্সেলার স্বয়ং গোল্ড মেডাল দিয়াছেন। অদ্বৈত রায়ের কবিতা রেখার কণ্ঠে অপূর্ব শোনাইল। সুনীল কাছাকাছি থাকিলে পাগল হইয়া যাইত। কিন্তু পঞ্চম বাহিনীর কাজ সত্য প্রচার করা নয়, মতলব হাঁসিল করা। সুষমা হইল রেখার দিকে, মেনকা ললিতের দিক লইল। তারপর অনুপস্থিত অদ্বৈত রায়কে লইয়া শুধু হাতাহাতি হইতে বাকি রহিল।

রেখার গোঁ চাপিয়া গেল। দুর্ভাগ্যের বিষয় অদ্বৈত রায়ের কোনও বই বাজারে বাহির হয় নাই। রেখা খুঁজিয়া খুঁজিয়া মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে অদ্বৈত রায়ের যাবতীয় কবিতা সংগ্রহ করিল এবং ললিতকে একদিন শাসাইয়া দিল যে, সে অদ্বৈত রায়ের কবিতার উপরে একটি প্রবন্ধ লিখিতেছে। জেদের বশে অদ্বৈত রায়কে ধরিলেও রেখার নিজেরই কেমন নেশা ধরিতে লাগিল।

দু চার দিন পরেই সুষমা একটি চমকপ্রদ খবর দিল—অদ্বৈত রায় তাহাদের বাড়ি আসিয়াছিল এবং স্বয়ং স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও পাঠ করিয়া দাদাকেও খানিকটা ঘায়েল করিয়া গিয়াছে। বাচ্চাদেরও নিজের কয়েকটি কবিতা শিখাইয়া গিয়াছে, কি চমৎকার আবৃত্তি করিতেছে তাহারা, রেখাদি একদিন গেলে খুশী হইবে।

রেখা পরদিন খুশী হইতে গেল। সত্যই ছেলেদের আবৃত্তি চমৎকার। ললিত অদ্বৈত রায়ের একটি সদ্যরচিত অপ্রকাশিত কবিতা পড়িতেছিল—প্রেমের কবিতা। রেখা ছোঁ মারিয়া পাণ্ডুলিপিটি কাড়িয়া লইল। দু লাইন পড়িয়াই তাহার কেমন যেন মাথা ঘুরিতে লাগিল। প্রেমের কবিতা—প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া লিখিতেছে অদ্বৈত রায়—

"আজিকে পরমক্ষণে আমি ধরেছিনু তব হাত,
তুমি ধরা দিয়েছিলে, বক্ষে বক্ষে বাধে নি সংঘাত ;

ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলেছিল পরিপূর্ণ মিলনের আশা—
সে কি মোহ, সে কি ভ্রান্তি, হে প্রেয়সী, সে কি ভালবাসা ?”

অজ্ঞাত অদ্বৈত রায় তাহার বাস্তব অথবা কল্পিত প্রেয়সীকে ছন্দে গাঁথিয়া যাহা খুশি বলিতে পারে, তাহাতে তাহার কি আসিয়া যায়! কবিতা ভাল কি মন্দ, সেইটাই দেখ। কিন্তু মেয়েদের মনে কেন কি ঘটিয়া যায়, স্বয়ং ভগবানও বলিতে পারেন না। লেখাটা ললিতের হাতে ফিরাইয়া দিয়া রেখা বলিল, এটা কিন্তু কবিতা হয় নি, আর কিছু হতে পারে—

লজ্জায় এবং রাগে তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। এবারে ললিতের প্রতিবাদের পালা। বলিল, কেন, চমৎকার হয়েছে।

ফলে আবার ঝগড়া বাধিয়া যায়। পঞ্চম বাহিনী হিসাবে কবিতা গল্প প্রভৃতি চমৎকার কাজ করে। রেখার মন হইতে অদ্বৈত রায় আর মুছিতে চায় না। সুষমা বলে, জানো রেখাদি, অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে তোমার বিষয়ে আলোচনা হল একদিন, তিনি তোমার মুখে তাঁর নিজের কবিতার আবৃত্তি শুনতে চান। ডাকব তাঁকে একদিন ?

রেখার মনের জ্বালা তখনও যায় নাই, বলিল, দায় পড়েছে আমার। কবিতা শোনাবার লোকের ওঁর অভাব আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

প্রবন্ধ আর অগ্রসর হয় না। অনিশ্চিত অদ্বৈত রায় অপেক্ষা পরিচিত সুনীল রায়কেই যেন বেশী ভাল লাগে। কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ এমন নিরুৎসাহী হইয়া উঠিলেন কেন ? যে আমাকে কিছুদিন আগেই পাইলে বেমালুম গ্রাস করিতে চাহিত, তাহারই এখন আমি আছি কি নাই সে সম্বন্ধে চিন্তা বা আগ্রহ মাত্র নাই—এমন অঘটন ঘটিল কেমন করিয়া! ভাবিতে ভাবিতে রেখার মন সুনীলের প্রতি অত্যন্ত করুণ হইয়া উঠে, একদিন গায়ে পড়িয়াই আলাপ করে। সুনীল পলাইতে পারিলে বাঁচে এমন ভাব দেখায়।

এ-কথা সে-কথার পর রেখা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, আপনি তো এককালে কবিতা লিখতেন, অদ্বৈত রায়ের কবিতা পড়েছেন ?

সুনীল রায় মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে—ধরা পড়িয়া গেলাম নাকি! অত্যন্ত ভাল মানুষের মত বলে, কই, না তো। ভাল লেখেন বুঝি ?

রেখা একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, লিখতেন আগে, আজকাল আর তেমন লেখেন না।

তাই নাকি ?

সুনীলের দিক হইতে এতটুকু উৎসাহ না পাইয়া রেখাও দমিয়া যায়।

পরদিন অদ্বৈত রায়ের একটি নূতন কবিতা পাণ্ডুলিপি আকারে লইয়া সুষমা রেখাদির নিকট উপস্থিত ; আশ্চর্যের বিষয়, রেখা নিজেও তখন গালে হাত দিয়া বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল। সুষমা অবাক। নূতন কবিতাটি পড়িতে পড়িতে রেখার মন আবার কেমন যেন করিয়া উঠিল। কেন ?

অদ্বৈত রায় লিখিয়াছে—

"এ জীবন-জলধির এক পারে তুমি থাক প্রিয়ে,
অন্য পারে থাকি আমি, মাঝখানে তরঙ্গ-বিক্ষোভ,
কভু পাব তোমারে কি আপনার পরিচয় দিয়ে—
চিরদিন দূরে থাকি, চিরদিন রহিব নির্লোভ ?"

একটু হালকা মনে রেখা সুষমাকে একটা খোঁচা দিয়া বলিল, কি রে, তোদের কবির যে দেখছি মতিস্থির নেই। কাল এত মাখামাখি, আবার আজই এত বৈরাগ্য কেন ? আসলে কিন্তু রেখার মন কেমন করিয়া উঠিয়াছিল সুনীলের জন্য। তাহার পূর্বভাব যদি সত্য হয়, সেই শুধু বলিতে পারে—

"এ জীবন-জলধির এক পারে তুমি থাক প্রিয়ে,
অন্য পারে থাকি আমি, মাঝখানে তরঙ্গ-বিক্ষোভ।"

ভদ্রলোক কোথায় থাকে কে জানে! ঘটকের কাছে ঠিকানাটা লইলে হইত।

পঞ্চম বাহিনীর কাজ এদিকে পুরাদমে চলিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেরা, সুষি, মেনি, ললিত, এমন কি রেখার মাসীমা পর্যন্ত অদ্বৈত রায়কে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। বাংলা দেশে যেন দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছে! রেখার এখন এসব ভাল লাগে না। অত বড়লোকের প্রশংসা করিয়া তাহার কাজ নাই, চেনা-শোনা মাঝারি লোকই ভাল।

ললিত একদিন বলিল, কোথাকার বন্যাত্রাণ-সমিতির জন্য তাহারা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ হইতে একটা জলসার আয়োজন করিতেছে, রেখাকেও কিছু অংশ গ্রহণ করিতে হইবে ; একটা গান এবং অদ্বৈত রায়ের কবিতা আবৃত্তি। স্বয়ং অদ্বৈত রায় এই জলসার উদ্বোধন করিবেন এবং স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিবেন।

রেখা বলিল, পারব না আমি তোমাদের অদ্বৈত রায়ের পোঁ ধরতে।

ললিত বিস্মিত, বলিল, তুমি অবাক করলে রেখাদি। এই সেদিন অদ্বৈত রায়ের জন্তে বাড়ি মাথায় করলে, প্রবন্ধ লিখছিলে তার নামে, আর আজ এরই মধ্যে কি হল? শাস্ত্রে যে বলেছে, স্ত্রিয়া—

রেখা ধমক দিয়া উঠিল, বলিল, থামো, খুব ডেঁপো হয়েছ তুমি। কে না কে অদ্বৈত রায়, তার জন্তে—

ললিত বলিল, কে না কে নয় রেখাদি। অদ্বৈত রায়ের কবিতার বই বেরুচ্ছে একসঙ্গে তিনটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটার ভূমিকা লিখেছেন, প্রমথ চৌধুরী একটার, এবং—

কথাটা শেষ না করিয়া ললিত হঠাৎ খুব নরম হইয়া বলিল, জান রেখাদি, অদ্বৈত রায় সুষিকে একটা বই ডেডিকেট করছে। সুষিটা একদিনে ফেমাস হয়ে যাবে।

রেখার অসহ্য বোধ হইল, হিংসাই সম্ভবত। বলিল, ভারী তো! যত সব খোসামুদের পাল্লায় পড়ে ভদ্রলোকের যতটুকু লেখবার ক্ষমতা ছিল, তাও গেল। আমি পারব না অদ্বৈত রায়ের কবিতা আওড়াতে।

ললিত যেন দমিয়া গেল। বলিল, না রেখাদি, সে বড্ড বিশ্রী হবে। আমি কথা দিয়েছি, হ্যাণ্ডবিল-প্রোগ্রামও বোধ হয় ছাপা হয়ে গেল, কাগজে নোটিস চলে গেছে।

রেখা বলিল, আমাকে না জিজ্ঞেস করে এসব করলে কেন? তা বেশ, আমি গান গাইব, আবৃত্তি করব না।

তুমি আবৃত্তি না করলে যে একবারেই জমবে না রেখাদি।

অনেক ধস্তাধস্তির পর স্থির হইল, রেখা নিজের খুশিমত যে কোনও একটা কবিতা আবৃত্তি করিবে। সে মনে মনে একটা মতলব করিল। সুনীলকে দিয়া একটা কবিতা লেখাইয়া সেইটাই সে আবৃত্তি করিবে; অদ্বৈত রায় ছাড়াও যে বাংলা দেশে কবি আছে, এটাই সে আবৃত্তির গুণে প্রমাণ করিয়া দিবে।

সুনীল রায় কিছুতেই স্বীকার করিল না যে, সে কবিতা লিখিতে পারে। অনেক ধরাধরির পর বলিল, আচ্ছা, তাহার একজন কবি-বন্ধুর একটি কবিতা সে আনিয়া দিবে। আবৃত্তির পক্ষে মন্দ হইবে না। রেখা মনে মনে বুঝিল, সুনীল বেনামীতে কাজ সারিতেছে। সে খুশীই হইল।

কবিতা পাওয়া গেল, দেশপ্রেম-বিষয়ক।—আত্মবিস্মৃত জাতি পরাধীনতার

নিগড়ে বন্দী হইয়া অশুভকে শুভ বলিয়া উল্লাস করিতেছে, কিন্তু শুভমুহূর্ত যে কাটিয়া যাইতেছে, সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।—ওজস্বী কবিতা, আবৃত্তি করিবার মত। রেখা আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মহড়া দিতে লাগিল। মহড়া দিতে দিতে তাহার কেবল সুনীলের কথাই মনে হইতেছিল, আর কাহারও প্রেমে পড়িল না কি? ভদ্রলোকের সত্যিই কবিতায় ভাল হাত। কিন্তু সে সম্বন্ধে একটুও সচেতন নয়। রেখা যদি তাহাকে নিজের ইচ্ছামত চালাইতে পারে, তাহা হইলে সুনীলকে দিয়াই অদ্বৈত রায়ের গর্ব সে খর্ব করিতে পারে। এই কথাটা ভাবিতেই রেখার কেমন যেন অদ্ভুত বোধ হইতে লাগিল। একটা অপূর্ব অনুভূতি; একজন তাহার একান্ত আপনার, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই কবিতা লিখিতেছে সে, কি চমৎকার!

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট লোকে লোকারণ্য। কলিকাতা শহরের গণ্যমান্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সকলেই উপস্থিত, মেয়েরাও সংখ্যায় কম নয়। রেখা যদিও বহু মঞ্চেই ইতিপূর্বে অভিনয় করিয়া রঙ্গমঞ্চ-স্বাধীন হইয়াছে, তবুও তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল, কপালে ঘাম দেখা দিল। প্রোগ্রামে যাহারা ছিল, তাহারা সকলেই সাজঘরে সমবেত হইয়াছে, সুষি আছে, মেনি আছে, মাসীর ছোট ছেলেরাও আছে। ললিত বিদ্যুতের মত এক একবার খেলিয়া যাইতেছে। ড্রপ ফেলা আছে। প্রথমেই একটু সভার মত হইবে, সভাপতিত্ব করিবেন শ্যামাপ্রসাদ, তারপর রেখার উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং তারও পরে কবি অদ্বৈত রায় উদ্বোধন করিবেন—প্রোগ্রামে এরূপ লেখা ছিল। একে একে সকলেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অনেক প্রধান ব্যক্তিকেই রেখা চেনে; সে আন্দাজে অদ্বৈত রায়কে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কেহই মনোমত হইল না।

কিন্তু সুনীল কোথায়? দূরে চকিতে তাহাকে একবার দেখা গেল; রেখার সহিত চোখোচোখি হইতেই একটু হাসির রেখা যেন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সুনীল যে এতো "শাই" তাহা গোড়ার দিকে তাহার ব্যবহারে বোঝা যায় নাই। মানুষ একটা আশ্চর্য পদার্থই বটে!

ড্রপ উঠিল, কিন্তু অদ্বৈত রায় কোথায়? সুনীল আসিয়া মঞ্চের এক পাশে উইংসের আড়ালে দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাইতেছে। শ্যামাপ্রসাদবাবু উঠিতেই প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ হইয়া গেল—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জলদগম্ভীর স্বর ধাপে ধাপে উঠিতে লাগিল। এর

পরই রেখার ডাক পড়িবে। রেখা কিন্তু তখনও অন্যমনস্ক—সে অদ্বৈত রায়কে খুঁজিতেছে।

"শ্রীমতী রেখা সেন এবারে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবেন"—চকিত হইয়া উঠিল রেখা, সুনীলের দিকেই তাহার চোখ পড়িল। রেখা অনুভব করিল, সুনীল প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। সে ধীর পদে অর্গানের সম্মুখে বসিল এবং আবিষ্টের মত গান গাহিয়া গেল। যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, অবিশ্রান্ত করতালিধ্বনির মধ্যে রেখা শুনিতে পাইল, "এবারে কবি অদ্বৈত রায় আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন।"

কোথায় অদ্বৈত রায়? সুনীল ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করিতেছে, তাহার দৃষ্টি তাহারই দিকে। অদ্ভুত তো! রেখা এমনই বিস্মিত হইয়াছিল যে, উঠিয়া উইংসের আড়ালে যাইতে তাহার ভুল হইয়া গেল। সভাপতির কানে কানে ললিত আসিয়া কি বলিল, সভাপতি পুনরায় বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন, "আর একটি কথা, আপনারা অনেকেই জানেন, অদ্বৈত রায় এঁর ছদ্মনাম, এঁর আসল নাম—শ্রীমান সুনীল রায়, আমাদের ইউনিভারসিটিরই পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগের ছাত্র।" চটপট করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর হইয়া উঠিল। রেখার সম্মুখে সমস্ত ইনস্টিটিউট হলটি যেন দুলিয়া উঠিল এবং তাহার দৃষ্টি একটি বিন্দুতে গিয়া স্থির হইল। অদ্বৈত রায়!

সুনীল ততক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি বলিতেছে রেখা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, সে জনমানবশূন্য এক দ্বীপে একা অসহায় ভাবে পড়িয়া আছে। বুকে একটা দারুণ বেদনা বোধ হইল। চোখের কোণে জলও আসিয়া পড়িল। সে কোনও রকমে উঠিয়া উদ্গত অশ্রু চাপিতে চাপিতে মঞ্চের বাহিরে চলিয়া গেল। এ ব্যাপার সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার মনে হইল সমস্ত পৃথিবী তাহাকে ঠকাইয়াছে। মনে হইল পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই। সে একা, একা—নিতান্ত একা।

প্রোগ্রামের আর তিন চারটি আইটেমের পরেই তাহার আবৃত্তি। সে কথা আর তাহার মনে রহিল না। সে সকলের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে বারান্দায় নামিয়া একেবারে গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনীলের বক্তৃতা চলিতেছে—সুখী-মেনিও রেখাকে লক্ষ্য করিল না। ললিতও নয়।

লক্ষ্য করিল শুধু সুনীল। বক্তৃতা দিতে দিতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল,

ক্রোধে-বিস্ময়ে কম্পান্বিতা রেখা বারান্দা পার হইয়া যাইতেছে। সর্বনাশ! বক্তৃতায় তাহার বলিবার অনেক কিছুই ছিল কিন্তু আর নয়। বক্তব্যকে অকস্মাৎ সংক্ষেপ করিয়া সে তাহার সহপাঠীদের সমবেত জয়ধ্বনি উপেক্ষা করিয়া দ্রুত স্টেজ হইতে বাহির হইয়া গেল। সভাপতি পর্যন্ত একটু অবাক হইলেন। ললিতও চকিত হইয়া স্নীলের পিছু লইল।

বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস রেখার উত্তপ্ত কপালে যেন মায়ের স্পর্শ বুলাইয়া দিল; একটা অস্বস্তিকর মুহ্যমান অবস্থার মধ্যে ভারি আরাম বোধ হইল তার। সে ধীরে ধীরে গোলদীঘিতে প্রবেশ করিয়া পুব দিকের একটা নিরালা বেঞ্চে গিয়া বসিয়া পড়িল। কলিকাতায় তখনো ব্ল্যাকআউট আরম্ভ হয় নাই। চারিধারের বাড়িগুলি হইতে উজ্জ্বল আলোকের প্রতিবিম্ব গোলদীঘির জলে কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিতেছিল। দীঘির শীতল জলে স্নান করিতে পারিলে ভাল হইত।

কি প্রয়োজন ছিল স্নীলের এভাবে তাহাকে প্রতারিত করার! কি অপরাধ করিয়াছিল সে! সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের কাছে সে বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে নাই। অন্যায় করিয়াছিল কি? পরিচয় হইলেই মানুষ মানুষকে ভালবাসে। তখন আর রূপ-গুণের প্রশ্ন মনে জাগে না। কানা-খোঁড়া কালা-ধলার কথাই উঠে না। কিন্তু বলা নাই কহা নাই, তুমি আমার দিকে চাহিলে আর আমি তোমার গলায় মালা পরাইয়া দিলাম—এমন কাপুরুষের মনোবৃত্তিই বা তোমার হইবে কেন? ছিঃ ছিঃ! রেখার মনে হইল, পৃথিবী-শুদ্ধ লোক ইহা লইয়া হাসাহাসি করিতেছে; সে আর কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না। সেই চঞ্চল আলো-অন্ধকারের মধ্যে রেখার কান্না পাইল। সংহত হইবার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার গাল বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কে পিছন হইতে তাহার কাঁধে হাত দিয়াছে। ভীতত্রস্ত হইয়া মুখ ফিরাইতেই রেখা দেখিতে পাইল, স্নীল সন্তর্পণে তাহার কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কাঁধটা সরাইতে গেল। স্নীল কাতরভাবে বলিল, আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে রেখা। আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে ছাড়া আমার চলত না, তাই—

তাই আমায় এমন অপমান করলেন আপনি! কি দোষ করেছিলাম আমি?

তোমার দোষ নয় রেখা, আমিই ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করছিলাম। যে আমার সর্বস্ব, তাকে অপমান করবার কল্পনাও আমার মনে আসে নি। আর কোনও উপায় আমি খুঁজে পেলাম না যে।

কিন্তু স্ত্রীজাতি মরিতে মরিতেও স্ত্রীস্বভাব ছাড়িতে পারে না। রেখা অশ্রু-সজল চক্ষে একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিল, হ্যাঁ, সর্বস্ব বইকি! "আজিকে পরম-ক্ষণে আমি ধরেছিনু তব হাত"—তবে কে? "ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলেছিল" কার সঙ্গে?

এবারে সুনীল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ও, এই—তা ও তো কবিতা নয়, পঞ্চম বাহিনীর সৈন্য! ওদের সাহায্যেই তো আমি তোমাকে পেলাম।

রেখা বাধা দিয়া বলিল, হ্যাঁ, পেলে বইকি! কক্ষনো না।

পিছন হইতে ললিত চীৎকার করিয়া উঠিল, ঝগড়াটা পরে করো রেখাদি, এখন আমাদের প্রোগ্রাম ভেস্তে যায়। এস শীগগির।

১৩৪৯

এক আনার ডাক-টিকিট

পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ঠিকমত হয় নাই, স্বীকার করিতেছি, তবু উদ্বাহকালে সহধর্মিণীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে যে গুরুতর একটা কিছু প্রতিশ্রুতি দিতেছি, তাহা বুঝিয়াছিলাম। সাত বৎসরের অবিশ্রাম ব্যবহারে সেই সুবৃহৎ প্রতিজ্ঞাটি ক্ষইয়া ক্ষইয়া কি ভাবে এক আনার ডাক-টিকিটে পর্যবসিত হইয়াছিল, আমার এই গল্পটি তাহারই ইতিহাস। তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে, গল্পটি কেবলমাত্র আইবুড়ো ছেলে এবং মেয়েদের জন্য (যাহাদের 'কখনও বিবাহ করিব না' প্রতিজ্ঞা চিরদিন অটল থাকিবে বলিয়া এখনও বিশ্বাস আছে) লিখিত, বিবাহকামী অনূঢ়া ও প্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা মহিলারা যেন গল্পটি পাঠ না করেন, তাহাতে অকারণ অনেক দুঃখের হাত হইতে তাঁহারা রক্ষা পাইবেন। বিরহকালের পত্রে বর্ণিত স্বামীদের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহারা মনে মনে যে গর্ব ও সুখানুভব করিয়া থাকেন, এই অধম লেখকের তাহা নষ্ট করিতে বাসনা নাই। তবু নেহাত গল্প যখন একটা লিখিতেই হইবে এবং হাতের কাছে তেমন সুরসাল কোনও প্লট দেখিতেছি না (একটা বিদেশী গল্পের বই, কি ম্যাগাজিনও ছাই কাছে নাই যে মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিয়া প্লট চুরি করিয়া বাহবা লইব, বিদ্যাটা অবশ্য এখনও তেমন জুতমত আয়ত্ত করিতে পারি নাই)—তখন অগত্যা বিবাহিত পুরুষ-জীবনের একটা গূঢ় রহস্যই না হয় উদ্ঘাটন করিয়া ফেলি, আর কিছু না হউক, গল্পচ্ছলে সত্য-প্রচারের পুণ্যটাও অর্জন করা হইবে। বিবাহিত পুরুষদের কাছে আমার এই গল্পের কোন মূল্য তো নাই-ই, সময়ের যৎকিঞ্চিৎ অপব্যবহার করিয়া গল্প পড়িয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, ইহা তাঁহাদেরও বিবাহিত জীবনের একটা সত্য ইতিবৃত্তমাত্র। তাঁহাদের নিকট লেখকের নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন, অ্যাপ্রুভার হইয়া আত্মরক্ষা করা আমার কল্পনাতেও ছিল না। নেহাত বেগতিকে পড়িয়া এই অপ্রিয় কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আষাঢ় মাসে বিবাহ হইয়াছিল, শ্রাবণের মাঝামাঝি প্রেয়সী পিত্রালয়ে যাইবেন। অল্প কয়েকদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া তাঁহার কিশোর চিত্ত পাড়ার বোকা ঠাকুরঝিদের এবং বুদ্ধিমান ঠাকুরপোদের কাছ হইতে এমন

কয়েকটি সংবাদ আহরণ করিয়াছিল, যাহা আমার পক্ষে মানহানিকর। শ্রাবণের প্রাবৃটজালে একদা যখন মধ্য-রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে, আকাশের তারারাজি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণে বাতায়নপার্শ্বস্থ তরুশির চকিতে উদ্ভাসিত হইয়া নিবিড়তর তমিস্রায় বিলীন হইতেছে, বজ্রনিনাদে আতঙ্কিত প্রেয়সী সদ্য-বিবাহের লজ্জার মাথা খাইয়া কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ হইয়া পাশে শয়ন করিয়াছেন, প্রেয়সীর ঠাকুরঝিদের আড়ি-পাতনের প্রবৃত্তি পর্যন্ত তিরোহিত হইয়াছে এবং একটানা দর্দুর-কাকলীতে বৈষ্ণব-কবিদের আঙুরের মত টসটসে পদগুলি মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলিতে শুরু করিয়াছে, হঠাৎ প্রশ্ন করিলাম, সরি, (আমার সহধর্মিণীর নাম সরমা) সেখানে গিয়ে আমাকে মনে থাকবে তো ?

কোনও জবাব নাই। মেঘাবৃত শ্রাবণ-নিশীথে জবাব-না-দেওয়া প্রেয়সীর বর্ণনা কোন কাব্যে নাই, একটু আহত হইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, ঘুমুলে নাকি ?

প্রেয়সী তবুও নিরুত্তর। হঠাৎ বিদ্যুতালোকে দেখিলাম, সরমার দৃষ্টি আয়ত, কিন্তু চোখে জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মত সন্দেহনিরসনার্থ 'বিদ্যুৎ আর একবার' বলিতে ইচ্ছা হইল না, বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, সরি, তুমি কাঁদছ ? অন্নুর জন্যে মন কেমন করছে ?—অন্নু সরমার ছোট ভাই।

জবাব পাইলাম না বটে, কিন্তু অনুভবে বুঝিলাম, প্রেয়সী ও আমার মধ্যের ব্যবধান কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল। হাল ছাড়িয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িব কি না ভাবিতেছি, হঠাৎ প্রেয়সীর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ নিশীথ-নীরবতা ভঙ্গ করিল।

এই বুঝি তুমি আমাকে ভালবাস ? তবে যে সবাই বললে, ও-বাড়ির প্রতিভার সঙ্গে—

স্মরণ হইল, স্ত্রীলোকের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছি। রাগ যে হয় নাই, তাহা নহে। সদ্যবিবাহিতা পত্নীর মুখ হইতে এরূপ অপবাদ শুনিব, ইহা আমার সুদূরবর্তী কল্পনাতেও ছিল না। একবার ইচ্ছা হইল বলি, কন্যে, একদা সুতহিবুকযোগে তোমাকে বিশেষরূপে বহন করিব এই পণবদ্ধ হইয়াছি বলিয়া বিবাহের পূর্বজীবনও যে তোমাকে উইল করিয়া দিয়াছি, এরূপ মনে করিও না। কিন্তু আকাশে মেঘ থমথম করিতেছিল এবং রাত্রি ছিল অন্ধকার। প্রেয়সীকে বাহুপাশে বাঁধিয়া কাছে টানিয়া বলিলাম, পাগলী, কে

দুষ্টুমি করে তোমাকে রাগাবার জন্যে এসব কথা বলেছে, ওই কালকিসিন্দে নেড়ীটার সঙ্গে আমি—! ছিঃ, তুমি এ কথা বিশ্বাস করতে পারলে?

বুঝিলাম, বিশ্বাস শিথিল হইতেছে, ব্যবধান কমিতেছে।

কেন, মেজদিও তো বললেন, তোমাদের বিয়ের সব ঠিক হয়েছিল। তোমাকে দেখলে প্রতিভা ঘোমটা—

হাসিয়া বলিলাম, সরি, আজাপুরের চৌধুরীদের মেজোছেলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয় নি? রামজীবনপুরের মেলায় তাকে দেখে তুমি জিব কাটো নি? তবে কি তুমি—

য্যাঃ।

মুখখানা বুকের কাছাকাছি আসিল। বলিলাম, মেজদি হচ্ছেন একজন গেজেট, মিথ্যের চুপড়ি, ওঁর কোন কথা বিশ্বাস করো না। করলেই ঠকবে।

বাস্, গোলমাল চুকিয়া গেল। কিন্তু আসলে মেজদি মিথ্যা বলেন নাই। প্রতিভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী ঘনিষ্ঠই হইয়াছিল। কিন্তু সে ইতিহাস আমার বিবাহিতা পত্নীর পক্ষে সত্য নয়।

এই হইল শুরু। তখনও কুড়ি দিন বিবাহ হয় নাই।

সরমার বাবা বড় ডাক্তার। একদা কোন বেকার মুহূর্তে তিনি কন্যার নিকট ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে কোনও গবেষণামূলক কথা বলিয়া থাকিবেন। পিত্রালয়-প্রত্যাবৃত্ত প্রেয়সীর দ্বিতীয় চিঠিতেই প্রথম জানিতে পারিলাম যে, সিগারেট খাইলে নির্ঘাত যক্ষ্মারোগ হয়। সুতরাং সিগারেট খাওয়া আমাকে ছাড়িতে হইবে। এজন্য সে তাহার নিজের মস্তকসংক্রান্ত একটা দিব্য দিয়া বসিয়াছিল। এগারো বৎসর বয়সে ইস্কুল পলাইয়া নতুন পুকুরের বাঁশ-ঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়া বিড়ি খাইতে শিখিয়াছিলাম, চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রেয়সীর মাথা সম্বন্ধে এমন মমতা হইবার কথা নয় যে, সে অভ্যাস চট করিয়া ছাড়িয়া দিব। সুতরাং ফেরত ডাকে দিব্য মানিয়া লইয়া লিখিলাম যে, বহুকালের অভ্যাস ছাড়িয়া খুব কষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু যাহাকে ভালবাসি তাহার কথা রাখার জন্য সে কষ্ট সহিয়াও সুখ আছে। দিব্য বজায় রহিল এবং আমিও এদিকে দিব্য সিগারেট খাইতে লাগিলাম।

এই হইল দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি-পালন। গোড়ার কয়েকটাই মনে আছে, কিন্তু তারপর এত অধিক বার এই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছি যে, স্মৃতিশক্তি ভারাক্রান্ত হওয়াতে অনেক কিছুই আর স্মরণে নাই।

সেবার ভাদ্র মাসের গুমট গরমে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত, এক দিনের বেশী দুই দিন এক জামা গায়ে দেওয়া অসম্ভব, আকাশ বাতাস ও মাটি শুকাইয়া খটখট করিতেছে, প্রেয়সীকে বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া লিখিলাম—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

সরমা, দরদী কবির এই অপরূপ শ্লোকটি আজ বারবার আমার মনে জাগছে। বর্ষাশেষের ধারাবর্ষণে আজ চারিদিক পরিপূর্ণ, আমার বুকই শূন্য শুধু। তাই এই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কবির সুরে সুর মিলিয়ে তোমাকে স্মরণ করে গাইছি—

শূন্য মন্দির মোর।

সরি, আমার সমস্ত মন উদাস হয়ে গেছে, কোনও কাজে মন বসছে না। জানলার ধারে চুপচাপ বাইরের বহুরূপী আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছি। ঘরের বার হতে ইচ্ছে করে না। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, আমার মনের এই অবস্থার কথা বুঝবে না। হয়তো হৈ-চৈ হট্টগোল করে তাস খেলে তোমার দিন ভালই কাটছে—আমার দুঃখ জানিয়ে তোমার হালকা মনকে মুহূর্তের জন্যও ভারাক্রান্ত করতে ইচ্ছে করে না। তবু কেন জানি না, আজ বারবার মনে হচ্ছে—

শূন্য মন্দির মোর।"

চিঠিটা ভজার হাতে ডাক-বাক্সে ফেলিতে পাঠাইয়া বউদির নিকট এক কৌটা পান ও নিজের ড্রয়ার হইতে সিগারেটের টিনটা সংগ্রহ করিয়া তখনই যে দত্তবাড়ির বৈঠকখানায় কর্ণার্জুনের রিহার্সাল দিতে ছুটিয়াছিলাম, সহধর্মিণীকে তাহা জানাইবার কি কোনও আবশ্যকতা ছিল? না, তাহা করিলেই বিবাহের মন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা হইত?

তারপর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। আজ কিশোরী প্রেয়সী 'ফুল-ফ্লেজেড' গৃহিণী-পদে প্রমোশন পাইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার অঙ্কে একটি শিশু-চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া যে, বিবাহের প্রারম্ভে কথাবার্তায় এবং চিঠিপত্রে নানা মিথ্যাচারের আশ্রয় লইয়াছিলাম বলিয়াই জীবন আজ সহজ সরল অনাবিল শান্তিপূর্ণ। ছোট

ছোট মিথ্যার সাহায্যেই অপরিচিতা পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, পরিচয় প্রেমে পর্যবসিত হইয়াছে। যদি একটি দিনের তরেও সহধর্মিণীর সহিত ধর্মাচরণের চেষ্টা করিয়া নিছক সত্যের পূজা করিতাম, তাহা হইলে প্রেয়সীর মুখাকাশের কালো মেঘ আজিও অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিত, সংসারধর্ম পালনের ইচ্ছা বহুদিন বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাস লইয়া পণ্ডিচারী আশ্রমে পলাইয়া বাঁচিতে হইত। ভাবিতে ইচ্ছা হয় না বটে, কিন্তু এ কথাও কখনও কখনও চকিতে মনে হইয়াছে যে, আমার মত আমার প্রেয়সীকেও হয়তো আমার মুখ চাহিয়া অনেক মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। হয়তো কোনদিন তাঁহার শরীরের এমন অবস্থা যে, শয্যা-আশ্রয় না করিলেই শরীরধর্মের অবমাননা করা হয়, অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, নিয়মিত যত্নসহকারে বৈকালিক আহার্য প্রস্তুত, প্রেয়সী পাশে বসিয়া নিত্যকার মত পাখার বাতাস করিতে করিতে সহজ সুরে গল্প করিতেছেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক দেখাইতেছে কেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে সেই চিরপরিচিত জবাব—তোমার যত বাড়াবাড়ি, তুমি রোজই আমার শরীর খারাপ দেখছ। কিন্তু মশাই, নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখা হয় কি? গলার হাড় বেরোচ্ছে যে! মাসকাবারি টাকা না পাইয়া মুদী হয়তো প্রাতে তাঁহাকে কিছু কড়া কথা শুনাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার মুখ চাহিয়া তিনি নির্বিবাদে তাহা হজম করিয়াছেন, আমাকে বিন্দুবিসর্গও জানিতে দেন নাই। মন্ত্র যাহাই বলুক, এখন দেখিতেছি মিথ্যাটাই সংসারধর্ম-পালনের মূল কথা।

পরস্পরের কাছে কিছু গোপন রাখিব না, বিবাহ-রাত্রে এরূপ ধরনের কি একটা মন্ত্র আওড়াইতে হয় শুনিয়াছি। এই মন্ত্রটি বিবাহ-জীবনের সহজ বিকাশের যে কত বড় প্রতিবন্ধক, তাহা বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। আমার পত্নীকে এ কথা জ্ঞাপন করিয়া কি কোনও লাভ আছে যে, আমারই কারণে পাশের বাড়ির কোনও মেয়ের ঘন ঘন ফিট হয়, সংসার অচল হইলে কোনও বন্ধুপত্নী গোপনে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। এমন যদি হয় যে, আমার প্রেয়সীর প্রেমে পড়িয়া বাঁড়ুজ্জেদের ননীগোপাল আজীবন কৌমার্যব্রতই গ্রহণ করিল, নিরুপায় প্রেয়সী তাহার মন ফিরাইতে পারিলেন না—কথাটার মধ্যে অন্যায় হয়তো কিছু নাই, কিন্তু এরূপ কথা স্ত্রীর মুখে শুনিলে কোনও সুস্থ সবল স্বামী নিখিলেশের মত কাব্য করিয়া 'তোমাকে ছুটি দিলাম' বলিয়া এমিয়েলের জার্নাল খুলিয়া বসিবে না। ইহা অবগত হইয়া

প্রেয়সী যদি সে সংবাদ চাপিয়া যান, তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে? আসলে আমি গল্প লিখিতেছি না, আমার মনে একটা সমস্যা জাগিয়াছে, পাঠকসাধারণের নিকট তাহাই উপস্থাপিত করিতেছি।

সমস্যা বলিতে আর একটা কথা মনে পড়িল, সরমা একবার তাহার মাসতুতো বোনের বিবাহে ধানবাদ গিয়াছিল; কথা ছিল, সে মাস ছয়েক সেখানে থাকিয়া শরীরটা একটু চাঙ্গা করিয়া আসিবে। তখন আমি কলিকাতায় চাকুরি লইয়াছি এবং তালতলা লেনে বাসা বাঁধিয়া নিরুপদ্রবে বাস করিতেছি। রাজভোগের মত রসভরা ভারী ভারী চিঠিপত্র লেখা চলিতেছে, মনে কবিতার বান ডাকিয়াছে, দুই-একটি পত্র কবিতাতেও লিখিয়াছিলাম। একটার একটুখানি মনে আছে—

"তুমি এখন ধানবাদে,
বিরহেতে প্রাণ কাঁদে,
ব'সে ঘরের হাফ-ছাদে
        চোখ রাখি দূর জান্‌লাতে
শুনি পাশের বাড়ির মেয়ে
বেসুরো গান যাচ্ছে গেয়ে,
আমার পানে কভু চেয়ে
        গুছায় কাপড় আল্‌নাতে;
সেদিক থেকে ফিরাই আঁখি,
তোমার তরে ব্যাকুল থাকি—
মনে কতই ছবি আঁকি—
        জেগেই দেখি স্বপ্ন যে,
তুমি এখন ছাঁদনাতলায়
ব্যস্ত যে কার কর্ণমলায়—
গানের লহর খেলছে গলায়—
        ভেবেই শুধু মন মজে···"

কিন্তু মানুষের মন এক অদ্ভুত পদার্থ। কি করিতে কি হইল, বলিতে পারি না, একদিন সেই দূরের জানালার মেয়েটিকেই বেশ লাগিল। তারপর

চোখাচোখি, পরিচয়—কিন্তু সে স্বতন্ত্র ইতিহাস। তারও পরে, পরিচয় জমাট বাঁধিয়াছে, অবস্থা উপহার-বিনিময় পর্যন্ত গড়াইয়াছে এবং নিতান্ত বেকুবি করিয়া সেই নায়িকা সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়া মাসিকে ছাপাইয়াও দিয়াছি। একদিন প্রাতে দেখিলাম, বলা নাই, কহা নাই, প্রেয়সী আসিয়া হাজির আমার এক বেকার শ্যালককে সঙ্গে করিয়া। একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। জানালার নায়িকা-মূর্তি গভীর ঔৎসুক্যের সহিত আমার পত্নীকে দেখিতে লাগিল, আমি দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলাম। শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, হঠাৎ এলে যে! একটা খবরও তো দিতে হয়! পত্নী হাসিমুখে গায়ের আলোয়ানখানা খুলিয়া বিছানার উপর রাখিয়া ভাঁজ করিতে করিতে বলিলেন, নিজের বাড়িতে আসব তার জন্যে কি আবার 'টুর-প্রোগ্রাম' ছাপতে হবে নাকি? আহা, কি চেহারা বেরিয়েছে তোমার! বিরহের জ্বালায় খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

কথাটা সহজ স্বরে বলা, না, ভিতরে কোনও তীব্র পরিহাস ছিল বুঝিতে পারিলাম না। হায় রে, প্রেমটা প্রায় দানা বাঁধিয়া আসিয়াছিল, এমন সময়—

প্রেয়সী অত্যন্ত সহজভাবে সংসারের ভার স্কন্ধে লইয়া যেন আজীবন সেখানেই বাস করিতেছেন, এরূপভাবে চলিতে লাগিলেন। কোনও বিষয়ে একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিলেন না। একদিন হঠাৎ বলিলেন, অমুক গল্পটার সবাই প্রশংসা করেছিল, ললিতবাবুর সেই ব্যাপারটা লিখেছ বুঝি? আহা বেচারা!

এমন 'কোল্ড ব্লাডে' খুন করিতে মেয়েরাই পারে। ইহার পরই তিনি বলিলেন, শ্যামবাবুর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তোমার যে আলাপ হয়েছে তা আমাকে বল নি তো! আজ দুপুরে এসে তাঁরা তোমার কত প্রশংসা করে গেলেন। মাধুরী মেয়েটি বেশ। আমার কাছে রোজ গান শিখতে আসবে বলছিল। কি বল, আসতে বলব? পাংশু মুখে রক্ত আনিবার জন্য ধোপার হিসাবের খাতাটা লইয়া বসিলাম। বহু কষ্টে বলিলাম, তোমার কি সময় হবে?

তা আর হবে না? আমার আবার কাজ কি? খাচ্ছি দাচ্ছি, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছি। তবু পুরনো গানগুলো ঝালিয়ে নেওয়া হবে। সব ভুলে মেরে দিচ্ছি যে।

মাধুরী গান শিখিতে আসিতে লাগিল, কিন্তু আমার ও তাহার সম্পর্কে একটা সুবৃহৎ দাঁড়ি পড়িয়া গেল।

ব্যাপারটা যত সহজে চুকিল ভাবিলাম আসলে তত সহজে চুকে নাই। পরে সমস্তটা জানিয়া যুগপৎ লজ্জিত ও আনন্দিত হইয়াছিলাম। প্রেয়সী মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া নারীসুলভ ক্রোধে যদি সেদিন কোন 'সিন' করিয়া বসিতেন, তাহা হইলে আজও হয়তো গোপনে মাধুরীর নামে কবিতা লিখিতে থাকিতাম।

ব্যাপারটা হইয়াছিল এই, মনিহারী দোকানে প্রেয়সীর ফর্দমত চাকরে গিয়া জিনিস লইয়া আসিত, আমিও কালেভদ্রে এটা-সেটা আনাইতাম। দোকানী মাসের শেষে তাঁহার নামেই ডাকে বিল পাঠাইত। প্রিয়ার অনুপস্থিতিতে আমি যে সকল দ্রব্য খরিদ করিয়াছিলাম, নিয়মমত তাহার ফর্দ ও বিল প্রেয়সীর নামেই আসিয়াছিল, খেয়াল না করিয়া আমি তাহা রিডাইরেক্ট করিয়াছিলাম। গল্প পড়িয়াও তিনি যাহা বুঝিতে পারেন নাই, দোকানের ফর্দ দেখিয়া তাহাই তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল। বাড়িতে কখনও নারিকেল ছাড়া অন্য কোনও তেল আসিত না, মাধুরীর নির্দেশমত অন্য কি একটা সুগন্ধি তেলের নাম ফর্দে করা হইয়াছে, ইহা ছাড়াও আরও দুই-একটা কি অস্বাভাবিক জিনিসের দাম ফর্দে ধরা ছিল। বাস্, আর কোনও প্রশ্নের প্রয়োজন হয় নাই। প্রেয়সী বুঝিতে পারিলেন, একটা গোলযোগ ঘটিতেছে, সুতরাং অবিলম্বে তিনি কলিকাতায় দর্শন দিলেন, এবং আমার বুদ্ধিমান চাকর ও হিতৈষী পাড়াপ্রতিবেশীরা সংবাদ গোপন রাখিবার আবশ্যকতা অনুভব না করাতে তিনি অচিরাৎ অ-নারিকেল তৈলরহস্য আবিষ্কারে সক্ষম হইলেন।

তাই বলিতেছিলাম, একেবারে খাপ-খোলা তরবারির মত সত্য লইয়া কারবার করিলে পৃথিবীতে বাস করা কঠিন, রক্তপাত অনিবার্য। সেই তরবারিকেই খাপে ঢাকিয়া প্রয়োজনমত কৌশলে যাহারা ব্যবহার করিতে পারে, তাহারাই শান্তিতে রাজত্ব করিতে থাকে।

তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জীবনস্রোতকে একটা বাঁধা খাতে প্রবাহিত করাইয়াছি, বর্ষার জল সেই খাতে ঢুকিয়া মাঝে মাঝে যে কূল ছাপাইয়া দেয় নাই তাহা নহে, কিন্তু যথাসময়ে জল নামিয়া গিয়াছে, সেই চিরন্তন খাতেই জীবনের স্রোত একটানা বহিয়া চলিয়াছে। ইহাই

হইল আমাদের জীবন, সুন্দরও বলা যায়, আবার কুৎসিতও বলা যায়—যে যেভাবে গ্রহণ করে।

বয়স যত বাড়িতেছে, প্রেয়সীর প্রতি প্রেমও তত গাঢ় হইতেছে, প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষই নিজেদের এলিক্সির অফ লাইফের একটা বাঁধা ফর্মুলা আবিষ্কার করিয়া নির্বিবাদে কালাতিপাত করিতেছে। আমারও ফর্মুলা আমি পাইয়াছি। কিন্তু সেটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া কি ঠিক হইবে? গল্প লিখিবার উদ্দেশ্য অর্বাচীনকে শিক্ষা দেওয়া। সেই কাজের ভার যখন লইয়াছি, তখন গোপন করিব না।

প্রারম্ভে যেমনই হউক, বয়সে একটু পাক ধরিলেই প্রত্যেক বিবাহিত-বিবাহিতার জীবন দুইটি ভাগে ভাগ হইয়া যায়, এক—পরস্পর যখন কাছে থাকে—

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে—

দুই—বিরহের অবস্থা।

প্রথম অবস্থা, পাত্রভেদে বিভিন্ন হইতে পারে, কোনও স্বামী দশটায় খাইয়া আপিস যায়, সাড়ে পাঁচটায় ফিরিয়া স্ত্রীর সযত্নরক্ষিত গাড়ু-গামছার সাহায্যে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, আবার রাত্রি আটটা-নয়টার সময় বাড়ি ফিরিয়া যেমন জোটে আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ও মাসিকের পাতা উলটাইতে উলটাইতে ঘুমাইয়া পড়ে। সাধ্বী পত্নী স্বামীর পাতে আহার করিয়া পরের দিন ভোরের রান্নার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া হাতপাখা লইয়া স্বামীকে ব্যজন করিতে করিতে সংসারের প্রয়োজনীয় দুই-চারিটি কথা এবং ক্বচিৎ-কদাচিৎ মুখুজ্জে বাড়ির বউয়ের নূতন গলার হার কিংবা আর কাহারও জামার ছিটের বর্ণনা দিতে দিতে স্বামীর পাশে শুইয়া পড়ে। হাতের পাখা ক্রমশ ভারী হইয়া আসিতে থাকে। পরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কোন স্বামীর জীবনে আহার্য ও আরামই বড় হইয়া উঠে, স্ত্রীর অন্য কোনও বিশেষ সত্তা নাই, ভাল আহার ও ভাল শয়নের ব্যবস্থা করিলেই স্বামী সন্তুষ্ট। লাউয়ের তরকারিতে নুন বেশী হইলেই কিংবা বুটের ডালটা ধরিয়া গেলেই এই সকল স্বামী স্ত্রীর কর্তব্যহানির অনুযোগ করিয়া থাকে। প্রভাতে উঠিয়া গরম চায়ের সহিত ফুলকো লুচি ও কুমড়োর ছোকা পরিপাটি

করিয়া আহার করিয়া ইহারা নিজেরাই বাজার করিতে ছোটে। বাজার করাটাই ইহাদের বিলাস। সস্তায় ভাল মাছ আনিতে পারিলে ইহারা যে আনন্দ পায়, ভাল একটি কবিতা লিখিয়াও কবিরা সেরূপ আনন্দ পান না। কোথায় ভাল পাঁপর পাওয়া যায়, কোথায় পাঁঠার মাংস কচি, গঙ্গার ইলিশ কিনিতে হইলে কোন্ বাজারে যাওয়া দরকার, ইহারা সে খবর ভাল করিয়াই রাখিয়া থাকে। রান্নাঘরের ভিতর দিয়াই স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম গাঢ় হইতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা যে হয় না তাহা নয়, হয়তো মুখামুখি বসিয়াও থাকে—স্বামী বলে, মেসের বাবুদের জ্বালায় কি কিছু কেনবার জো আছে! আজ পাকা পোনামাছের দরটা এক টাকা দু আনায় নামিয়েছিলাম, মেসের এক নবাব-পুত্তুর এসে পাঁচ সিকে সেরে পাঁচ সের মাছ নিয়ে চলে গেল। সংসার তো করতে হয় না, তা হলে বাছাধনরা টের পেতেন। স্ত্রী বলে, কাল কিছু সোনামুগের ডাল এনো, ও-বাড়ির সেজো-বউয়ের কাছে মুগের ডালের সন্দেশ করতে শিখেছি। ছাদে জ্যোৎস্না কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকে, খাঁচায় পোষা কোকিল শুধু ভুল করিয়া ডাকিয়া সারা হয়।

কোনও স্বামী-স্ত্রী চাকর বামুন ও আয়ার হাতে খাওয়া শোওয়া ও সন্তান-প্রতিপালনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া সন্ধ্যার পর গ্রামোফোনে বা রেডিওতে গান শুনিয়া প্রেমচর্চা করে, বায়োস্কোপে গিয়া বায়োস্কোপের নায়ক-নায়িকাকে পরস্পর চুম্বন করিতে দেখিয়া চুমু খাইবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ফিটনে চাপিয়া মোটরে চাপার স্বপ্ন দেখে এবং সপ্তাহে একদিন রেড রোডের ধারে বেড়াইয়া বিবাহিত জীবনের চরমতম সাধ মিটাইয়া লয়। ভাল কাপড়-জামা-পরা ফিটফাট ছেলেমেয়েকে মধ্যস্থ রাখিয়া ইহাদের প্রেম বিকশিত হয়; আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব বাড়িতে বেড়াইতে আসিলে তাহাদিগকে জানালার পরদা, দেওয়ালের ছবি, চীনামাটির বাসন, বিলাতী পুতুল, বিছানা মশারি দেখাইয়া নূতন রেকর্ড শুনাইয়া অথবা অ্যাল্‌বামে সজ্জিত খোকার নূতন তোলা ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিবাহিত জীবনে যে ইহারা সুখী, নানাভাবে তাহাই প্রকাশ করিয়া দেয়।

ইহারই উর্ধ্বতন স্তরের যাহারা, তাহাদের কথা নাই বলিলাম। তাহাদের প্রেম ড্রইং-রুমে, মোটরে, ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ ট্রেনে, দার্জিলিঙে, কার্মাটাঁরে অথবা জাহাজের কেবিনে। ইহাদের প্রেম নাইট-গাউনে, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানে, পিয়ানোর টুংটাঙে।

আমি ও আমার প্রেয়সী গৃহিণী পরস্পর একত্র থাকিয়া যখন সংসারযাত্র নির্বাহ করি, তখন উপরোক্ত যে কোন একটি শ্রেণীর জীবই হইয়া যাই—খুঁটিনাটিতে কিছু তফাত থাকিতে পারে। কবিতা গল্প উপন্যাস লিখি, মাসিকে ছাপাইয়াও থাকি ; কিন্তু সেগুলি মোটেই সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত নয়। আমি আমার গৃহিণীর এতই পরিচিত (অন্তত তিনি তাহাই ভাবেন) যে, আমার লেখায় নূতন কিছু পাইবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি সেগুলি পড়িতে পারেন না। আমার স্ত্রী ভাল গাহিতে পারেন। বিবাহের পূর্বে তাঁহার গান শুনিয়া আমি পাগল হইতাম, বিবাহের পরে তাঁহার গানে সে উন্মাদনা অনুভব করি নাই। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আমার অবর্তমানে তিনি হয়তো মনের আবেগে

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে—

গাহিয়া পাড়ার বাতাস করুণ করিয়া তোলেন, কিন্তু আমার কাছে তাঁহার সেই আবেগ রুদ্ধ হইয়া যায়। ভাবিতে বসি, কেন এমন হয়! একটা কারণও আমি মনে মনে বাহির করিয়াছি। Idea of possession—অধিকারের ভাব বা স্বামিত্বের ভাবটাই পৃথিবীতে মারাত্মক। যে সকল বই আমার নিজের আছে, আজ পর্যন্ত সেগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। পরের কাছ হইতে বই ধার করিয়া আনিয়া ভাল করিয়া পড়িয়াছি, মজিয়াছি। এও বুঝি সেই রকম। স্ত্রী মনে করেন, স্বামীর কবিতা, ও তো আমারই সম্পত্তি, সেই আনন্দটুকুই যথেষ্ট, পড়িয়া আনন্দ পাইবার প্রয়োজন কি? স্বামী ভাবেন, স্ত্রীর গান! সে তো একান্ত আমারই—ইহা অপেক্ষা অন্যের ছবি দেখিলে লাভ আছে। এই স্বামিত্বের ভাব হইতেই পৃথিবীতে সকল পরিবারে ভয়াবহ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইতেছে। বিবাহের পূর্বে যাহারা একান্ত আত্মীয় ছিল, বিবাহের পরে তাহারা বিচ্ছিন্ন ও অপরিচিত থাকিয়া যাইতেছে।

কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম, বিবাহিত জীবনের অবস্থা বর্ণনা করিতে বসিয়া দর্শনের অবতারণা করিলাম। আসলে বস্তুটা এত ডেলিকেট যে, আমি কিছুতেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না। পৃথিবীতে অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রীই হয়তো সুখে আছেন, ট্র্যাজেডির ভাবটা জাগিয়াছে আমার মনে। আমি তাঁহাদের জীবনেও তাহা আরোপ করিতেছি।

কিন্তু সত্যই কি তাই? ট্র্যাজেডিই যদি না থাকিবে, তবে এত মিথ্যার প্রয়োজন কেন? সামান্য স্খলন-ত্রুটিতে এত ক্রোধ কেন? রামের স্ত্রী আমাকে হয়তো মোহাবিষ্ট করিয়াছে, তাহার স্বর যদি কখনও কর্কশ হইয়া উঠে, কোনও ইতর কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে শুনি, আমার রাগ হয় না কেন? অথচ নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে নেশা কাটিয়া যায় বলিয়াই দোষগুলি চোখে পড়ে। নেশার অভাবটাই মিথ্যা দিয়া ঢাকিতে হয়। যেদিন আমার মনে অধিকারের ভাব, অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রীর স্বামী হইলাম—এই ভাব জাগ্রত হয়, সেদিন হইতেই বিবাহের মন্ত্রের অবমাননা শুরু হয়।

কিন্তু এমনও শোনা যায় যে, স্ত্রীর জন্য দুই সহোদর ভাইয়ে পৃথক হইয়া গেল, ছেলে বাপকে ছাড়িয়া ভিন্ন সংসার পাতিল। সকল স্থলেই যে স্ত্রীরা দোষী এমন নাও হইতে পারে, কিন্তু সত্যই যেখানে স্ত্রীরা দোষী, সেখানে তাহারা ভাগ্যবতী। তাহাদের স্বামীদের অক্ষয় প্রেম, এক আনার ডাক-টিকিট পর্যন্ত তাহাদের অধঃপতন হয় না।

নিজের কথা বলিতেছিলাম, গল্প বলিতেছিলাম, তথ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম তথ্যাংশের জন্য পাঠক মাপ করিবেন।

দ্বিতীয় অবস্থা—বিরহের অবস্থা, এই অবস্থার প্রকারভেদ নাই। বেদবর্ণিত পুরূরবা, রামায়ণে বর্ণিত রাম, মেঘদূতে বর্ণিত যক্ষ সকলেই প্রিয়াবিরহে উন্মত্ত হইয়াছেন, কাঁদিয়াছেন। রাম সীতার স্বামী ছিলেন। উর্বশী পুরূরবার এবং যক্ষপ্রিয়া যক্ষের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন কি না জানা নাই, ইহাদিগকে স্বামী-স্ত্রী বলিয়া ধরিয়া লইলেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীনতম বিরহী পুরূরবা ও আধুনিকতম বিরহী ফণীন্দ্রনাথ সকলেই উচ্ছ্বাসের অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়া কাজ সারিয়াছেন। মেঘদূতের যক্ষ মেঘকে দূত করিয়া যে কথা বলিতে চাহিয়াছেন, আমাদের ফণীন্দ্রনাথও এক আনার ডাক-টিকিটের সাহায্যে প্রেয়সীকে সেই কথাই বলিতে চাহিতেছেন। বিরহের অবস্থার ফাঁকি অত্যন্ত সিস্‌টেমেটিক এবং গতানুগতিক।

যাক, আরও কিছুকাল অতীত হইয়াছে। তালতলা হইতে বাসা বদলাইয়া মানিকতলায় আসিয়াছি। এবারের বাড়িটি গৃহিণীর পছন্দ-মাফিক হইলেও প্রথম দিনই ঘর-দুয়ার জিনিস-পত্র গুছাইয়া ছাদে গিয়া তিনি ঝুনা সেনানায়কের মত চতুর্দিকে একবার চাহিয়া লইলেন, কোথায় কতদূরে কি

ধরনের শত্রু বিরাজ করিতেছে, সমস্ত নির্ধারণ করিয়া আসিয়া তিনি গুম হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, বাড়িটা বিশ্রী।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? বাড়ি বদলানোর হাঙ্গামা যে কতখানি, সম্প্রতি বুঝিয়াছি।

প্রেয়সী শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, বাড়ির ছাদটা ভাল ছিল, কিন্তু ছাদে বেড়াবার জো নেই—

এ বিষয়ে বেশী ঔৎসুক্য প্রদর্শন ঠিক নহে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলাম। বুঝিলাম, বুদ্ধিমতী প্রেয়সী শীঘ্রই একটা বিহিত করিয়া ফেলিবেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ অশান্তি থাকিবে।

নূতন বাড়িতে শীঘ্রই পাকাপাকি রকম বাসা বাঁধিলাম। প্রতিবেশীদের সহিত প্রেয়সীর আলাপ জমিয়া গেল, কেউ দিদি, কেউ খুড়ী, কেউ মাসী। আমার চাল বিগড়াইবার সুবিধা পাইল না।

যেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অফিস হইতে ফিরিতাম ও গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইবার জন্য ছাদে যাইবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতাম, প্রেয়সী বলিতেন, যাও না, মাঠে একটু বেড়িয়ে এস, মেয়েরা তো আর তোমাদের মত হুট ক'রে বাইরে হাওয়া খেতে বের হতে পারে না, ওই ছাদটুকুই সম্বল। তাও কি কেড়ে নেবে?

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে চাটুজ্জেদের ছাদের উপর গুম্ফমণ্ডিত একটি যুবকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মাঠে বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতাম।

বৈশাখে বাড়ি বদলাইয়াছিলাম, পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। সরমা তাহার মায়ের সহিত কিছুকাল তাহার পিত্রালয়-প্রবাসী হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া পুরী যাইবার মতলব করিয়াছিলাম, সরমার নিকট প্রকাশ করি নাই। কারণ তাহাকে জানাইলে সেও সঙ্গী হইতে চাহিত। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে, এ উক্তি সে মানিত না। সুতরাং একটু অভিমানের ভাব দেখাইয়া কিছু অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শেষে সম্মত হইলাম।

সেদিন হাওড়া স্টেশনে প্রেয়সীকে সুগভীর বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া আসিয়া একটি সুদীর্ঘ আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ছাদে ঈজিচেয়ারে বসিয়া চুরুট ধরাইলাম। নারিকেলপল্লবের মর্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনটা উদাস হইয়া গেল; আকাশে মেঘের আবরণ নাই। সুনীল আকাশ মুক্তির আনন্দে

যেন হাসিতেছে। আমিও একটা অপূর্ব মুক্তির আস্বাদ অনুভব করিলাম। উত্তরের কোনও বাড়ি হইতে নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছিল—

মধুর মধুর রাতি—

অনুভব করিলাম, বিবাহ করা ইস্তক জীবন ভারী হইয়া উঠিয়াছে, মনের লঘুতা হারাইয়াছি। ঈজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়া বিবাহের বিরুদ্ধে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়া ফেলিলাম। মনে পড়িল, ইসাডোরা ডানকান তাঁহার জীবনীতে মেয়েদের তরফ হইতে এ বিষয়ে একটা সূক্ষ্ম এবং গম্ভীর আলোচনা করিয়াছেন। নীচে আসিয়া তাঁহার বইখানা লইয়া পড়িলাম—

No woman has ever told the whole truth of her life. The autobiographies of most famous women are a series of accounts of the outward existence, of petty details and anecdotes which give no realisation of their real life. For the great moments of joy or agony they remain strangely silent.

তিনি নিজে সর্বপ্রথমে নারীর মর্মকথা বলিতে চহিয়াছেন—

I enquired into the marriage-laws and was indignant to learn of the slavish condition of women. I began to look enquiringly at the faces of the married women friends of my mother, and I felt on each was the mark of the green-eyed monster and the stigma of the slave...The ethics of the marriage-code are an impossible proposition for a free-spirited woman to accede to.

পুরুষদের তরফ হইতে আমারও সেদিন বলিতে ইচ্ছা হইল যে, নারীকে বিবাহ করিয়া পুরুষও কম দাসত্ব-বন্ধন স্বীকার করে নাই। কোনও পুরুষ এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমরা প্রত্যহ প্রত্যেকে অনুভব করি যে, পুরুষ যেদিন নারীকে বিবাহ করিয়া তাহার গৃহশোভা বর্ধন করিবার জন্য আপনার গৃহে আনিয়া হাজির করিয়াছে, সেইদিনই তাহার মুক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

প্রবন্ধ খানিকটা লেখা হইতেই ভয়ানক ঘুম পাইতে লাগিল। আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যার আশ্রয় লইতে অকস্মাৎ মনে হইল, ঘরটা ভয়ানক

খালি, একেবারে শূন্য যেন! মনে হইল, শয্যা খালি—বুকের খানিকটাও খালি-খালি ঠেকিতে লাগিল। আমি ভাল বিছানায় শুইতে ভালবাসি, প্রেয়সী তাহা জানিতেন। বিছানাটি তিনি অতীব যত্নের সহিত প্রস্তুত করিতেন। আজ বোধ হইল, বিছানায় ধূলা কিচকিচ করিতেছে—পিপীলিকারা সারবন্দী হইয়া চলাফেরা শুরু করিয়াছে। ঘুম আসিল না। একটা অতি-পরিচিত মধুর স্পর্শের জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়া উঠিল। অনুভব হইল, মিথ্যা প্রবন্ধ, মিথ্যা ইসাডোরা ডান্‌কানের জীবনী। তারপর কখন ঘুমাইয় পড়িয়া প্রেয়সীকে স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম।

পরদিন দল বাঁধিয়া হৈ-হৈ রৈ-রৈ করিতে করিতে পুরী যাত্রা করিলাম। সমুদ্র ও মন্দির দেখার ক্ষুধা মিটিতে একদিনের অধিক দেরি হইল না। সমুদ্রতীরের হোটেলে সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া কলিকাতার কোটরবাসী আমরা তাস খেলিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম, এবং বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, পাঁচদিনের দিন পুরী ত্যাগ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় দর্শন দিলাম। আসিবার সময় নিজের জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্তি হইল না, গৃহিণীর জন্য কর্পূরের মালা, জগন্নাথের পট ও মহাপ্রসাদ এবং সমুদ্রের কড়ি ও ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া আনিলাম।

কলিকাতায় ফিরিয়া সপ্তাহখানেকের মধ্যে নূতন করিয়া প্রেমে পড়িলাম। এখনও সেই বাড়িতে বাস করিতেছি বলিয়া ভরসা করিয়া নাম-ঠিকানা দিতে পারিতেছি না, কিন্তু এবারকার প্রেমটা যেন একটু বেশী গাঢ়, বেশী গভীর মনে হইল।

নূতন নায়িকার হাতের সাজা পান খাইবার লোভে তাহাদের এঁদো ঘরের নোংরা বিছানায় চিত হইয়া পড়িয়া আমার মত স্বপ্নবিলাসী কবি এবং সাহিত্যিক যে কেমন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিত, তাহা ভাবিলে আজিও অবাক হই। সেই বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া নির্বিবাদে কোলে পিঠে চাপিয়া কাপড় নোংরা করিয়া অত্যাচার করিতে লাগিল, অম্লানবদনে তাহাদের সর্দি মুছাইয়া দিয়া আদর দেখাইতে লাগিলাম। বস্তুত, বুড়া বয়সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ।

নেশায় এমন মত্ত হইয়াছিলাম যে, গৃহিণীকে সপ্তাহে একখানি চিঠি লিখিবার সময়ও কষ্টে করিয়া উঠিতে পারিতাম। প্রেমচর্চার নিত্যনূতন পন্থা আবিষ্কারের চিন্তায় মশগুল থাকিয়া তাঁহাকে লিখিতাম—

"সত্যি সরি, আর পারি না। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা লোকে বোঝে না। তুমি কাছে না থাকলে আমার কি দুর্দশা হয়, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এক লাইন কিছু লিখতে পারছি না। বিছানায় চুপচাপ পড়ে আছি আর ভাবছি, কবে তুমি এসে আমার এই ছোট্ট ঘরখানি ভরে তুলবে। আকাশ আমার শত্রুতা করছে, বাতাস অত্যাচার শুরু করেছে, নারকেলগাছের পাতাগুলো পর্যন্ত দুষ্টুমি করতে ছাড়ছে না।

আর কতদিন তুমি বাইরে থাকবে? একদিনের ছুটিও পাচ্ছি না যে, আমার সরিকে দেখে আসব। ভাবছি, এ ছাই চাকরি ছেড়ে দেব।"

তারপর এক আনার একটি ডাক-টিকিট সংগ্রহ করার অপেক্ষামাত্র, বিবাহিত জীবনের বিরহকালের কর্তব্য শেষ!

এদিকে বেকার আইবুড়ো বন্ধুর দল খালি পাইয়া আমার বাড়িটার এমন অবস্থা করিল যে, ভয় হইতে লাগিল, পাড়ার লোকের নালিশে বাড়িওয়ালা বুঝি নোটিসই দেয়! চা আর চুরুট, হল্লা গান। আমি থাকি আর নাই থাকি, সমানে আড্ডা চলিতে লাগিল। বিশেষ কারণে পাশের বাড়িতে গিয়া আমি যখন ছেঁড়া তেলচিটচিটে মাদুরে শুইয়া কড়ি-বরগা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি, শুনিতে পাইতাম, আমার শোবার ঘরে বন্ধুজন সমবেত হইয়া কোনও দুর্বল মুহূর্তে রচিত আমারই একটি ইংরেজী গান তারস্বরে গাহিতেছে—

Oh, had our wives
Known the lives
  In separation we are leading,
The wild oats we sow,
If they should know,
  How 'll they love us, when reading
The letters we write
From love's high height—

আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইত। প্রেমের অবস্থা এবং বন্ধুদের অত্যাচার ক্রমশ সঙ্গিন হইতে লাগিল। জীবনে কখনও নিজের বাড়ির বাজার করি নাই, আমার নায়িকার বাড়ির বাজার করিতে গিয়া নাকাল হইতে লাগিলাম। শেষকালে যখন এমন অবস্থা হইল যে, এক আনার

ডাক-টিকিটও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন একদা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইলাম। কোথায় বন্ধুজন, কোথায় নূতন প্রেমের নায়িকা! চাকরে শিয়রে বসিয়া বাতাস করে, মন পাশের বাড়ি ডিঙাইয়া বহুদূরে ছুটিয়া যায়। মধুর স্নেহের স্পর্শের লোভে ললাট ঘামিয়া উঠে, ম্লানমুখী প্রেয়সীকে পাশে দেখিবার জন্য মন কাঁদিতে থাকে।

তাঁহার চিঠিতে ব্যাকুলতা, আমার কি হইয়াছে, শরীরটা কেমন আছে, এক ছত্র লিখিয়াও কি জানাইতে পারি না! শিশিরার্দ্র শিউলিফুলের কথা তাহাতে নাই, আকাশের নীলিমার কোনও আভাস নাই—তবু ভাল লাগে।

জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া থাকিতাম। পাশের বাড়ির কর্তা আমাকে দেখিতে আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং কখন তিনি তাঁহার কন্যাকে দিয়া এক আনার ডাক-টিকিটের সাহায্যে আমার গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, জানিতে পারি নাই। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নিতান্ত অসুস্থ দেহে অনুভব করিলাম, আমার অন্ধকার গৃহ হাসিতেছে। পথক্লান্ত প্রেয়সী আমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছেন। অত্যন্ত আরামে 'আঃ' বলিয়া তাঁহার একটি হাত আমার শীর্ণ হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন প্রথমেই নজরে পড়িল, সদ্যস্নাতা আলুলায়িতকুন্তলা প্রেয়সী মেঝেয় বসিয়া অত্যন্ত যত্নে বার্লির সহিত লেবুর রস মিশাইতেছেন। আমার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

সেই দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছি, মানুষ দার্শনিক নহে, মানুষ মানুষই।

১৩৩৬

জলের মত পরিষ্কার

পুলক আর পলা। স্কটিশ চার্চ কলেজ আর বেথুন।

চোখোচোখি হতে প্রেম, তার পর বিয়ে। জাত এক, গোত্র আলাদা; এমন যোগাযোগ কেমন করে ঘটল যদি কেউ প্রশ্ন করেন, আমরা নাচার। শুধু পালটে জিজ্ঞেস করব, মশায়, জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার দেখা হল কেমন করে? নির্মলকুমারীর সঙ্গে মাণিকলালের?

যাকগে, আমি গল্প লিখছি, ইতিহাস রচনা করতে বসি নি। তবু, রোস্ট মুরগিটা মুরগির মত দেখতে হলেই খেতে ভাল লাগে, তাই একটু যা স্থান-কালের হিসেব দেওয়া।

বি. এ. পড়তে পড়তে কাব্য করে নি, প্রেম করে নি, এমন ছেলেকে তো আমরা দেখি নি। এক দিলীপ, সেও ভালবেসেছিল কথাকে, বকতে পেলে সে নস্যির নেশাও ভুলে থাকত। আমাদের পুলকও কবি ছিল, প্রতিনিয়ত সুন্দরের, মনোহরের ধ্যান করত। সে স্কটিশে বি. এ. পড়ত। বিকেলে যখন ক্লাস শেষ হত, মোনা-মাস্টার অভিজ্ঞান আর টেম্পেস্টের তুলনা শেষ করে চলে যেতেন, তখন পুলক, শকুন্তলা আর মিরান্দার কথা ভাবতে ভাবতে হেদোর পশ্চিম পাড়ে এসে দাঁড়াত। কুড়ি হাতের মাত্র ব্যবধান, অথচ গৌরীশঙ্কর-অভিযানের চাইতেও বিপদসঙ্কুল! সে আনমনে রাস্তার ওপারে চেয়ে না থাকার ভান করত, তার চোখ থাকত ঠিক। এক, দুই, তিন, চার—

এমনই রোজ।

পলা পড়ে বেথুনের ফার্স্ট ইয়ারে; মাইকেলের প্রমীলা ও মেঘনাদের স্মৃতি নিয়ে বাসের একটি নির্দিষ্ট কোণে বসে, কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি নেই।

এমনই রোজ।

শিলং পাহাড়ে মোটরের সঙ্গে মোটরের ধাক্কা লাগে, কলকাতার সমতল পথে লাগে চোখের সঙ্গে চোখের ধাক্কা। ধাক্কা লাগল, স্ফুলিঙ্গ উড়ল, আগুন ধরে গেল, আর নেবানো যায় না। ফায়ার ব্রিগেড—বিবাহ।

একদিন হঠাৎ পলা-পুলকের হল চোখোচোখ। পলা ভাবল, বা, বেশ তো! পুলক ভাবল, চমৎকার! তারপরই লজ্জা, এ দেখল চার্চটাকে, ও দেখল দেবকীনন্দন প্রেস। বাস চলে গেল।

এখানেই শুরু, কিন্তু সারা হল—থাক, পরের কথা পরে হবে।

আগে দৃষ্টি ছিল অনির্দিষ্ট, মন ছিল লক্ষ্যহীন। পরদিন থেকে হেদোর গেটের ধারে বাস আসতেই মনে হল, কতদিনকার পরিচয়। পলা অকারণেই সুসংযত বস্ত্রকে আরও সুসংযত করতে চায়, চুলগুলোকে ঠিক করতে গিয়ে বেঠিক করে; সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ, কিন্তু এ বিদ্যুতে শক লাগে না। পাশের সঙ্গীরা বুঝতেই পারে না।

আর পুলক? হেদোর জল লালচে হয়ে ওঠে, স্কটিশচার্চ কলেজ দুলতে থাকে, বেথুন কলেজ যেন পরীরাজ্য, দেবদারু গাছগুলো হাতছানি দেয়। ট্রাম কি শব্দ করে চলে!

এক দিন, দু দিন, তিন দিন—গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ে।

পুলক গাঁয়ের মাঠে বসে থাকে। কাঁচা আম আর কাসুন্দির সঙ্গে একখানি মুখ মনে পড়ে। লিচু ছাড়িয়ে খেতে গিয়ে শাঁসের ওপর দেখতে পায়, একজোড়া কালো চোখ লজ্জানত। জামগাছগুলো যেন খোঁপা বেঁধেছে।

বেয়ারা প্লেটের ওপর বরফ নিয়ে আসে, পলা দেখে, তার ওপরে একখানি চকি মুখ আঁকা। বায়োস্কোপ দেখতে যায়, ভ্যালেন্টিনোর মুখখানা আর একখানা মুখ এসে দেয় আড়াল করে, তার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। বলে, দাদা, এবার বুঝি চশমা নিতে হয়।

কিন্তু তার আর দরকার হয় না, কলেজ খোলে।

নিত্যকার অভ্যাস।

পুলক একদিন দেখল, মেয়েটির চোখে হাসি। তবে কি? দূর! কারণের অভাব কি, ছোঁড়াগুলো যে ভাবে তাকায়, তা ছাড়া সাত ফুট লম্বা সেই লোকটা ট্রামে উঠতে যায়।

শনিবার।

গোলদীঘির ধারে পুলক একটা গামছার দর করছিল। সে বলে, পাঁচ আনা; গামছাওয়ালা বলে, ছ আনা। সাড়ে পাঁচ আনায় রফা হল। পুলক একটা টাকা দিয়ে চেঞ্জ নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েই দেখল, একটা ট্রাম। পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছিল। সেই মেয়েটিই তো! সেই জামরঙ শাড়ি, পেয়ালা-খোঁপা।

রোখকে।

গামছা রইল, চেঞ্জ রইল।

একেবারে সামনের বেঞ্চে।

মেয়েটির মুখে হাসি।

বাবু, টিকিট! ওই যা! একটি টাকা সঙ্গে ছিল—গামছা, টাকা! পুলক ভাবল, ট্রাম, তুমি দ্বিধা হও। ফ্যালফ্যাল চোখে কণ্ডাক্টারের দিকে চেয়ে বলল, তাই তো! কণ্ডাক্টার দড়ি টানল।

যদি কিছু মনে না করেন।—যেন বাঁশি বাজল! বাঁশের বাঁশি নয়, কুলির কাছে কলের ছুটির বাঁশি, স্ত্রীর কাছে স্বামীর ট্রেনের বাঁশি।

মেয়েটি হাতব্যাগ খুলে একটি টাকা কণ্ডাক্টারের হাতে দিল। ভাগ্যবান কণ্ডাক্টার।

আপনি কোথা নামবেন?

কোথা? কেন, সে কি জানে না? নির্মম? বলল, এস্‌প্ল্যানেড।

'বেদে' পড়েছেন?

বেদ তো আমাদের টেক্সট নয়। ভট্টি, কুমার—

মেয়েটি হাসে। আপনাদের দেশ কোথা?

গ্র্যাণ্ট স্ট্রীট। পলা উঠে দাঁড়াল। পলা নাবল। পুলকও।

আপনি না এস্‌প্ল্যানেড যাবেন?

আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গিয়েছিলুম।

ও! আবার হাসি। আপনার বিশেষ কাজ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, চলুন না আমার সঙ্গে।

মার্কেটের কাজ চুকতেই পলা বলল, বড্ড শ্রান্ত হয়েছি। একটা গাড়ি দেখুন না! এই ট্যাক্সি!

পলার পাশে। পাঞ্জাবিতে শাড়িতে ছোঁয়াছুঁয়ি। দুজনেই চুপচাপ।

হঠাৎ পুলক বলে, আপনি বুঝি বেথুনে পড়েন?

মেয়েটি হাসে। বলে, আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। আমার এক বন্ধুর বিয়ের রাত্রে—বাসর-ঘরে তার স্বামী তাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল, জানেন?

পুলকের চোখে পলক পড়ে না। ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করে, কি?

জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার নাম কি?

পুলক বুঝতে পারে না। বলে, তাতে কি?

মেয়েটি আবার হাসে, বলে, ওই যা! আপনার নামটি জিজ্ঞেস করা হয় নি।

পুলক গুপ্ত। আর আপনার?

উৎপলা সেন। আমাকে সবাই পলা বলেই ডাকে।

পলা! ছলা, কলা, পায়ে দলা, পথ চলা, পাঁচনলা (রিভল্‌বার), গলা, অনেক মিল! পুলকের চিত্তে পুলকের ছোঁয়াচ লাগে।

পলা বলে, যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের বাড়িতে একদিন যাবেন সন্ধ্যার দিকে,—নং আপার সারকুলার রোড, লাল বাড়ি।

চোখের জল আর বুঝি রাখা যায় না, আনন্দাশ্রু।

দাদার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হবেন। বউদিদিও খুব আমুদে। যাবেন একদিন?

যাব। তার মনে পড়ল, তাদের ক্লাসের হরিপদ একদিন গাইছিল—

তোমরা মিছে ভাব
আমি যাবই যাবই যাব—

এই, রোখো। আসবেন কিন্তু কাল, আমার দাদার নাম—প্রেমোৎপল সেন।

পা আর চলে না, বুকটা ঢিপঢিপ করে। আর দুটো বাড়ির পরে।

কাঁচপোকা আর তেলাপোকা!

আলাপ-পরিচয়ের ব্যাপারটা পলাই দিল সহজ করে। প্রেমোৎপলের পত্নী নিখিল-প্রিয়া।

তারপর, শিক্ষক আর ছাত্রী। বেতন নির্দিষ্ট নয়।

এবং তারও পরে স্বামী আর স্ত্রী। পুলক তখন এম.এ. পাস করে হয়েছে প্রফেসর, পলা বি. এ. দেবে।

কিন্তু পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না. পুলকের দাবির অন্ত নেই। বলে, পাস ক'রে কি হবে, তার চাইতে—

পলা চটে। বলে, জান, জ্যোতির্ময়ী দেবী কি লিখেছেন 'ভারতবর্ষে' ?

রাবিশ! পুলক বলে।

তিল থেকেই তাল, রাই কুড়িয়েই বেল।

পলার মনে সুখ নেই। মনে পড়ে, হেদো, মার্কেট, পিকচার-প্যালেস। বন্ধু আর বান্ধবীর দল।

পলার ছেলে হবে। পলা বলে, এ তোমার অন্যায়, আমি থাকব বদ্ধ, আর তুমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে!

পুলক হাসে, অধ্যাপক পুলক। বলে, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে—

ছাই, সে তোমাদের অত্যাচার।

পুলক ভয় পেল। নারী-প্রগতির পাণ্ডা সলিলকুমার গুহঠাকুরতার সঙ্গে ঝগড়া করে সম্পর্ক দিল চুকিয়ে। পলার প্রশ্নের জবাবে শুধু বলল, ওটা অতি ইতর।

পলা হাসল। বলল, বটে ?

কিন্তু অধ্যাপক সলিলকুমার তবুও আসে। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পুলক দেখে, পলা স্টোভের সামনে বসে মুরগির কাটলেট ভাজছে, আর সলিল তাই তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। খুকী ধুলোয় পড়ে কাঁদছে। পুলক চীৎকার করে বলল, তুমি আবার—

সলিল বলল, রাণীর আহ্বান।

তারপর তিনজন মিলে সে এক কুরুক্ষেত্র। খুকীর কান্না শোনা যায় না।

লাথি খেয়ে সলিলকুমার বেরিয়ে গেল, বলে গেল, দেখে নেব।

পরদিন সন্ধ্যায় পলার খোঁজ নেই, সলিলকুমারেরও। খুকীকে বুকে নিয়ে পুলক খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'খানা টেনে নিয়ে পড়তে বসল। বইটা সলিলকুমারই পলাকে উপহার দিয়েছিল।

পুলক তবু পড়ল, নিখিলেশের কথাগুলো বেছে বেছে।

রাত যখন বারোটা, পুলকের চোখ জলে ভরে এসেছে, আর পড়তে পারে না, জানলার ধারে এসে সে বাইরের আকাশের পানে একবার চাইল, কৃষ্ণচূড়াগাছের ফাঁক দিয়ে একটি মাত্র তারা দেখা যাচ্ছে। পুলক হাত জোড় করে নমস্কার করল। তারপর নিজের মনেই বলে উঠল, আমি তোমাকে ছুটি দিলাম, পলা, ছুটি দিলাম।

খুকী কেঁদে উঠল।

১৩৩৪

কল্যাণী ভূত

আরে, না না মশাই, কল্যাণী-নগরের কংগ্রেস মণ্ডপে গত কয়েকদিন ধরে ভূত প্রেত পেত্নী দানো ব্রহ্মদত্যি ও মামদো ভূতের যে তাণ্ডব নৃত্য হল তার কথা বলছি না। ইংরেজিতে দুটো কথা আছে, "বিনাইন" এবং "ম্যালাইন"—কল্যাণকারী আর অকল্যাণকারী। মানুষের মধ্যে যেমন, ভূতদের মধ্যেও তেমনি ভালো ও মন্দ দুইই আছে। কেউ ঘাড়ে চেপে ঘাড় মটকায়, কেউ অলৌকিক উপায়ে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। এই শেষোক্ত জাতীয় একটি নারী-ভূতের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলাম আমার কৈশোরে। তিনি কল্যাণী ভূত। তাঁর কথাই আজ বলছি।

হ্যাঁ, ভূত আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তবে তাঁকে ভূত বলতে মন চায় না। আমারই মেজদাদা, মৃত্যুর পরে স্বশরীরে দর্শন দিয়েছিলেন একবার। তিনি আমার চিরপরিচিত অতিশয় প্রিয় মেজদাদাই, তাঁকে আর কিছু বলে ডাকব কি করে? বিশেষ ওই বিশ্রী ভূত নামে? যে কল্যাণীর প্রসঙ্গ অবতারণা করছি তাঁর আবির্ভাব ঘটে তারও পরে। আমি তখন পাবনা জিলা স্কুলের ছাত্র। ঘটনাটি মোটেই কল্পিত নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব। তবু নানা কারণে গল্পের আকারে লিখতে হচ্ছে; কাজেই নামধাম সমস্ত বদল করে গল্পই বলছি, নিছক আজগুবী ভূতের গল্প। পাঠক এ কথাটা স্মরণ রাখবেন।

দেবাংশুবাবু পাবনা বারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। বয়স তখন বড় জোর বত্রিশ, কিন্তু তারই মধ্যে এমন পসার জমিয়েছিলেন যে নাওয়া-খাওয়ার সময় পেতেন না। স্ত্রী কনকলতা সুন্দরী ছিলেন। সুন্দরী কিন্তু বন্ধ্যা। ব্রত মানত উপবাস—সব ব্যর্থ; ফতেপুর সিক্রির চিস্তির দরগায় ঢিলও বেঁধে এসেছিলেন। যেমন হয়, নেই বলেই হাহাকার উঠত তাঁর বুকে; যাদের আছে, বালাই বলে হেনস্থা করতেও তাদের বাধে না। যাক্, বয়স যখন পঁচিশ পেরিয়ে গেল অথচ মা ষষ্ঠী কৃপা করলেন না তখন কনকলতার ঝোঁক চাপল স্বামীর আবার বিয়ে দেবেন এবং সতীন-কাঁটাকে ফুলের মত নিজের বুকে করে মানুষ করবেন। কাজের মানুষ দেবাংশু, কনকলতার এসব অসার কল্পনাকে প্রশ্রয় দেবার তাঁর সময়ও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। তাঁর প্রসন্ন স্মিত হাসির আঘাতে কনকলতার সব আকূতি উপরোধ ছিন্নভিন্ন করে

তিনি শুধু একটিমাত্র কথা বলতেন, একা আমাকে নিয়ে বুঝি তোমার চলছে না, কনক ?

চলবে না কেন ? দেবাংশু পুরুষ ; তার ওপরে তাঁর কাজে কখনো ফাঁক পড়ে না। এসব নিয়ে ভাববার অবসর কোথায় তাঁর ? কনকের দুঃখ তিনি বুঝবেন কেমন করে ? মায়ের কোলে শিশু না এলে তার বুকের খিদে যে তার মনকে কতখানি পেয়ে বসে এ জ্ঞান উকিল দেবাংশুবাবু পাবেন কোথা থেকে। এ নিয়ে কোনও মা যদি আদালতে মামলা রুজু করত তা হলে তার পক্ষ সমর্থনে হয়তো এক কাহন করুণ কথা তিনিই বলতে পারতেন। কিন্তু নিজের স্ত্রী কিনা, তার অভাব অভিযোগ তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। কনকলতা অনেকদিন সহ্য করেছেন, আর না। একদিন তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না।

করলেনও। নিজের মাসতুতো বোন সুকুমারীকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। নিজেই বাড়ির সর্বেসর্বা গিন্নী এবং কর্তার একমাত্র পরামর্শদাতা। সন্দেহহীন অছিলার অভাব হল না কোনও। সুকুমারী সুন্দরী, সুকুমারী উদ্ভিন্নযৌবনা, সুতরাং আপত্তি হবার কথা একমাত্র কনকলতার নিজের। কিন্তু গরীব পিতৃহীন মাসতুতো বোনের একটা গতি করবার জন্যে তাকে যদি নিজের কাছে এনেই রাখেন তিনি, তা হলে অন্যায়টা কোথায় ? আড়ালে যার ইচ্ছা, তাঁকে নিজের-পায়ে-কুড়ুল-মারা বোকা বললেও মুখে তাঁর সহৃদয়তার প্রশংসা সবাই করবে।

কেবল দেবাংশুবাবুই ঘোর কলরব শুরু করলেন, অবিশ্যি আড়ালে, নিভৃতে কনকলতার কাছে। বেশ তো ছিলুম, এ আবার কি পরের হাঙ্গামা মাথায় পেতে নিলে কনক! কনক শুধু হাসলেন, কথার জবাব দিলেন না। বললেন, দূরে থাকলে চাড় হয় না, এবার ঘাড়ে এনে ফেলে দিয়েছি, এখন দেখি কতদিন একটা ব্যবস্থা না করে থাকতে পার তুমি।

কাজেই গোড়াগুড়ি খুব খানিকটা ছোটাছুটি করলেন দেবাংশু। একে বলেন, তাকে বলেন, একে আনেন, তাকে আনেন। লেগে গেল গেল মনে হয়। কিন্তু বিয়ের ফুল যখন ফোটবার তখনই ফোটে, হাঁকপাঁক করলে কি হবে ? কনকলতার আর পাত্র পছন্দ হয় না। এক মাস যায়, দু মাস যায় দেবাংশুর উৎসাহ-উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে আসে।

অর্থাৎ কনকলতার ফাঁদে পা দেন দেবাংশু। আগে রাত আটটা পর্যন্ত

মক্কেল ঠেঙিয়ে সুশান্ত সেনের বৈঠকখানায় দাবা খেলতে ছুটতেন দেবাংশু, আজকাল সন্ধ্যার পরে গা কেমন ম্যাজম্যাজ করে, বেরুতে আর ভাল লাগে না। জ্বরের তাড়সে কোর্ট থেকেও মাঝে মাঝে অসময়ে বাড়িতে চলে আসেন। কনকলতা কপালে হাত দিয়ে বলেন, তাই তো, কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে! সুকুকে বলেন অডিকোলনের শিশি, একটা কাপ আর ফরসা ন্যাকড়া আনতে; কেমন করে জলপটি দিতে হয় দেখিয়ে দেন, তার পরে কখন এক সময় সুট করে "দুধটা ধরে গেল বুঝি" বলে বেরিয়ে যান, রোগী নার্স কারু সেদিকে খেয়াল থাকে না।

একদিন রাত্রে দেবাংশুর কাছে খুব কাঁদলেন কনকলতা। গরীবের মেয়ে, বাপ মরা মেয়ে বলে কেউ গা করছে না, মাসীর কাছে তিনি আর মুখ দেখাতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হলেন দেবাংশু। এমন ঘ্যান্-ঘ্যান্ করলে কতক্ষণ সহ্য করা যায়! একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলে ফেললেন, সম্বন্ধ আনব পছন্দ করবে না, পাত্র আনব তাকে দূর ছাই করে বিদেয় করবে, ভাল জ্বালায় পড়লাম দেখছি। মনে হচ্ছে আমাকেই ফের কোমর বেঁধে ছাঁদনাতলায় দাঁড়াতে হবে—

বুঝতে পারলেন কথাটা বেফাঁস বলে ফেলেছেন, সামলাবার জন্যে তাড়াতাড়ি পরিশিষ্টটুকু যোগ করলেন, আমাকে ছাড়া যখন আর কাউকে পছন্দ হবে না তোমার।

কাঁদুনে ঘ্যানঘেনে কনকলতা একমুহূর্তে পালটে গেলেন, যেন ছোট্ট অবোধ খুকীটি। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। উচ্ছ্বসিত উল্লাসে স্বামীর হাত দুখানি চেপে ধরে সেই অনেকদিন আগেকার আবদারের সুরে বলে উঠলেন, তাই কেন কর না গো। দুটি বোনে আমরা কেমন সুখে থাকব।

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন কনকলতা। অবুঝ মেয়ে, কিছুতেই অন্য কথা বুঝবেন না। শেষ পর্যন্ত পাগলিকে ঠাণ্ডা করবার জন্যেই দেবাংশু বাবুকে রাজি হতে হল। মুখের একটা কথা তো! সাতপাক পর্যন্ত তো আর এগোতে হবে না।

কিন্তু ভবী আর ভুললেন না। নাছোড়বান্দা কনকলতা! কি মুশকিলেই পড়লেন দেবাংশু! কিন্তু নাচার।

মাসীমা ছুটে এলেন। তিনি কিন্তু সত্যিই কান্নাকাটি করলেন, সে কি

হয়! একজন পাগল হয়েছে বলে কি সবাই পাগল হবে? পোড়ারমুখী মলে যে বাঁচতাম।

'বালাই ষাট' বলে কনকলতা সুকুমারীকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন।

শুভলগ্নে বিয়েও হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

সাজিয়ে গুজিয়ে নিজের আকাঙ্ক্ষিত বাসরশয্যায় বোনকে পাঠাতে লাগলেন কনকলতা, নিজে আড়ালে থাকেন। দেবাংশু হাঁক ডাক করে খোঁজাখুঁজি করলেও ধরা দেন না। একটা মত্ততার মধ্যে দিয়ে সকলেরই দিন কাটে।

সে মত্ততা কাটে যখন জানাজানি হয় সুকুমারীর ছেলে হবে। কনকলতার তখন কত কাজ। কাঁথা ইজের ফ্রক, নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই তাঁর।

কিন্তু যিনি নেপথ্যে থেকে সংসারের রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি হঠাৎ কনকলতার প্রত্যক্ষ ভূমিকাটি দিলেন কেটে। তিনদিনের জ্বরে মাথায় রক্ত উঠে তিনি বিদায় নিলেন।

আকস্মিক আঘাতে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিদারুণ শোকবিহ্বল হল বালিকা সুকুমারী। ছিঃ ছিঃ, দিদির কথা সে একবার ভাল করে ভেবে দেখল না কেন? আর অমন দিদি! স্বামীর ওপর তার রাগ হল। সে না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু দিদিকে নিয়ে উনি তো বারো বছর ঘর করেছেন! স্বার্থপর পুরুষ, চিনতে পারেন নি।

অনবরত ভাবতে ভাবতে অসুখ করল সুকুমারীর, অন্তঃসত্ত্বা সুকুমারীর। মনের ব্যথাকে ছাপিয়ে নিদারুণ বাত-ব্যাধির যন্ত্রণা তাকে কাবু করে ফেলল। নিরুপায় দেবাংশু বোকার মত চেয়ে দেখতে লাগলেন এই পরিণতি।

সুকুমারীর মা এলেন। মেয়েকে সেবা-শুশ্রূষা করার অবকাশে শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন নিজের অদৃষ্টকে! প্রার্থনা করতে লাগলেন দিনরাত, সতী সাধ্বীকে কষ্ট দিয়েছে যারা তাদের ভাল কর ঠাকুর।

কিন্তু ঠাকুরের অলক্ষ্য বিধান তার আগেই জারি হয়েছে, পয়লা নম্বর সুকুমারীর কঠিন বাত, দোসরা নম্বর—

বোকার মত শুধু চেয়ে থাকলেন না দেবাংশু। তাঁর মনের মধ্যে কি যে বিপর্যয় ঘটে গেল, তিনি ওকালতি ছেড়ে স্বদেশী ডাকাতদের দলে ভিড়লেন। রাসবিহারী বসু তখন সবে দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলে পসার বাড়িয়েছেন। রাসবিহারী হচ্ছেন দেবাংশুর নিকট আত্মীয়। একদিন

হঠাৎ দেখা গেল দেবাংশু উত্তর-বঙ্গীয় বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছেন, বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে সম্রাটের রাজত্ব অচিরাৎ সম্পূর্ণ উৎখাত করবার মহৎ উদ্দেশ্যে। তিনি গোপনে এতে এতখানি মেতে উঠেছিলেন যে তাঁর নাম প্রায় সর্বভারতীয় নেতাদের দলে ঠাঁই পেয়েছিল। রাওলাট কমিটিতে সে নাম উঠেছে। পুলিসও নিশ্চেষ্ট ছিল না। একদিন ভোরে সুকুমারী যখন বাতের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতরাচ্ছে, নিরুপায়, অসহায় শিশুটা জুড়ে দিয়েছে বিষম কান্না, পুলিস ঘটা করে বাড়ি ঘেরাও করে ধরে নিয়ে গেল দেবাংশু দত্তকে, বিধির দোসরা নম্বরের বিধানে।

পৈতৃক সংস্থান ছিল যথেষ্ট, নিজেও কম বাড়ান নি দেবাংশু। সুতরাং বিধবা শাশুড়ীকে রোগী ও শিশু নিয়ে সেদিক দিয়ে বিপন্ন হতে হল না। তবে পয়সা থাকলেও বাইরের লোক অর্থাৎ নতুন ঝি চাকর বামনি তিনি বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না, কে জানে কার মনে কি আছে। তিনি নিজেই উনুন ধরিয়ে চাট্টি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নেন। বাচ্চাটার জন্যে ছাগল দুধের বরাদ্দ করলেন, বাড়িতে এসে দুইয়ে দিয়ে যায়। ঠিকে ঝি কুসুম ঝাঁট-পাট দিয়ে চলে যায়। আরও পাঁচ বাড়ির কাজ তার কিন্তু মন পড়ে থাকে তার মাসীমার আর খোকার দিকে। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, কুসুম কনকলতার আমলের লোক। তাঁরই সুবাদে নতুন গিন্নীকেও মাসীমা বলে সে। দুপুরে আবার আসে। দু-আড়াইখানা বাসন মাজা চটপট সারা হয়ে যায়, সেই সময়টা খোকাকে সে-ই খানিক খেলা দেয়, আদর করে।

ব্যাপারটা প্রথমে কুসুম লক্ষ্য করল। একদিন বাসনকটা নিয়ে খিড়কির ঘাটে গেছে। মাসীমা রান্না সেরে ঠাকুর-ঘরে জপে বসেছেন, কুসুম শুনতে পেল খোকাটা চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে, ককিয়ে দম আটকে মরেই বা বুঝি! বাসন ঘাটে ফেলেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল কুসুম। এসে দেখল অবাক কাণ্ড! কান্নার চিহ্ন শুধু চোখের জলের ক্ষীণ ধারায়, মিচকি মিচকি হাসছে খোকা, খুব শান্ত সুস্থ ভাব। মনে হল চক্ চক্ করে যেন মাইদুধ টান্‌ছে। খুশীতে মন ভরে উঠল কুসুমের। আহা! যার আর কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। একটু এগিয়ে গেল, কোলে তুলে নেবে কি না ভাবছে—হঠাৎ দেখতে পেল খোকার ঠোঁটে দুধের দাগ। ভাবল, দিদিমা যেন কি, দুধ খাইয়ে ঠোঁট মুছিয়ে দেন নি খোকার! কিন্তু না, একটি ফোঁটাই ধারা বয়ে গড়িয়ে পড়ছে যে! ওমা গো, কি হবে গো—চেঁচিয়ে উঠল কুসুম।

বাতের ব্যথায় সমস্ত রাত্রি একটুও ঘুম হয়নি সুকুমারীর, বেঘোরে ঘুমুচ্ছিল সে। কুসুমের চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে ব্যথার জায়গাটাতেই লেগে গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাতরভাবে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে কুসুম ?

কি বলবে কুসুম ? ভূত প্রেতের কথা মুখে উচ্চারণ করতেও সাহস হল না কুসুমের। একটু ভেবে নিয়ে বলল, খোকাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে মাসীমা, দুধ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু মানুষটাকে নয়।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সুকুমারীর। মরবার সময় দিদি বলেছিলেন, তোর ভয় নেই সুকু, আমি তোর পাশে পাশেই থাকব। কিন্তু দিদির বুকে দুধ আসবে কোত্থেকে ? নিজের দিকে চকিতে চেয়ে দেখল সুকুমারী, ভগবানের সেই অপরাজেয় ভাণ্ডার খালি, তাজা ফুলের বোঁটা ব্যাধিতে শুকিয়ে গেছে।

সেই বিভ্রান্ত অবস্থাতেই নিজেকে সামলে নিল সুকুমারী, মুখে আঙুল দিয়ে কুসুমকে চেঁচাতে বা কথা বলতে বারণ করল সে ; মা যেন জানতে না পারে। জানলেই এখুনি ঝাড়-ফুঁক ওঝা রোজার উৎপাত শুরু হয়ে যাবে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল খোকার কাছে, নিজের চোখে দেখল দুধের ধারা গড়াচ্ছে খোকার ঠোঁট বেয়ে, খোকা দেয়ালা করতে করতে ছাড়ছে আর প্রাণভরে টানছে সেই অদৃশ্য স্তন। ব্যাকুল আগ্রহে কুসুমের হাত ধরে মিনতি করে বলল সুকুমারী, তোর পায়ে পড়ি কুসুম, এ নিয়ে গোল করিস নে। অমঙ্গল হবে খোকার।

জিভ কেটে সুকুমারীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল কুসুম, বলল, ছিঃ মাসীমা, অমন বল না। আমিও তো মা, তোমার ভয় নেই।

প্যাক্ট হয়ে গেল সুকুমারী কুসুম আর সেই অদৃশ্য মানুষটির। খোকা নিরাপদে মানুষ হতে লাগল। কেউ আর কিছুতেই ভয় পায় না। একদিন সুকুমারীর ব্যথাটা বড্ডই বেড়েছে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত নড়াবার শক্তি নেই, সুকুমারী দেখতে পেল খোকা একেবারে খাটের ধারে গড়িয়ে গেছে, মাটিতে পড়ল বলে। নিজে উঠে কোনও প্রতিকার করবে তার শক্তি নেই। ধারে কাছে মাও নেই যে তাঁকে বলবে খোকাকে পাশ ফিরিয়ে বা সরিয়ে দিতে। ভয়ে চোখ বুজল অসহায় সুকুমারী। চোখ বুজেই শুনতে পেল খলবল করছে খোকা, হাসছেও। চোখ খুলে দেখল, খাটের মাঝখানে

বালিশের ওপর মাথা রেখে খোকা চিত হয়ে শুয়ে আকাশে হাত পা ছুঁড়ছে।

ছাগল দুধ বন্ধ করে দিতে সাহস হল না সুকুমারীর। রোজই ফেলে দিতে হয়, তবু মায়ের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে নিতেও হয়। বেতো মায়ের শিশু যে কোন মন্ত্রবলে এমন শান্ত শিষ্ট হয়ে উঠল বুঝতে না পেরে মা অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানেও সন্দেহের অবকাশ থাকতে দিল না সুকুমারী, ঠিকে ব্যবস্থা থেকে রাতদিনের ঝি হয়ে গেল কুসুম। খোকাকে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি দেখে মাও কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলেন কুসুমের ওপর। মানুষটা দরদী বটে।

তবে কুসুম আর সুকুমারীর অবস্থা দিনে দিনে হয়ে উঠল অদ্ভুত। যন্ত্রের সাহায্যে যারা কাজ করে, তাদেরও সুইচ টিপতে হয়। এখানে নির্বাক দ্রষ্টা হয়ে দেখা ছাড়া কিছু করবার নেই, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চলেছে যেন অদৃশ্য এক জোড়া পা, হাত বাড়িয়ে ধানটা খালি একটু নেড়ে চেড়ে দেওয়া! সেই অদৃশ্য কল্যাণীকে কেন্দ্র করে গিন্নী ও ঝিয়ের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল অদ্ভুত; কেউই মা নয়, ধাইও নয়, তবু পাড়ায় পাড়ায় প্রশংসার বান ডেকে গেল।

বড় হতে লাগল ছেলে আর কি যে দুষ্টু হয়ে উঠল। ভাবনা হয় মায়ের কিন্তু ভরসারও অন্ত নেই। যেখানে যে বিপদেই পড়ুক, বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে দুটি হাত যেন উদ্যত হয়েই আছে। একদিন উঠোনের পেয়ারা গাছটাতে তর্ তর্ করে উঠে পড়েছে খোকা। একটা বেশ বড় পেয়ারা নজরে পড়েছে তার। রান্না ঘরের বারান্দায় বসে তরকারী কুটছিলেন সুকুমারী, মা গেছেন সর্বমঙ্গলার ঘরে পূজো দিতে। খোকা মাছ না হলে ভাত খেতে পারে না, কুসুম বাজারে মাছ আনতে গেছে। পেয়ারাটা মুখে করে ধরতে যাবে খোকা—একটা পা তার হড়কে গেল। ভয়ে কাঠ হয়ে চোখ বুজল সুকুমারী, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল গাছের নীচেই বিপুলকায় ইঁদারাটা, জল তখন অন্তত চল্লিশ হাত গভীর। সে এক হৃদ্‌স্পন্দনস্তব্ধকারী মুহূর্ত; সেই বিহ্বল অবস্থাতেই সুকুমারী প্রত্যক্ষ দেখল ইঁদারার ঠিক মুখের কাছে এক জোড়া বাহু পতনশীল পুত্রকে অবলীলাক্রমে ধরে ফেলল, স্পষ্ট চিনতে পারল সুকুমারী, স্বর্ণবলয় শোভিত দিদির হাত দুখানা। সে সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

জ্ঞান হলে আনন্দে এবং ব্যথায় ডুকরে কেঁদে উঠল সুকুমারী। দিদি,

তুমি অমন করে আড়ালে থেকো না, দেখা দাও, দেখা দাও, ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। সমস্ত রাত্রি সেদিন এই ধ্যানেই কাটল সুকুমারীর।

পরের দিন সকালে বলা নেই খবর নেই একমুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে স্বশরীরে হাজির হলেন দেবাংশু। দীর্ঘকাল অন্তরীণ থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়েছেন। আনন্দের বান ডাকল আবার, শুধু বাড়িতে নয়—সারা শহরে। দলে দলে পুরনো বন্ধুরা এলেন, আত্মীয়-স্বজন এল। কৃতজ্ঞ মক্কেলরা আসতে লাগল। উৎসবের ধূম পড়ে গেল।

সবাই মিলে একটা ফটো তোলার প্রস্তাব সুকুমারীই করল। দাওয়ার সিঁড়িতে সবাই বসলেন, মায় কুসুম পর্যন্ত। ফটোগ্রাফার খুব অভিনিবেশ সহকারে এদিক থেকে ওদিক থেকে ফোকাস করে দেখলেন, খোকাকে হাসাবার জন্যে বারকয়েক পাখি ওড়ালেন, ছবি তোলা শেষ হল।

ছবি ডেভেলাপ করতে গিয়ে ফটোগ্রাফার অবাক্, খোকার ঠিক পেছনে একজন বাড়তি মেয়েছেলে এল কোত্থেকে? ভদ্রমহিলা, রীতিমত ভদ্রমহিলা! ছুটলেন তিনি দেবাংশুবাবুর কাছে নেগেটিভ হাতে। দেবাংশুবাবু প্রথমে একটু ভাববার চেষ্টা করলেন, হদিস না পেয়ে শেষে বললেন, বাড়িতে তো আর বাড়তি লোক ছিল না, দেখুন আগের কোনো এক্সপোজারের ওপরেই হয়তো এক্সপোজার দিয়েছেন।

আজ্ঞে না, পর পর দুটো ছবি তুলেছি, দুটোতেই উনি আছেন!

প্রিণ্ট করে আনতে বললেন দেবাংশু। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কি আছে! প্রিণ্ট যখন এল তখন দেবাংশু বাড়ি ছিলেন না, ছবি প্রথমেই সুকুমারীর হাতে পড়ল। তিনি দেখলেন, খোকার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন দিদি—কনকলতা।

দেবাংশুও এসে দেখলেন, কিছু বললেন না। খোকা প্রশ্ন করল, এ কে মা?

কি জবাব দেবে সুকুমারী? ঠাকুরঘরে ঠাকুর-দেবতার চৌকিতে প্রতিষ্ঠা হল সেই ছবির। সুকুমারী যতদিন বেঁচে ছিলেন রোজ পুজো করতেন।

হ্যাঁ, সে ছবি এখনও আছে। আপনারা ইচ্ছে করলেই দেখতে পারেন। মন্ত্রী-পরিষদের মাননীয় শ্রীহিমাংশু দত্ত সুকুমারীর সেই ছেলে, তাঁর কাছেই আছে সে ছবি।

আমি গল্প লিখলে আরও চটকদার, আরও রোমহর্ষক করে লিখতে পারতাম। কিন্তু সত্য ঘটনাকে বিকৃত করার আমি বিরোধী।—যা ঘটেছিল তাই লিখলাম এবং এইখানেই আমার ভূতের গল্পের স্টক ফুরল। এর পরে আমাকে গল্প বানাতে হবে। সে আমি পারি না।

আর এক কথা, এই ফটোর ব্যাপারের পর কোনও দিন আভাসে ইঙ্গিতেও সুকুমারী দিদির অস্তিত্ব আর টের পায় নি। মাননীয় হিমাংশু দত্ত পেয়েছেন কিনা কারুর কাছে প্রকাশ করে বলেন না।

১৩৬০

খাওয়া

অনেক সাধ্যসাধনা, বহু বিনিদ্র রাত্রিযাপন, বহু যন্ত্রণা ও অনেক অর্থব্যয়ের পর পরিবারে একটি সন্তানের শুভাগমন হইল। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সোল্লাস-আবেদন জানাইলেন, খাওয়াইতে হইবে। সেই শুরু নয়, ইহার পূর্বেও এক বা দুই এবং তেমন-তেমন ক্ষেত্রে ছয়-ছয় বার খাওয়াইবার নির্দেশ ঘর হইতেই আসিয়াছে। সেগুলি বাদ দিলাম। তাহার পর, পর পর অন্নপ্রাশন, মানত-রক্ষণ, উপনয়ন, বার্ষিক জন্মদিন আছে—তাহাও ধরিলাম না। সন্তান বড় হইল। বহু পরিশ্রমে বহু রাত্রি জাগিয়া বেচারা একটা পাস করিল। আত্মীয়-বন্ধুরা ধরিলেন—খাওয়াইতে হইবে। পরে তিনটা অথবা চারিটা পাসের সুযোগও শুভানুধ্যায়ীরা গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ খাইতে চাহিলেন। সে উল্লেখও করিলাম না। বিবাহও বাদ দিলাম। চাকুরির জন্য দরখাস্ত করিল। যাঁহাদের মধ্যস্থতায় চাকুরি, তাঁহারা প্রকাশ্যে ইঙ্গিতে অথবা রহস্যের ভান করিয়া কিছু খাইতে চাহিলেন। আসল খাওয়া সেইদিন হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহার পর সমস্ত জীবন-ভোর পান খাওয়া, তামাক-সিগারেট খাওয়া, জলপান খাওয়া, বাংলা খাওয়ান এবং হিন্দী খিলানা চলিতেই লাগিল।

খাওয়া দুই রকমের—বাস্তব (real) এবং আলঙ্কারিক (figurative)। বরাবর মনে করিতাম, আলঙ্কারিক খাওয়ানোটাই বিপজ্জনক; বাস্তব খাওয়ানোর তেমন হাঙ্গামা নাই। এতদিনে সেই ভুলটা ভাঙিল এবং ভাঙিল বলিয়াই এই গল্প ফাঁদিয়াছি।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন ভারতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জমিদারি-উচ্ছেদ। নিয়ামৎপুরের জমিদার ত্রিবিক্রম সিংহ জমিদারি হস্তান্তরিত করিয়াই সম্ভবতঃ সেই শোকেই হঠাৎ মারা গেলেন। বাছা বাছা কিছু ধেনো জমি ও কয়েকটা ল্যাংড়া আমের বাগান তিনি নতুন আইন-মোতাবেক খাসে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কাল হওয়াতেই তাহা তাঁহার দুই পুত্র উড়ুক্রম ও অধিক্রমে বর্তাইল। এমনিতে দুই ভাইয়ে খুব ভাব। কিন্তু সিংহসায়রের নামো জমির বাটোয়ারা লইয়া দুই ভাইয়ে বিস্তর মন-কষাকষি হইয়া গেল। অবশ্য ভ্রাতৃবিরোধের বীজ

সংসারে পূর্বেই উপ্ত হইয়াছিল, দুই ভাই একই দুঁদে উকিলের দুই সহোদরা কন্যাকে বিবাহ করাতে। দুই ভাইয়ের কলহে দুই ভগিনী নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমত উকিল পিতার নিকট হইতে অধিগত উকিলী বুদ্ধির ইন্ধন জোগাইতে কসুর করিল না। ফলে মামলা অনিবার্য হইয়া উঠিল।

দুইজনেই সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে দরখাস্ত পেশ করিল। জমিদার ত্রিবিক্রম সিংহকে সকলেই ভয়-ভক্তি করিত। তাঁহার পুত্রেরা সামান্য কারণে পরস্পর বিবাদ করিবে, ইহা শহরের অনেকের ভাল লাগিল না। তাঁহারা ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরিয়া-করিয়া আদালতনিরপেক্ষভাবে মীমাংসার ব্যবস্থা করাইলেন। সরেজমিনে তদারক করিয়া সমীচীন সুরাহার জন্য সহৃদয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সার্কেল-অফিসার শ্রীকুম্ভকর্ণ চতুর্বেদীকে নিযুক্ত করিলেন। হাঙ্গামা ঠেকাইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে আটজন জোয়ান কনস্টেবলকেও তিনি মোতায়েন করিয়া দিলেন।

কুম্ভকর্ণবাবু তদন্তে আসিবেন কিন্তু থাকিবেন কোথায়? নিয়ামৎপুর প্রধানত চাষীদের গ্রাম। ডাক-বাংলো বা সরকারী কাছারি নাই। একটা থানা আছে বটে—তাহাও পাক্কা চার ক্রোশ দূরে। ভদ্র বাসস্থান বলিতে একমাত্র জমিদার-বাড়িই আছে। বিরাট পাঁচ-মহলা বাড়ি। নয়জন তো ছার, দুশো-একশোতেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জমিদার-ভবন এখন দুই বিবদমান ভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত। চতুর্বেদী মহাশয় কোন্ জনকে কৃপা করিবেন? দুই ভাই-ই গোপনে গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আগেভাগেই কুম্ভকর্ণকে হাত করিবার মতলব আঁটিল। উভয়েই স্থির করিল, নিয়ামৎপুর পৌঁছিবার পূর্বেই আলঙ্কারিকভাবে কুম্ভকর্ণকে কিছু খাওয়াইয়া দিলেই হইবে। দুইজনেই জমিদার-বাচ্চা, পিতার কল্যাণে আজন্ম এ আলঙ্কারিক খাওয়ানোর সহিত পরিচিত। বাড়িতে নিত্য খাওয়া-দাওয়ার এত সমারোহ ছিল যে বাস্তব খাওয়াটা যে একটা কিছু ব্যাপার, দুই ভাইয়ের কেহই তাহা মনে করিতে পারিল না। সুতরাং দুইজনেই পরস্পরকে এড়াইয়া সদরে যাত্রা করিল।

কিন্তু সেখানে কুম্ভকর্ণ চতুর্বেদীর সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া গেল তাহাতে উভয়েই দিশাহারা হইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণ অতি সাধুসজ্জন ব্যক্তি। বাস্তব খাওয়া একটু বেশী খান বটে, কিন্তু তাঁহার কাছে আলঙ্কারিক খাওয়ার প্রস্তাব করিলেই সমূহ বিপদ—অসাধু প্রস্তাবকের পরাজয় অনিবার্য। তাহা

হইলে উপায়? দুই ভাই-ই দুই পথে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘরে ফিরিল। উডুক্রম-গৃহিণী দাক্ষায়ণী স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, তাতে আর হয়েছে কি! তবু তো একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল; ঠাকুরপোও তো কিছু খাইয়ে সার্কেল-অফিসারকে হাত করতে পারবে না। এ বরং ভালই হল। ছুট্‌কীটার নগদ টাকা অনেক বেশী। পাল্লা দিয়ে পারা যেত না।

অধিক্রম-গৃহিণী শঙ্করী কোনও উচ্চবাচ্য করিল না; যথাসময়ে কলিকাতা হইতে গলদা চিংড়ি, ভেটকি মাছ, বাঁধাকপি ও কড়াইশুঁটি কি করিয়া আনানো যাইতে পারে তাহার মতলব ফাঁদিতে লাগিল।

আটজন পেল্লায় জোয়ান কনস্টেবল, একজন খাস আরদালী ও স্থানীয় তিনজন চৌকিদারসহ যথাসময়েই মহামান্য কুম্ভকর্ণ চতুর্বেদীর অভ্যুদয় হইল। স্টেশনে দুই ভাই-ই হাজির। স্ব স্ব গরিবখানায় আতিথ্য-গ্রহণের কথা নিবেদন করিয়া দুই ভাই জোড়হস্তে হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন। উডুক্রম বুদ্ধি করিয়া তাহার দশ বৎসরের কন্যা কাত্যায়নীকে স্টেশনে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। কুম্ভকর্ণ কোনও ভাইয়ের দিকেই দৃক্‌পাত না করিয়া ফুটফুটে কাত্যায়নীর কাঁধে হাত দিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, কি নাম মা তোমার? কুম্ভকর্ণের বিরাট বিশাল লাশখানি দেখিয়া কাত্যায়নী বেশ ভড়কাইয়াছিল। মুখে আঁচল চাপা দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল, কাত্যায়নী। হাসির উচ্ছ্বাসে কুম্ভকর্ণের মেদবহুল দেহ তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। কাত্যায়নীর কাঁধে একটা মৃদু থাবা মারিয়া কুম্ভকর্ণ বলিলেন, চমৎকার নাম, তা হলে ডাকনাম হচ্ছে কাতু; চল কাতু, বাড়ি চল।

অর্থাৎ মামলার সূত্রপাতেই উডুক্রমের জয় হইল। কুম্ভকর্ণ উডুক্রমের বৈঠকখানা-বাড়িতে অধিষ্ঠিত হইলেন। নিয়ামৎপুরের খাস চৌকিদার বংশীবদন উডুক্রমের কানে কানে একটি মোক্ষম "টিপ্‌" ছাড়িল—ধর্মাবতার-হুজুর প্রত্যহ একটি গোটা পাঁঠা ভক্ষণ করেন, খেয়াল রাখবেন, কুমার বাহাদুর। মুরগি হলে এক গণ্ডা।

গোপন সংবাদটি উডুক্রমের ভালই লাগিল। জুতমত খাওয়াইতে পারিলেই কাজ হাসিল হইবার সম্ভাবনা। গ্রামে রোজ একটা পাঁঠার যোগাড়—কিছুই নয়। হঠাৎ মনে পড়িল, কিন্তু কনস্টেবলরা? তাহাদিগকেও তো সন্তুষ্ট না করিলে নয়। বেটাদের যেমন গতর দেখিতেছি একটা করিয়া

পাঁঠা তাহাদেরও চাই। তা ছাড়া, আপৎকালে দেবতাদের বড়-ছোট বাছবিচার করা সুযুক্তি নয়।

কাজেই পেয়াদা ছুটিল। হুজুর যতদিন থাকিবেন, প্রত্যহ নয়টা করিয়া পাঁঠার সরবরাহ চাই। জেলেদের হুকুম হইল এক মণ করিয়া মাছ। বিদায়ের দিন ফালাও করিয়া মুরগির ব্যবস্থা করিবেন—মনে মনে আঁচিয়া রাখিলেন উড্ডুক্রম সিংহ।

পাক্কা এগারো দিন শুইয়া বসিয়া তদন্ত চালাইয়া গ্রামের অনাবিল শান্তি বিঘ্নিত করিয়া এবং উড্ডুক্রমের মতলবমত বিদায়-রাত্রিতে সকনস্টেবল তিন ডজন মুরগি সাঁটিয়া কুম্ভকর্ণ চতুর্বেদী প্রাথমিক কাজ শেষ করিলেন। শেষের দিনের মুরগির আয়োজন করিতে উড্ডুক্রমের উৎসাহ ছিল না। কারণ, সেদিন সকাল পর্যন্ত পাঁঠার সংখ্যা ন-এগারো নিরানব্বইয়ের ধাক্কায় পৌছিয়াছে। দাক্ষায়ণীই জোর করিয়া শেষ রক্ষা না করিয়া ছাড়িল না। পাঁঠা ও মুরগির হাড় চিবাইবার কেরামতি দেখিয়া উড্ডুক্রমের মন-মেজাজ বিগড়াইয়া গেল—শেষ দিনে স্বয়ং পাঁঠা কাটিতে গিয়া কোমরটাও ভাঙিল।

বড় তরফে এত যে কাণ্ড হইয়া গেল আঁস্তাকুড়ে চোষা হাড়ের পুঁজির পরিমাণ ছাড়া ছোট তরফে তাহার আভাসমাত্র পৌছিল না। উড্ডুক্রম যাহাকে বলে "অবজার্ভড স্ট্রিক্ট সিক্রেসি" অর্থাৎ একেবারে সঙ্গোপনে সমস্ত কাজটা সারিল। এত আসিল, এত গেল—সমস্ত ভোরের রাত্রির অন্ধকারে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত হইল না।

ফলে ছোট-তরফে অধিক্রম ও শঙ্করী কেবল কল্পনা করিতে করিতে হদ্দ হইয়া পড়িল। গলদাচিংড়ি ভেট্‌কি কপি কড়াইশুঁটি এক "লট" আসিয়াছিল, নিজেদেরই তাহা হজম করিতে হইল। সঠিক খবর যেখানে পাওয়া যায় না (কয়দিন কাতুও এ বাড়ি আসা ছাড়িয়াছে) সেখানে অনুমান ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কুম্ভকর্ণ-সম্বর্ধনা-আসরে গভীর রাত্রে উড্ডুক্রমের সুরশৃঙ্গার-যন্ত্রে মালকোশ রাগ যতই করুণ হইতে করুণতর হইতে লাগিল, অধিক্রম-শঙ্করীর মন ততই দমিয়া গেল।

যন্ত্রের তারে রাগ-রাগিণীর ক্রম-করুণতা কিন্তু উড্ডুক্রমের একান্ত হৃদয়-বেদনাসঞ্জাত। পাঁঠা এবং তদনুপাতে লুচি পোলাও দধি মিষ্টান্নের বোঝা উড্ডুক্রম আর বহিতে পারিতেছিল না। জড় সুরশৃঙ্গারই শুধু সে খবর জানিল। উড্ডুক্রম মুখে কিছু প্রকাশ করিল না।

তদন্তের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় পর্বে "প্যারিটি" বা ভারসাম্য রক্ষার জন্য সুবিচারক কুম্ভকর্ণ যথারীতি কনস্টেবল-চৌকিদারসহ ছোট তরফে অর্থাৎ অধিক্রমের স্কন্ধে ভর করিলেন। ছোট তরফের কর্তাগিন্নী বড় তরফের হালৎ ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই, কাজেই বিশেষ উৎসাহ-উদ্যমের সহিতই কুম্ভকর্ণ-পরিচর্যা শুরু হইল। পাঁঠার মাংস খাইয়া খাইয়া স্থানীয় চৌকিদার বংশীবদনের পেটে চড়া পড়িয়াছিল। কাজেই সে এবার মুখ বদলাইবার জন্য অধিক্রমের কানে কানে দ্বিতীয় মোক্ষম "টিপ্"টি প্রয়োগ করিল : খেয়াল রাখবেন কুমার বাহাদুর, ধর্মাবতার-হুজুর রসবড়া ছানাবড়া রাবড়ি ফলফুলুরির একান্ত পক্ষপাতী।

সুতরাং কলিকাতা ও জঙ্গিপুরে লোক ছুটিল। মুরগি-পাঁঠা সংগ্রহ করিতে উড়ুক্রমের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই—ঘরে বসিয়া পয়সা খসাইয়াই মাল মিলিয়াছিল। অধিক্রমের প্যাঁজ-পয়জার দুইই হইল। পয়সাও গেল, ছুটাছুটি-হয়রানিরও অন্ত রহিল না।

এগারো দিনের দিন অধিক্রম-শঙ্করীকে ঠিক যেন ধোবিপাটে আছড়াইয়া কুম্ভকর্ণ তদন্তের দ্বিতীয় পর্বান্তে বিদায় লইলেন। উড়ুক্রম ভুক্তভোগী ; ছোট ভাইয়ের অবস্থা কিছুটা আঁচ করিয়া মনে মনে হাসিল ; ভাইয়ের প্রতি এতখানি দরদ অনুভব করিল যে, গৃহিণীর কাছেও সে হাসি গোপন করিল। দাক্ষায়ণী দরজার ফুটা দিয়া ভগিনীর অবস্থাটা দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শঙ্করীকে বড় তরফের ত্রিসীমানাতেও দেখা গেল না।

মাসাধিক কালের বিশ্রাম, বা বিরতি। গ্রামে দুইজন মাত্র মুখর প্রাণী উড়ুক্রম আর অধিক্রম, তাহারা দুইজনেই দম লইতেছিল। কাজেই গ্রাম শ্মশানের মত থমথম করিতে লাগিল। এই অবস্থায় সংবাদ আসিল, কুম্ভকর্ণ চতুর্বেদী মহাশয় তদন্তের তৃতীয় পরিচ্ছেদ রচনার জন্য পুনরায় আসিতেছেন। জাপানীরা নির্দিষ্ট দিনে বোমা ফেলিতে আসিতেছে—এই সংবাদ শুনিলেও দুই ভাই অধিকতর বিচলিত হইত না। দুই ভগিনী মুখে কিছু বলিল না, মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ ও সিংহসায়রের নামো জমির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিল।

শেষ পর্যন্ত কুম্ভকর্ণের দ্বিতীয় সমাগম-দিন উপস্থিত হইল। ভোর পাঁচটায় স্টেশনে ট্রেন আসিবার কথা। ঠিক সাড়ে চারিটায় সময় শীত-প্রত্যূষের কুয়াশার মধ্য দিয়া দেখা গেল, উড়ুক্রম অধিক্রম দুই ভাই গাড়ুহস্তে দুই ভিন্ন পথে সিংহসায়র সংলগ্ন একই মাঠের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

যথাসময়ে ট্রেন নিয়ামৎপুর স্টেশনের কাঁচা প্ল্যাটফর্মে আসিয়া থামিল। শ্রীকুম্ভকর্ণ চতুর্বেদী একটি ইণ্টার ক্লাসের কামরা হইতে একলাই অবতরণ করিলেন। প্রথম বারের সঙ্গী কনস্টেবলরা নাই, এমন কি খাস চাপরাসীও সঙ্গে নাই। স্থানীয় চৌকিদার বংশীবদন বিনীতভাবে সেলাম জানাইল। কুম্ভকর্ণ চতুর্বেদী প্ল্যাটফর্মের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত একবার নিরীক্ষণ করিয়া দুই ভাইয়ের একজনকেও উপস্থিত না দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। বংশীবদনকে কহিলেন, সিংহসায়রের জমিতে চল।

একটি ঘনসন্নিবিষ্ট ফণীমনসার ঝাড়ের অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে উড়ুক্রম সিংহের মাথাটি জাগিতে দেখা গেল। দেখিল ভূমি-উপবিষ্ট অধিক্রম সিংহ। সেও উঠিল এবং এক-পা এক-পা করিয়া দাদার দিকে অগ্রসর হইল। উড়ুক্রম পূর্বেই ভ্রাতার উপস্থিতি টের পাইয়াছিল। পাশেই সেই "ডিসপিউটেড" বা বিবাদমূলক জমি। একবার আড়চোখে জমির দিকে, একবার ভাইয়ের দিক চাহিল উড়ুক্রম। তাহার বুকটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল। অধিক্রম তিন সেকেণ্ড থমকিয়া দাঁড়াইয়া গাড়ু ফেলিয়া দাদার পায়ে আছড়াইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দাদা, তুমিই ভাগ-বাটোয়ারা করে দাও, আমি মেনে নেব। পরকে আর রাবড়ি ছানাবড়া খাওয়াতে পারব না।

উড়ুক্রম ভাইকে সস্নেহে বুকে তুলিয়া লইয়া বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করিল, রাবড়ি-ছানাবড়া? তবে যে বংশী বেটা বললে, পাঁঠা-মুরগি? দেখছি হারামজাদাকে! জলে বসে কুমীরের সঙ্গে চালাকি!

ফণীমনসার ঝোপের আড়াল হইতে কুম্ভকর্ণের বাজখাঁই কণ্ঠস্বর শোনা গেল: বংশীর ওপর মিথ্যে রাগ করবেন না উড়ুক্রমবাবু, আমি দুই-ই খাই এবং সমান তৃপ্তির সঙ্গে খাই। আপনাদের মামলা তো আপোসে মিটল। আমি তা হলে বিদায় নিই, কি বলেন অধিক্রমবাবু?

দুই ভাই-ই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, সে কি কথা, আমাদের গরিবখানায় কিছু না খেয়ে গেলে তো আপনাকে ছাড়ছি না সার্।

কুম্ভকর্ণ একগাল হাসিয়া বলিলেন, আবার খাওয়া? তা বেশ, চলুন।

১৩৬৩

খোকার প্রায়শ্চিত্ত

বাবা আর মায়ে অনেক তফাত। জীবন, বিশেষ করিয়া যৌবনের, মধুর ভুলগুলি বাবাদের ভবিষ্যৎ-জীবনকে সরস মধুময় করিয়া তোলে; ছেলে-মেয়েদের ভালবাসার খেলাকে তাঁহারা স্নেহ ও করুণার চোখে দেখিতে পারেন। তাঁহারা জানেন, কৈশোর যৌবনের এই পর্ব সত্বরই চুকিয়া যায়—জীবনের গুরুভার বোঝা একবার কাঁধে পড়িলে দাঁড়াইয়া ললাটের ঘাম মুছিবারও অবকাশ থাকে না।

মেয়েরা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রাক্‌বিবাহ-যুগে যদি বা কাহারও প্রতি তাঁহাদের কুমারী-চিত্ত ঈষৎ আনমিতও হইয়া থাকে, বিবাহের পরে চিরন্তন সংস্কারের বশেই সে স্মৃতি একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে তাঁহাদের বাধে না। বিবাহ না হইলে যে কাহারও প্রতি ভালবাসার সঞ্চার হইতে পারে, এ কল্পনাও পরবর্তী জীবনে তাঁহারা করিতে পারেন না। সতীত্বের মহিমময় মর্যাদা তাঁহাদিগকে সামান্য চিত্তবিকার সম্বন্ধেও কঠোর করিয়া দেয়; ফলে স্বামীকে কারণে অকারণে আজীবন খোঁটা দিয়া তাঁহারা উল্লাস অনুভব করেন; ছেলেদের 'শিব' মনে করিয়া তাহাদের বিচ্যুতি সম্বন্ধে থাকেন একেবারে অন্ধ—অথচ মেয়েদের পুতু-পুতু করিয়া সাবধানে রাখিতে গিয়া তাহাদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলেন।

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু সচরাচর আমরা ইহাই দেখি। মায়ের অত্যাচারে অরুণার জীবন ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। যৌবনে সে নিঃসংশয়ে পা দিয়াছে, পড়াশুনা যতটা করিয়াছে তাহার পিতৃকুলে মাতৃকুলে ততটা কেহই করে নাই। দাদা সপ্তাহে তিন দিন সিনেমা দেখিয়া সিনেমা-তারকাদের লইয়া অবিরত জ্যোতিষ-গণনা করিতে থাকিলেও মায়ের সেদিকে দৃষ্টি যায় না, কিন্তু তাহাদের প্রতিবেশী রমেশের সঙ্গে সে যদি দু দণ্ড বেশী আলাপ করিতে চায় তো মায়ের চক্ষুশূল হইয়া উঠে; নানা ছলছুতায় তাহাকে রমেশের সান্নিধ্য হইতে সরাইয়া তবে তিনি স্বস্তি পান। বাবা মোটেই সে রকম নন, তিনি কারণে অকারণে রমেশকে ডাকিয়া পাঠান; রমেশ আসিলে চা-জলখাবার দিবার জন্য অরুণারই ডাক পড়ে।

রমেশ অরুণার বাল্যবন্ধু সুলতার দাদা, মেডিক্যাল কলেজে ফিপ্‌থ ইয়ারে

পড়ে। এমন চমৎকার কথা বলেন আর গল্প করেন রমেশদা যে, অরুণার হুঁশ থাকে না। সব কিছুই ভুল হইয়া যায়—মনে হয়, চিরকাল রমেশদার মুখের পানে মুখ তুলিয়া থাকিলেও তাহার দেখার এবং কথা শোনার সাধ মিটিবে না। আসলে এত লেখাপড়া শিখিয়াও এবং এতখানি বয়স লইয়াও অরুণা এই কথাটা বুঝিতে পারে নাই যে, সে রমেশকে ভালবাসিয়াছে। মায়ের উপর তাহার রাগ হয়, মা অকারণে লোককে ছোট করিয়া দেখেন। রমেশদার মত মানুষ আছেন কি কোথাও? রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে অরুণা শুনিতে পায়, পাশের ঘরে মা বাবাকে তাহারই বিবাহের জন্য তাগিদ দিতেছেন, কত কি বলিতেছেন। মায়ের যেমন খাইয়া দাইয়া আর কাজ নাই! বিবাহ সে করিবে নাকি! রমেশদার সঙ্গে তাহার কথা হইয়া গিয়াছে, সে নার্স হইয়া রমেশদার ডাক্তারিতে সাহায্য করিবে।

আগে অবাধ গতিবিধি ছিল, আজকাল রমেশ সাবধান হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় আসে, "কাকীমা, কি করছেন?" বলিয়া দু মিনিট অরুণার মায়ের তদারক করিয়া অরুণার সাজা পান খাইবার জন্য উঠানে দাঁড়াইয়া থাকে। মায়ের যদি দয়া হয়, তাহা হইলে বলেন, "যাও না বাছা, মাঝের ঘরে অরুণা আছে"—তখন নিভৃতে দু-পাঁচ মিনিট আলাপ হয়। কিন্তু নিষ্ঠুরা মায়ের দয়া প্রায়শঃ হয় না, রমেশকে উঠান হইতেই বিদায় লইতে হয়।

"তাতল-সৈকতে" এই বারিবিন্দু-সম্মেলন রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না। অরুণারও সহ্য হইতেছিল না, কিন্তু সে স্ত্রী-জাতীয়, বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিয়া তাহার কিছু বলিবার অধিকার নাই। সুতরাং রমেশের উপরেই সব কিছু নির্ভর করিতেছিল। সে দিন রমেশ এক রকম মরিয়া হইয়াই আসিয়াছিল। কাকীমা রান্নাঘরের ভিতরে ছিলেন, তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া অতিশয় নিঃশব্দে সে মাঝের ঘরে প্রবেশ করিল। একবারে চমকাইয়া উঠিল অরুণা, অপ্রত্যাশিত ব্যাপার—; মায়ের খবরদারি ছাড়া রমেশ সে ঘরে ঢুকিতে পায় না। তবু যা হোক ছোট খোকা সঙ্গে আছে।

ছোট খোকা শ্রীমান নীলধ্বজ ওরফে নীলুর বয়স পাঁচ-ছয়, কিন্তু ইহার মধ্যেই মুখে খই ফোটে। অরুণা তাহার বুদ্ধির খবর রাখে, কিন্তু রমেশের সেদিন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একেবারে

অরুণার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া চুপি চুপি বলিল, আর পারি না অরু। এ কি ভাল লাগে, বল তো?

অরুণা ওষ্ঠে আঙুল স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে খোকাকে দেখাইল! রমেশ একবার চাহিয়া দেখিয়া স্থির করিল, গ্রাহ্য করিবার মত কিছু নয়। তবুও সাবধান হইবার জন্য খোকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, যাও তো ভাই, দেখ তো মিনি বেরালটা কোথায় গেল?

শ্রীমান নীলু খুঁজিবার ভান করিল এবং দরজার কাছ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া উঠানের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিল, ওই তো। কিন্তু রমেশচন্দ্রের তখন আর শ্রীমান নীলুর কথা স্মরণ ছিল না; অরুণাও কেমন যেন বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। রমেশ বলিতেছিল, আর পারি না অরু, সত্যি বলছি।

অরুণা ফিস্ ফিস্ করিয়া জবাব দিল; পার না তো ব্যবস্থা করলেই পার। মাকে বলাও কাউকে দিয়ে।

আজ সেই ব্যবস্থা করতেই তো এসেছি। বলিতে বলিতে বলা নাই, কহা নাই, বিনা নোটিসে রমেশ অরুণাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার গণ্ডদেশে ওষ্ঠাধর স্থাপন করিল। এক সেকেণ্ড মাত্র। অরুণা এক ঝটকায় দূরে সরিয়া গিয়া থর্‌থর্ করিয়া কাব্যে যাহাকে বেতসলতা বলে, ঠিক তাহার মত কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ততক্ষণ সর্বনাশ যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। শোনা গেল, শ্রীমান নীলু তারস্বরে তাহার মাতার উদ্দেশে বলিতেছে, মা, দেখে যাও, রমেশদাদা দিদিকে কামড়ে দিলে।

রমেশের ইচ্ছা হইল, ফাজিল ছেলেটাকে দাওয়ায় ধোবিপাট আছাড় মারিয়া থেঁতলা করিয়া দেয়। অরুণার ইচ্ছা হইল, ভূমিকম্পে ঘরের মেঝেটা ফাটিয়া যাক, সে রমেশদার সঙ্গে সেই ফাটলে অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু সে সব কিছু হইল না। মা হেঁসেলের দাওয়া হইতে অরুণার নাম ধরিয়া একবার ডাকিলেন, এবং অরুণা সেখানে উপস্থিত হইলে স্বয়ং মাঝের ঘরে প্রবেশ করিয়া ওই অবস্থায় যতখানি ভদ্রভাবে সম্ভব, রমেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যাও বাছা, তুমি আর এ বাড়িতে এসো না। সমাজে পাঁচজনকে নিয়ে আমাদের বাস করতে হয়। মেয়েটারও বিয়ে দিতে হবে।

রমেশ একবার ভাবিল, চলিয়া যাই। কিন্তু অরুণার মুখ চাহিয়া শান্ত ভাবেই বলিল, অরুণাকে আমি বিয়ে করব, যদি আপনারা অনুমতি দেন।

ভাবী শাশুড়ী কিন্তু পুলকিত হইলেন না ; বলিলেন, সে বাছা, পরের কথা পরে হবে, তুমি এখন যাও। আমি ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করি।

সুতরাং রমেশকে লজ্জিত, পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াই ফিরিতে হইল। পরদিন ভোরবেলায় অরুণার হস্তলিখিত এক চিরকুট মারফত এইটুকু মাত্র খবর সে পাইল যে, শাসন কঠোরতর হইয়াছে, আইনসঙ্গতভাবে তাহাদের পরস্পরের দেখা হইবার আর উপায় নাই। রমেশ তবুও হাল ছাড়িল না। অরুণার বাবার সহিত দেখা করিয়া নির্লজ্জের মত নিজেই বিবাহের প্রস্তাব করিল। বরদাবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, ডোণ্ট বি হেষ্টি মাই বয়। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বলেই যে সেটাকে সারাজীবন জীইয়ে রাখতে হবে—এমন না হওয়াই সঙ্গত। তুমি পাসটা করে ফেল, ততদিন দেখ তোমার মনের গতি পাল্টায় কি না। তা ছাড়া হট বললেই তো আর আমি মেয়ের বর খুঁজে পাচ্ছি না।

রমেশের থাকিবার মধ্যে এক বিধবা দূরসম্পর্কের মাসী ছিলেন, তিনিও অরুণার মাতার দয়ার ভিখারী হইলেন, কিন্তু কাজ কিছুই হইল না।

যাহার জন্য এত সব গোলযোগ, সেই শ্রীমান নীলধ্বজ কিন্তু নিয়মিতই যাতায়াত করিতে লাগিল। রমেশের কাছে দিদির এবং দিদির কাছে রমেশ-দাদার খবর দিলে যে তাহাদের উভয়েরই ভাল লাগিবে, এটা সে কেমন করিয়া যেন বুঝিয়া লইয়াছিল। মাঝে মাঝে রমেশের হাত ধরিয়া টানিয়া সে বলিত, তুমি এসো না রমেশদা, আমি মাকে আর কিছু বলবো না। কিন্তু 'এসো' বলিলেই যাওয়া যায় না, কারণ খোকার বলিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু তবু সেও তো মানুষ। সে দিদিকে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আঁচলে চোখ মুছিতে দেখিয়াছে। রমেশদা বিষয়ক কোনও প্রশ্ন করিলে তাহাকে কোলে লইয়া দিদি হামি খাইয়াছে। বিহ্বল হইয়া গিয়াছে শ্রীমান নীলু।

রমেশ পাত্র হিসাবে খুবই ভাল, কিন্তু তবুও মায়ের কঠিন প্রাণ কিছুতেই গলিল না। শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই। একটা ননদ কি দেওরও নাই, মেয়ে কাহাকে লইয়া সাধ-আহ্লাদ করিবে? শুধু স্বামী থাকিলেই বিবাহ হয় নাকি! ডাক্তারী পাস করিলে জামাইকে তো মাসের মধ্যে পনরো দিন রাত্রে রোগী দেখিতে ছুটিতে হইবে, তখন ওই নির্বান্ধব পুরীতে মেয়েকে দেখিবে কে? মাসশাশুড়ী—তিনি আজ আছেন তো কাল নাই। না, এ বিবাহ তিনি কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না।

মেয়ের মনে ধরিয়াছিল? ছোঃ, মনে ধরাধরি এমন অনেক দেখিয়াছেন তিনি। বিবাহের মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে ওসব পাপ ধুইয়া মুছিয়া যায়। কিছু আবার মনে থাকে নাকি! কই, তাঁহার তো অতুলদাকে আর মনেও পড়ে না; একদিন যে সাত ক্রোশ পথ ভাঙিয়া তাঁহাকে কাঁচামিঠা আম খাওয়াইত, তাহার ভাল-মন্দ কোনও খবর সম্বন্ধেই তো তাঁহার কোনও কৌতূহল নাই। ভাল থাকিলেই ভাল, না থাকিলেই বা কি। একটা দীর্ঘশ্বাসও তো বুক ভেদ করিয়া বাহির হয় না! স্বামী পুত্র কন্যার বাঁধন কি সহজ! ঃময়েমানুষের স্বর্গই তো সেই;

মা ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার মেয়েও ঠিক সেই স্বর্গই কামনা করিতেছিল; কিন্তু যৌবনের বুদ্ধি আর প্রৌঢ়ত্বের বুদ্ধিতে পার্থক্য আছে।

কোনও উপায়ই হইল না।

খোকা কিছুকাল হইতেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিল, সমস্ত সংসারের উপর কেমন যেন একটা কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। মায়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই, দিদিকে লইয়াই তাহার সংসার। সেই দিদিকে সেই দিন হইতে খোকা আর হাসিতে দেখে নাই। খোকা প্রায়ই দেখিতে পায়, দিদি পান সাজিতে সাজিতে কাঁদিতেছে, দুপুরবেলায় চারিদিক নিঝুম হইয়া আসিলে দিদি জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, খোকা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছে, তখন দিদির দুটি গাল দিয়া চোখের জল ঝরিতে থাকে। খোকা বুঝিতে পারিল, এভাবে বেশীদিন চলিবে না। মাকে বলিয়া কোনই লাভ হইবে না, মা অত্যন্ত অবুঝ। বাবা যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, খোকা তাহাও বুঝিয়াছিল, বড়দার সম্বন্ধেও নীলুবাবুর মনে কোনও উচ্চ ধারণা ছিল না। সে প্রতিনিয়ত অস্পষ্টভাবে ইহাই অনুভব করিতেছিল যে, তাহার অপরাধেই এরূপ ঘটিয়াছে, এর প্রায়শ্চিত্ত তাহাকেই করিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে খোকার জ্বর হইল। এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি করিয়া চড়িতে লাগিল, জ্বর আর নামিতে চায় না। খোকনের সমস্ত মুখখানা লাল হইয়াছে এবং থম্‌থম্‌ করিতেছে। সে চোখের পাতা খুলিয়া রাখিতে পারিতেছে না। মা আর্তনাদ আরম্ভ করিলেন, বাবা আতঙ্কিত হইলেন, এবং অরুণার বুকের চাপা কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইল। ডাক্তার তিন চার দিন ওয়াচ করিয়া বলিলেন, টাইফয়েড সন্দেহ হচ্ছে।

টাইফয়েড রোগীর চিকিৎসায় সেবাটাই আসল। মা এসব বিশেষ পারেন না, অরুণা ঠায় ভাইটির কাছে বসিয়া থাকে। বাবা অফিস হইতে আসিয়া ইজিচেয়ারে বসেন; পিতাপুত্রীতে নিশীথ রাত্রি অবধি যমের দুয়ারে পাহারা দেয়।

ছয় দিনের দিন বিকার দেখা দিল। বিছানায় ছটফট করিতে করিতে খোকা যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। মা তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাবা নীলু, কি খুঁজছ বাবা?

কে জবাব দিবে? খানিক পরেই বিকারের ঘোরে খোকা বলিতে লাগিল, দিদি, তুমি কেঁদো না, দেখ, আমি রমেশদাকে ধরে নিয়ে আসছি। কিছুক্ষণ প্রসঙ্গান্তরে গিয়া আবার বলিল, আমি কামড়ে দেবার কথা আর কখনও বলব না দিদি, তাহলে তো রমেশদাদা আসবে?

শুনিতে শুনিতে অরুণা লজ্জায় মরিয়া যায়। বাবা মায়ের দিকে চান, মা দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিতে থাকেন।

অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাইতে লাগিল; তিন চার জনে মিলিয়া রোগীকে আর সামলানো যায় না। এদিকে বিকারে রমেশ আর দিদির কথা ছাড়া কথা নাই। সকলেরই মনে এই কথাটাই সর্বদা জাগিতে থাকে, এই সময়ে রমেশের মত একজন ডাক্তারী-জানা নার্স পাওয়া গেলে বিশেষ উপকার হইত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহই তাহা বলিল না।

চৌদ্দ দিনের দিন রোগী যায় যায় হইল।—তখনও বিকারের ঘোরে রমেশদার কথা। মা আর থাকিতে পারিলেন না। আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নিজেই বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে রমেশের হাত ধরিয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া আর্তকণ্ঠে বলিলেন, বাবা, আমি অন্যায় করেছিলাম। তাই বুঝি আমার এই শাস্তি হতে চলেছে। তুমি এসেছ বাবা, আমার খোকাকে বাঁচিয়ে দাও।

দারুণ দুঃসময়েও অরুণার চিত্ত দুলিয়া উঠিল; অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আশ্রয় পাইলে মানুষের মনের ভাব যেরূপ হয় অরুণার সেইরূপ হইল। তাহার মন বলিল, যাক, রমেশদা আসিয়া গিয়াছেন, আর ভয় নাই।

আশ্চর্য, অরুণার এই মানসিক আশ্বাস বিফল হইল না। খোকার পীড়ার গতিতে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল; বিকারও কমিয়া আসিতে লাগিল, এক-আধ বার চোখ মেলিয়া চাহিতেও লাগিল। তারপর রোগী উত্তরোত্তর

উন্নতির পথেই চলিতে লাগিল ; আর ভয়ের কারণ নাই—বলিয়া ডাক্তার সংসারের উপর কালো মেঘের ছায়াটাকে অপসারিত করিয়া গেলেন।

মা আর পাহারা দেন না, বাবা রমেশ ও অরুণার হাতে রোগীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বিদায় লইয়াছেন। সেদিন দ্বিপ্রহরে সামান্য একটু পথ্য করিবার পর খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রমেশ ডাকিল, অরু!

অরুণা ছোট্ট করিয়া জবাব দিল, কি?

রমেশ তাহার একটা হাত নিজের হাতে লইয়া বলিল, আর শুধু "কি" নয় "কি গো" বলবে।

ভ্রাতার রোগমুক্তিতে আনন্দবিহ্বল অরুণা মুখ ঘুরাইয়া বলিল ; য্যাঃ।

রমেশ অরুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া পূর্বতন পাপের পুনরাবৃত্তি করিতেছে, এমন সময় রোগীকে ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে শোনা গেল, রমেশদা, তুমি দিদিকে কামড়াও, আমি আর মাকে বলব না।

লজ্জিতা অরুণা ছুটিয়া ভাইটির কাছে গিয়া তাহার মুখে হাত বুলাইয়া চুমু খাইল। খোকা আবার চোখ বুজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

* * * *

রমেশ ও অরুণা আজও পর্যন্ত ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, নীলুর সত্যই অসুখ করিয়াছিল, না, সে অভিনয় করিয়াছিল।

১৩৪৯

ভারতবর্ষের সিদ্ধি

প্রাচীন ভারতবর্ষের নিভৃত তপোবনে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যে তপস্যা করিতেন। দেবতার বরে তাঁহাদের ভাগ্যে সিদ্ধিলাভও ঘটিত। সুতরাং ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতেই সিদ্ধির প্রচলন আছে, একথা বলা চলে। গণেশ সিদ্ধিদাতা বলিয়া খ্যাত; খাতা-মহরতের সময় গণেশ-পূজা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন সর্বাগ্রে উক্ত হস্তিশুণ্ড দেবতাটিকে অন্ততঃ পাঁচ পয়সার কাঁচা সিদ্ধি নিবেদন করিতে হয়। সুদূর অতীতকালে হয়তো তোয়াঙে সিদ্ধির চাষ চলিত। ঋষি-বালক ও বালিকারা সন্ধ্যায় স্নান-আহ্নিক সারিয়া এক এক পাত্র সিদ্ধির সরবত খাইয়া পরবর্তী বেদান্ত বা উপনিষদ রচনা করিতে বসিতেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বেদ বা উপনিষদে সিদ্ধির নামগন্ধ নাই। যে বস্তুর নাম বারংবার শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে সে বস্তু সোম। দেবতারাও ভেড়ার গাত্রচর্মের ছাঁকনিতে ছাঁকিয়া অতিশয় ভক্তিভরে সোমরসের বন্দনা-গান গাহিয়া এক এক চুমুক পান করার সঙ্গে সঙ্গে অমিততেজ হইতেন। সুতরাং সোমরস যে সিদ্ধি নয় তাহা নিশ্চিত। সোমরস ছিল ব্রাণ্ডি-হুইস্কি জাতীয় অত্যুগ্র ক্ষিপ্রসঞ্চারী নেশা; সিদ্ধি সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত—ঠিক স্লো-মোশন ছবির অনুরূপ নেশা ইহার।

একবার এক খ্যাতনামা সাহিত্যিক-বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া গাঁজা খাইয়াছিলাম, একা নয় স্বদলবলে। প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে দুইটি সিংহমূর্তি আছে দেখিয়াছেন? তাহারই উপর ঘোড়া চড়ার ভঙ্গিতে গঙ্গামুখো হইয়া আমরা বসিলাম এবং আমাদের গুরু এবং বন্ধু ত্বরিতানন্দ (গুপ্তনাম বুঝিতেই পারিতেছেন) অতিশয় পরিপাটি করিয়া ছোট কলিকা সাজাইয়া লেত্তিসহ আমাদের এক একজনের হাতে দিতে লাগিল। প্রথম খানিকক্ষণ টানিয়া দেহ ও মনের বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য না করিয়া হতাশ হইতেছি হঠাৎ কেমন গোলমাল হইয়া গেল। মনে হইল নীলাকাশের চাঁদোয়া চড়াৎ করিয়া নামিয়া আসিয়া আমাদের মাথায় চাপ দিতেছে। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের উজ্জ্বল আলোগুলি (ব্ল্যাক-আউট যুগের আগের কথা) আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল, প্রত্যেকটি আলোর চতুর্দিকে জ্যোতির্মণ্ডল। সম্মুখে গঙ্গাবক্ষে রেঙ্গুনযাত্রী (হায়রে!) জাহাজগুলির আলোরও সেই অবস্থা। মনটা এমন প্রফুল্ল হইয়া

উঠিল যে মনে হইল সমস্ত পৃথিবীর গালে চুমা খাই, একটা কিছু কেলেঙ্কারী করিয়া বসি। পেটে আগুন জ্বলিতে লাগিল, ভাগ্যে ত্বরিতানন্দ বুদ্ধি করিয়া সের পাঁচেক রাবড়ি সঙ্গে লইয়াছিল, তাহা না হইলে সেদিন পরস্পর গা চাটাচাটি করিয়া কাটাইতে হইত।

অর্থাৎ, বেশ বুঝা যাইতেছে যে গাঁজাও ব্লিৎসক্রীগ জাতীয় নেশা, সোমের সমগোত্র হইলেও হইতে পারে। কিন্তু গাঁজা কলিকায় সাজিয়া ধূম্ররূপেই ব্যবহৃত হয়, সোম বাঁটিয়া ছাঁকিয়া খাইতে হইত। আসলে ভারতবর্ষের সোম, গাঁজা ও সিদ্ধি সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই; কোন গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে (অবশ্য বাংলা বিভাগ) এ বিষয়ে গবেষণা করিলে বিষয়টার একটা সুরাহা হইতে পারে।

আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতেছে ভারতবর্ষের সিদ্ধি, সোমতত্ত্ব লইয়া আমাদের সম্প্রতি মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' মহাদেব বলিতেছেন—

শুন শুন অরে নন্দী তুমি বড় ভক্ত।
সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত॥
এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।
বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই॥
ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো।
ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো॥
যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া॥
তদবধি গৃহশূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজি হৈল ইষ্ট সিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি॥
অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বারো।
ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পারো॥
মহুরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মশলা।
অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা॥
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা॥

কাণ্ডটা বুঝুন। ইহার "আফটার-এফেক্টস" কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়—

মহাদেবের আঁখি ঢুলু ঢুল।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধিশুদ্ধি হৈল ভুল ॥
নয়নে ধরিল রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
লটপট জটাজুট গঙ্গ হুলথূল।
খসিল বাঘের ছাল আলুথালু হাড়মাল
ভুলিল ডমরু সিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল ॥

ভূতপাবন দেবাদিদেব মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবেরই যদি এই অবস্থা হয়, আমরা তো সামান্য মরণশীল মানুষ মাত্র।

এই সিদ্ধি যে-ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি, সেই ভারতবর্ষের এত দুর্গতি কেন ইহাও ভাবিবার বিষয়। যাহারা সিদ্ধি হজম করে তাহারা পরাধীনতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত আছে কেন? কথিত আছে, একবার ইংলণ্ডের একজন প্রধান সেনাধ্যক্ষ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে এক বৃহৎ মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ তাঁহাকে দরবারে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ইংরেজি মতে ডিনার সম্পন্ন হইবার পর সেনাপতি সাহেবকে বিখ্যাত বাদলরামের প্রস্তুত একখিলি পান খাইতে দেওয়া হয়। দুই মিনিট চিবাইতে চিবাইতে সাহেবের কান গরম হইয়া উঠে, তিনি অস্থিরভাবে কোটের ও সার্টের বোতাম খুলিতে আরম্ভ করেন। তারপর পাখা, বরফ, সোডা, ব্র্যাণ্ডি—সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। সাহেবের জ্ঞান সঞ্চার হইলে তিনি প্রশ্ন করেন, এই বস্তু কি তোমরা সকলেই খাইয়াছিলে? উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, আমরা তো সাব্ একটা আধটা মাত্র খাইয়াছি, লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন রাণী মহারাণী ও রাজকুমারীরা প্রত্যেকেই গণ্ডায় গণ্ডায় পান খাইয়াছেন। এ অতি নিরীহ ব্যাপার! সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন, এই নিরীহ বস্তু তোমরা দেশশুদ্ধ স্ত্রীপুরুষ নিয়মিত খাইয়া বেসামাল হও না—আর আমি, বোতল বোতল স্কচ হুইস্কি "র" খাইয়া হজম করি—ইহার একটাতেই ঘায়েল হইয়া গেলাম! এমন শক্তিমান তোমরা, ইংরেজের হাতের পুতুল হইয়া আছ কেন?

সাহেবকে বলা হইয়াছিল, সাহেব, পানেই তুমি এই কাণ্ড করিলে, সিদ্ধি খাইলে না জানি কি করিতে! সাহেবের তখন মদের নেশা জমিয়াছে, মেজাজটা তো স্বভাবতই মিলিটারি। বলিলেন, আনো, আজ সিদ্ধি খাইয়াই বুঝিব, আমরা ভারতবর্ষে কি অঘটন ঘটাইতেছি।

সিদ্ধির সরবত আসিল, সাহেব এক চুমুক পান করিলেন। পরে কি ঘটিল তাহার সঠিক ইতিহাস নাই, তবে তাঁহাকে পরদিনই বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটায় দেখা গিয়াছিল ; ভারতবর্ষে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক থাকিতে সাহস হয় নাই— এইটুকু মাত্র আমরা অবগত আছি।

সিদ্ধির অঘটনঘটনপটিয়সী বহু ক্ষমতার কথা সর্বত্র প্রচলিত আছে; মাজুম, মোদক, কুলপি, গুলি, বটিকা, ভাঙ, ঠাণ্ডাই ইত্যাদি ভেদে ইহার বহুবিধ গুণবিভাগও আছে। মোদক এবং কুলপি সহজসেব্য ও সহজগ্রাহ্য বলিয়া ইহাদের কীর্তিই সমধিক প্রসিদ্ধ।

চোরবাগানের মুখুজ্জে বাড়ি ডাকসাইটে বনেদি ঘর। পুত্র কলত্র কন্যা জামাই লইয়া বৃহৎ পরিবার ; এই দুর্দিনের বাজারেও একান্নবর্তী। বিশ্বকর্মা পূজার দিন রাত্রে জামাতাদের সে বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। সেজো-জামাই চণ্ডীচরণের রসিক খ্যাতি ছিল। তিনি সন্ধ্যা নাগাদ শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হইয়া সে রাত্রে কি ভাবে রস জমানো যায় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় সম্মুখের রাজপথে কুলপি-বরফওয়ালা হাঁকিয়া গেল। চণ্ডীচরণ একটু রঙেই ছিলেন, রঙের কুলপির কথা চট করিয়া তাঁহার মাথায় খেলিয়া গেল। তখনও অন্যান্য জামাতারা আসিয়া পৌঁছেন নাই। বাড়ির সেজো-কন্যা অর্থাৎ স্বগৃহিণী সন্ধ্যাতারাকে ডাকিয়া চণ্ডীচরণ কুল্পি ভক্ষণের প্রস্তাব করিলেন। মেজো-শালাজ মাধুরী দেখিতে-শুনিতে চমৎকার, চণ্ডীচরণের স্বতঃই সরস প্রাণ মাধুরীকে দেখিলে একটু বেশী রসস্থ হইত ; আড়ালে-আবডালে পাইলে দুই একটা আন্‌পার্লামেণ্টারি রসিকতার লোভ ছাড়িতে পারিতেন না। মাধুরী সলজ্জ হাসি হাসিয়া দ্রুত পলায়ন করিত বটে, কিন্তু রাগ করিত না।

চণ্ডীচরণের অদ্যকার শিকার ছিল মাধুরী। সন্ধ্যাতারাকে কুন্‌কী হাতীর মত ব্যবহার করিয়া তিনি কুলপির মালাই বরফ খাওয়াইবার লোভ দেখাইয়া মাধুরীকে খেদায় আনিয়া ফেলিলেন। ইতিমধ্যেই কুলপিওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল—সে রঙ অর্থাৎ সিদ্ধির কুলপি মালাই বলিয়া চালাইবে। সন্ধ্যাতারার ভাগ্যে সাদাই জুটিল ; মাধুরীরটা একটু সবুজ সবুজ। কিন্তু খাইতে চমৎকার। একটু ভেজিটেবল গন্ধ-গন্ধ ঠেকিয়াছিল কিন্তু চণ্ডীচরণ কথার প্যাঁচে তাহা নির্গন্ধ প্রমাণ করিয়া ছাড়িলেন। ব্যাপারটা জানিল শুধু বরফওয়ালা এবং চণ্ডীচরণ ; সন্ধ্যাতারাও কিছু সন্দেহ করিতে পারিল না।

চণ্ডীচরণ মাধুরীকে একটু সময় দিবার জন্য পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। ভাদ্রমাস। আকাশ বেশ পরিষ্কার। চাঁদ উঠিয়াছে। গুমোট গরমের মাঝে মাঝে দমকা পুঁবে বাতাস আসিয়া মনে দিগ্বিজয়ের স্মৃতি জাগাইতেছিল। মাধুরী আর পাঁচজন বউ-ঝিয়ের সঙ্গে ছাতে গল্পগুজব করিতেছিল, হঠাৎ শাশুড়ী ডাকিলেন, মেজ বউমা, তোমার বাবা (অর্থাৎ শ্বশুর) খেতে বসেছেন, পাখা করবে এস। মাধুরী নামিয়া আসিয়া যথারীতি শ্বশুরের সম্মুখে আধঘোমটা দিয়া পাখা হাতে বসিল। শাশুড়ী রান্নাঘরে গেলেন।

শ্বশুরমহাশয় একমনে আহার করিয়া চলিয়াছিলেন, হঠাৎ গুন্‌গুন্ গান শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। ঘোমটার আড়ালে মাধুরী গান গাহিতেছে। ভাবিলেন অন্যমনস্ক হইয়া যৌবনসুলভ চপলতায় গান গাহিয়া ফেলিয়াছে, এমন কিছু দোষাবহ ব্যাপার নয়। ডাকিলেন, বউমা। বউমা একটু সামলাইয়া বসিয়া জবাব দিল, কি বাবা। কিন্তু দুই মিনিট যাইতে না যাইতেই আবার গুঞ্জনধ্বনি উঠিল—এবারে গুন্‌গুন্ নয়, স্পষ্ট গান—

চোখে চোখে রাখি হায় রে—

সর্বনাশ, পাগল হইল নাকি! কর্তা গৃহিণীকে ডাকিলেন এবং ইঙ্গিতে মাধুরীকে দেখাইলেন। মাধুরী তখন ভাবের ঘোরে "আয় না" বলিয়া লম্বা টান মারিতেছে। শাশুড়ী বিরক্ত রাগতকণ্ঠে ডাকিলেন, বউমা!

মাধুরী অবাক বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। শঙ্কিতভাবে বলিল, আমাকে কিছু বলছেন মা?

কিন্তু কথা শেষ হইতেই শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনেই সে আবার গানের অতলে তলাইয়া গেল। একে একে এধার-ওধার হইতে বাড়ির বউঝিরা উঁকঝুঁকি মারিতে লাগিল। সকলের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময়। এ কী ভয়ানক কাণ্ড! কিন্তু যাহাকে লইয়া কাণ্ড তাহার হুঁশ নাই, সমানে পাখা ও গান চালাইয়া যাইতেছে! শাশুড়ী দুই মেয়েকে ডাকিলেন, সদরে ছেলেদের কাছে খবর গেল। তারপর ডাক্তার বৈদ্য—সে এক হুলস্থুল ব্যাপার!

চণ্ডীচরণ যখন বেড়াইয়া ফিরিলেন তখন হৈ হৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তিনি সন্ধ্যাতারাকে ডাকিয়া বাড়িতে তাঁহার জরুরি প্রয়োজনের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয়, পাছে তাঁহাকে দেখিলে মাধুরী কিছু ফাঁস করিয়া দেয়। মাধুরী যে অবস্থাতেই থাক্, বেচারা চণ্ডীচরণ সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তায় নিদ্রা যাইতে পারিলেন না।

ডাক্তার-বৈদ্য হার মানিয়া গেলেন, স্টেথিসকোপ থার্মোমিটারে কিছুই ধরা পড়িল না। প্রবীণতম ডাক্তার ইহাকে পাগলামির পূর্বলক্ষণ বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। রোগীকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হইল।

মাধুরী বাকি রাতটা বেঘোরে ঘুমাইল। মেজো-ছেলের পত্নীগত প্রাণ, সে শুধু কাঁদিতে বাকি রাখিল।

বেলা আটটায় মাধুরীর ঘুম ভাঙিল। শরীরটা কেমন যেন একটু ভার-ভার। বাহিরে শরতের সোনার রোদ চনমন করিতেছে। ভারি ভাল লাগিল মাধুরীর। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল বৈঠকখানা ঘরের ছাতের দিকে। সেখানে বড়ঠাকুর অর্থাৎ ভাসুর গত বিশ্বকর্মা পূজার দিনের অবশিষ্ট মাঞ্জা দেওয়া সুতার সাহায্যে ঘুড়ি উড়াইতেছেন। বাঃ চমৎকার, ভাসুরের হাত হইতে লাটাইটা চাহিয়া লইয়া ঘুড়ি উড়াইলে তো মন্দ হয় না।

যেমনি ভাবা অমনি কাজ। প্রথম রাত্রে তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিয়া শাশুড়ী ও বাড়ির অন্যান্য বউ-ঝিয়েরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমাইতেছিলেন, স্বামী ডাক্তার-বাড়ি ছুটিয়াছেন, শ্বশুর পূজায় বসিয়াছেন। সুতরাং বাধা দেওয়ার কেহ নাই। মাধুরী তখন সিদ্ধির গৌরবে প্রায় বিবস্ত্র—শুধু সেমিজটি গায়ে আছে। সেই অবস্থাতেই সে সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া তেতলায় উঠিয়া গেল এবং অন্দর-বাড়ি ও সদর-বাড়ির মধ্যে ফাঁকটুকু ডিঙাইয়া একেবারে ভাসুরের পাশে গিয়া উপস্থিত হইল। ভাসুরের নজর ছিল আকাশে ঘুড়ির দিকে। হঠাৎ, "ভাসুর ঠাকুর, আমাকে একটু লাটাইটা দিন না" শুনিয়া এমনই চমকাইয়া উঠিলেন যে আলিসার ধারে থাকিলে তাঁহার অপঘাত মৃত্যু অনিবার্য হইত। তিনি একবার অপাঙ্গে চাহিয়া ভাদ্রবধূর ওই মূর্তি দেখিয়া আর্তকণ্ঠে "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। স্ত্রী বেলারাণী ছুটিয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্ধসুষুপ্ত বাড়িতে প্রায় ডাকাত পড়ার মত সোরগোল উপস্থিত হইল। মাধুরী ইতিমধ্যে ভাসুরের হস্তচ্যুত লাটাইটি কুড়াইয়া লইয়া একাগ্রচিত্তে ঘুড়ি উড়াইতেছে। সে এক অপরূপ দৃশ্য।

তিন দিন তিন রাত্রি পরে মাধুরীর সিদ্ধির নেশা ছুটিয়া সে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। মাঝখানের তিন দিনের ইতিহাস তাহার নিকট গোপনই রাখা হইল। চণ্ডীচরণের অপকীর্তি এবং সিদ্ধির কীর্তি প্রকাশই পাইল

না। শুধু বাড়িশুদ্ধ সকলে মেজো বউয়ের জন্য পরবর্তী দীর্ঘকাল সন্ত্রস্ত হইয়া রহিলেন।

ভারতবর্ষের সিদ্ধির আর একটি মহিমার কথা উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। দর্মাহাটার বিখ্যাত ঘোষ বংশের রাজা বাহাদুর অবনীভূষণের পুত্র অমিয়ভূষণ আমাদের বন্ধু। তাহার কল্যাণে আমাদের প্রায়ই সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ গুড ব্যাড আহার্য ও পানীয় লভ্য হইত। বড়লোকের ছেলে, লেখার বাতিক ছিল, কবিতায় ও ছোটগল্পে তাহার হাতও খুব মিঠা, সুতরাং কিছু মোসাহেবিতে আমাদের আনন্দের খোরাক জুটিত।

বৎসর দুই হইল আমাদের এক সাহেব বন্ধু জুটিয়াছে, নাম এডওয়ার্ড ব্রাউন, লণ্ডনের এক শহরতলীতে তাঁহার বাড়ি। অতি চমৎকার লোক। যুদ্ধব্যপদেশে বড় রকমের চাকরি লইয়া এদেশে আসিয়াছেন। প্রথমটা দেশী লোকদের নিকট হইতে একটু তফাতে তফাতে থাকিতেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর প্রায়ই আমাদের এদিকে আসেন এবং নানা গল্পগুজবে তাঁহার ও আমাদের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের পরিচয় ঘনীভূত হয়। তিনি বর্তমানে আমাদের পরম বন্ধু হইয়া উঠিয়াছেন। মাস্টার রাখিয়া বাংলা শিখিতেছেন, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ আয়ত্ত হইয়া আসিয়াছে।

একদিন টেলিফোন যোগে দর্মাহাটা হইতে অমিয়ভূষণের নিমন্ত্রণ আসিল —একটি ছোটগল্প সমাপ্ত হইয়াছে, আমাদিগকে শুনিতে হইবে। এডওয়ার্ড তখন আমাদের এখানেই ছিলেন। তাঁহাকে বলিতেই তিনিও আমাদের সঙ্গী হইতে রাজি হইলেন।

অমিয়ভূষণের বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি আমাদের বিখ্যাত মৌখিক গল্পবিদ ছোট্কুদা আসর জমাইয়া আছেন। সেদিন অভ্যর্থনা দেশী মতে হইতেছিল। প্রত্যেকেরই সম্মুখে কাচের গেলাসে সবুজ স্নিগ্ধ পানীয় সিদ্ধিদাতা গণেশের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছিল। হৈ হৈ সম্বর্ধনা শেষ হইলে আমরা প্রত্যেকে এক একটি তাকিয়া আশ্রয় করিয়া বসিলাম, এডওয়ার্ডও জুতা খুলিয়া অস্বস্তির মধ্যেই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন। পরিচয় শেষ হইতে না হইতেই আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সবুজ পানীয় আসিল। আমি এডওয়ার্ডকে সাবধান করিয়া দিলাম; বলিলাম, ভারতবর্ষের রাজত্ব তোমাদের সহিলেও সিদ্ধি সহিবে না। এডওয়ার্ড হাসিয়া বলিলেন, চেষ্টা করে দেখিই না। বারণ করিলাম না।

সিদ্ধি প্রস্তুত হইয়াছিল চমৎকার। এ বিষয়ে অমিয়ভূষণের খাস বেয়ারা মহেন্দ্র সিং ঠিক নন্দীর মতই ওস্তাদ। এমন সুন্দর বাটা হইয়াছিল যে দু চুমুক পেটে যাইতে না যাইতেই বিপুলকায় ছোট্‌কুদাকে পরী বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। এডওয়ার্ডকে আড়চোখে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতেছিলাম। হাজার হোক, রাজার জাত। মিচকি মিচকি হাসিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন—বুঝিতে পারিলাম। অমিয়র এক পিসতুতো ভাই একটা বেলেল্লা গান গাহিতেছিল, দেখিলাম গানের তালে তালে এডওয়ার্ডের মাথা নড়িতেছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিক যে তাঁহার এতখানি আয়ত্ত তাহা জানা ছিল না। হঠাৎ চমকিত হইলাম, এডওয়ার্ড বলিতেছেন, বাঃ, বেড়ে, তোফা! অবাক কাণ্ড! বর্ণপরিচয়ের কর-খল পর্যন্ত যাহার বিদ্যা, "নমস্কার, ভাল আছেন?" এই তিনটি কথা ছাড়া যিনি বাংলা জানেনই না, তাঁহার কি সিদ্ধি-মহিমায় দিব্যদৃষ্টি লাভ হইল?

দেখিতে দেখিতে রাত্রি নটা বাজিল, এডওয়ার্ডের ব্যারাকে ফিরিবার পালা। অমিয়ভূষণ গাড়ি বাহির করিতে হুকুম দিল, তাঁহাকে দমদম পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। রাত্রে একটু গুরু রকমের ভোজের আয়োজন হইতেছিল, আমরা রহিয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেকও অতিক্রান্ত হয় নাই, আমাদের গল্প এবং পারস্পরিক প্রেম খুব নিবিড় হইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ একসঙ্গে দশ-বারোটা জিপ-গাড়ি অমিয়দের কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিতেছে এইরূপ অনুভব হইল। তারপর একটা ডাকাত পড়িবার মত হৈ হৈ—আমাদের নেশা প্রায় ছুটিবার উপক্রম। কিছু ঠাহর হইবার পূর্বেই দেখি এডওয়ার্ডকে পুরোভাগে রাখিয়া একদল (প্রায় শতখানেক) গোরা সৈন্য মার্চ করিয়া উঠান অতিক্রম করিতেছে। কী সর্বনাশ! অমিয় কাঁচুমাচু হইয়া আমার দিকে চাহিল—আমি তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলাম। এডওয়ার্ড মাঝপথে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমার এই বন্ধুদেরও ওই বস্তু একটু করে খাওয়াতে হবে ভাই, আজ বুঝতে পারছি ভারতবর্ষের সিদ্ধি না খেলে ভারতবর্ষে আসাই বৃথা। ইংরেজদের তোমরা এতকাল এই বস্তুর আস্বাদ দাও নি বলেই এখনও তারা তফাত থাকতে পেরেছে। আমি মাইরি, তফাত ঘোচাব।

প্রকাণ্ড হল-ঘর, সকলেই মোড়ায় চেয়ারে ফরাশে মেঝেয় কোনও রকমে বসিল। বড়লোকের বাড়ি, কাঁচা সিদ্ধির অভাব ছিল না, দারোয়ানও পাঁচ-

পাত গণ্ডা ছিল, সুতরাং সিদ্ধি আসিতে বিলম্ব হইল না। সকলের হাতে এক এক গ্লাস স্বয়ং পরিবেশন করিয়া ঈষৎ স্খলিতকণ্ঠে এডওয়ার্ড যখন বলিয়া উঠিলেন—লুক, মাই ফ্রেণ্ডস, দিস ইজ দি রিজন হোয়াই ইণ্ডিয়া শুড বি ফ্রি (শোন বন্ধুবর্গ, ভারতবর্ষকে স্বাধীন যদি করতে হয়, এই কারণেই করতে হবে)। নাউ বন্দে মাতরম্। অমিয়র পিসতুতো ভাই বন্দেমাতরম্ গান ধরিল। আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতের ভাবী স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করিলাম।

১৩৫০

থলি কখন নিঃশেষে উজাড় হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই ; মাথা ঠুকিয়া রসরচনা প্রস্তুত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিলাম।

পূজার বাজার। বৎসরান্তে একটি করিয়া সচিত্র হাসির টর্পেডো ছাড়িয়া থাকি ; বড় বড় দেশী বিলাতী ডিগ্রীধারী নামজাদা পণ্ডিতদের ভারী ভারী মানোয়ারী জাহাজের মত রেফারেন্স-ফুটনোট-কণ্টকিত প্রবন্ধগুলা সেই টর্পেডোর আঘাতে কোথায় যে তলাইয়া যায়—সম্পাদক মহাশয় গরুড়ের মত হাতজোড় করিয়া আসিয়া বলেন, এবারেও একটা চাই কিন্তু, আগে থাকতে বলে রাখছি।

কবিতা ?

আজ্ঞে না, কবিতা নয়। গদ্য-কবিতা চল হবার পর থেকেই কবিতার দর পাটের মত হুহু করে নেমে যাচ্ছে। কবিতা দেখলেই লোকে ভয়ে পাতা উলটে যায়। লেখবার বিষয়ের অভাব কি ? এই এত বড় একটা মামলা প্রায় নিষ্পত্তি হয়ে গেল ; আবার একটা শুরু হয়েছে ঢাকায়—

সবেগে মাথা নাড়িলাম। মামলা লইয়া আর নয়। একবার একটা সাব-জুডিস মামলা লইয়া রসিকতা করিতে গিয়া নগদ আড়াইশ টাকা খেসারত দিয়াছি—পাঁচ বছরের পূজার রোজগার। তাহার চাইতে আপন শ্যালিকাকে লইয়া গল্প লেখা এ যুগে নিরাপদ। বিংশ শতাব্দীর গৃহিণীরা আর তেমন অবুঝ নাই। বলিলাম, ফরমাশ করবেন না, চেষ্টা করে দেখি একটু।

সম্পাদক মহাশয় ভরসা পাইয়া চলিয়া গেলেন। তখনও হাতে ঢের সময় ছিল। কিন্তু আমি কাজ আগাইয়া রাখিতে ভালবাসি। বিড়ি, সিগারেট, চা, পেস্তাবাদাম এবং বায়োকেমিক কেলি ফস প্রভৃতি কল্পনা-উদ্দীপক যাবতীয় আয়োজন হাতের কাছে লইয়া চেষ্টা করিতে বসিলাম।

থলি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে ; চেষ্টা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বচ্ছন্দে স্বপ্ন দেখিতে পারিতাম। বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্ন দিয়া 'বিষবৃক্ষ' পত্তন করিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখিয়া 'রাজর্ষি' লিখিয়াছেন ; গিরীন্দ্রশেখর 'স্বপ্নে'র উপরেই একটা থীসিস লিখিয়া ফেলিয়াছেন ; এ অধমও

অনেক স্বপ্নের সাহায্যে বাস্তব খানাখন্দর ডিঙাইয়া আসিয়াছে কিন্তু এ যুগে স্বপ্নের কাজ সিনেমায় করিতেছে। আসল স্বপ্নের কদর নাই। সুতরাং নিদ্রিত অবস্থাতেই সামলাইয়া লইলাম।

ঘুম ভাঙিলে কড়া এক কাপ চা খাইলাম এবং সিগারেট ধরাইয়া উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ভাদ্র মাস, তিন দিন গুমট গরমের পর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল. পথে জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দোতলায় আমার লেখার স্টুডিও; চৌকিতে বসিয়া রাস্তা দেখা যায় না কিন্তু পথে উৎসাহী অথবা নিরুপায় পথিকের ছপছপ পদক্ষেপ কানে আসিতেছিল। মাঝে মাঝে হুস্ হুস্ শব্দে জল ঠেলিয়া দুই একটা মোটরকারও যাতায়াত করিতেছিল। সামনের মাঠে এক-জোড়া স্থূলবপু শীর্ণশির পামগাছ আধা-আধি ভিজিয়া হরগৌরী মূর্তিতে ঝড়ের দাপটে মাথা নাড়িতেছিল; পাশের নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত ছাতম গাছটি বৃষ্টিস্নাত কাক-কলরবে মুখর। সামনের তেলকলের চিমনির ধোঁয়া ভিজিয়া ভারী হইয়া দ্রুত মিলাইয়া যাইতেছে। পথের ওপারের বাড়িগুলির সকল বাতায়ন-পথ রুদ্ধ। আমাদের সঙ্গীতবিশারদ প্রতিবেশীটি হারমোনিয়ম সহযোগে তারস্বরে "এমন দিনে তারে বলা যায়" গাহিতেছিলেন; তাঁহার সমঝদার সিগারেট-চা-বন্ধুরা দোহার্কি করিয়া ও টেবিল বাজাইয়া পাড়ার ভিজা বাতাসকে কিঞ্চিৎ চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। চিমনির ধোঁয়া অদৃশ্য এবং কাক-কলরব স্তব্ধ হইল। পাড়ার ছেলেরা জলকাদাবৃষ্টি অথবা মায়ের উপরোধ উপেক্ষা করিয়া ফুটবল খেলিতেছিল; তাহারাও এরিয়ান-মোহনবাগান কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল। "নিভৃত নির্জন চারিধার" করিয়া সঙ্গীত-বিশারদও বাহির হইয়া গেলেন। ভাদ্র-সন্ধ্যার ভিজা অন্ধকারে চারিদিক থমথম করিতে লাগিল। গাঢ় তিমিরের মধ্যে অদূরবর্তী বাতায়নের রন্ধ্রপথে ভিতরের বিজলী আলো মাথা খুঁড়িয়া মরিতে চাহিতেছিল।

ও হরি, হালকা রচনা বুঝি এই। বর্ষার সুযোগ লইয়া যাদুকরী কাব্যলক্ষ্মী আমার প্রশস্ত স্কন্ধে অজ্ঞাতসারে আসিয়া ভর করিয়াছেন, ভাজা পাঁপরের মত মুচমুচে মনটা কখন তেলে-ভিজা সলিতার মত নেতাইয়া আসিয়াছে বুঝিতেই পারি নাই, হঠাৎ অনুভব করিলাম মগজের ভিতর উপমা ও মিল কিলকিল করিতেছে—

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ অব্দে,
বহে জল কলকল ছলছল শব্দে।
বর্ষা-আকাশ ঘন মসী অবলুপ্ত,
নিঃঝুম চারিধার শহর কি সুপ্ত ?
সহসা মধুর স্বর পশে আসি কর্ণে,
জল ঢুকিয়াছে কার মোটরের হর্ণে !

নাঃ, এই অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিলে সম্মুখের বাতায়ন-পথে এক-আধ জোড়া সুঠাম বলয়িত বাহুও দেখিয়া ফেলিতে পারি। একই পাড়ায় অনেককাল বাস করিতেছি—সুতরাং পূজ্যপাদ অশ্বিনী দত্ত মহাশয়কে স্মরণ করিলাম। হালকা রচনা ধামাচাপা থাকিল। মনটাকে হালকা করিবার জন্য কলেজ স্ট্রীটে পুরাতন বইয়ের সন্ধানে বাহির হইলাম।

এই দরিদ্র লেখকের এটি একটি রাজসিক বিলাস। সস্তার প্রলোভনে অমিতব্যয়িতার গভীর গহ্বরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইবার এমন সহজ উপায় আর নাই। একই সঙ্গে ঋণভারগ্রস্ত ও দুরন্ত বল্মীককুলের আশীর্বাদভাজন হইবার ইহাই একমাত্র পথ। দস্যু রত্নাকর সম্ভবত পুরাতন-পুঁথি সংগ্রহ করিয়াই শেষ পর্যন্ত বাল্মীকি হইয়াছিলেন, অন্তত, এই বর্ষায় আমার পুরাতন বইয়ের গুদামে উইয়ের "হুন"সুলভ অত্যাচার দেখিয়া সেইরূপই ধারণা হইয়াছিল। অধ্যয়ন-তপস্যায় আর একটু বনেদী হইলেই আমাকেও একদিন উইঢিপি ঠেলিয়া বাহির হইতে হইবে। হুন বলিলাম অনেক দুঃখে; ইহারা যে শুধু বেয়নেটধারী পদাতিকের মত সামনাসামনি আক্রমণই করে তাহা নয়, কখনও হেঙ্কেল বিমানের মত উপর হইতে, কখনও বা ইউ-বোটের মত অতল অদৃশ্যলোক হইতেও আক্রমণ চালাইয়া থাকে; প্যারাসুট-বাহিনী দেখি নাই। কিন্তু উর্ধ্ব শিলিংয়ের শূন্যলোক হইতে মেঝের নিরাপদ তাকের উপর রক্ষিত বইয়ের গাদায় নিঃশব্দে উই-বাহিনীর অবতরণ দেখিয়াছি। এই সর্বনাশা জীবেদের আক্রমণে কত বহুমূল্য সস্তা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দুষ্প্রাপ্য বই যে দুষ্প্রাপ্যতর হইয়া উঠিতেছে, "দুষ্প্রাপ্য"-বিশারদ ব্রজেনদাদাও তাহার সন্ধান জানেন না।

অথচ নেশা এমনই পদার্থ যে, এত জানিয়া শুনিয়াও উই-সম্প্রদায়ের সমধিক প্রিয় সেই পুরাতন বই সংগ্রহেই বাহির হইলাম। রাস্তার ধারে ফুটপাতে অথবা দেওয়ালগাত্রে সজ্জিত ভাগার কারবার আজ ছিল না; পাকা

বনেদী ওল্ডবুক শপেই যাইতে হইল। এই আড়কাঠিগুলির সঠিক পরিচয় যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা ভাগ্যবান। দোকানের মালিকেরা নিরক্ষর হইলেও কেতাবাদির মূল্য ও মহার্ঘতা সম্বন্ধে আশ্চর্য রকম ওয়াকিবহাল; কোন্ বই হঠাৎ কখন এবং কি কারণে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, সাধারণ পণ্ডিতজনের অপেক্ষা সে খবর ইহারা বেশীই রাখিয়া থাকে; দু-আনার বই বেচিয়া দশবিশ টাকা হামেশাই আদায় করিয়া লয়। মাইফেলের রাত্রে কাপ্তেনবাবুরা যেমন দশ টাকা পাইয়া বিনা দ্বিধায় হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া দেয়, পুরাতন বইয়ের নেশা-খোরেরাও তেমনি দাঁও মারিলাম ভাবিয়া ধীরে ধীরে সর্বনাশের পথে আগাইয়া যায়; সামনে বই দেখিলে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান তাহাদের থাকে না। পথের ভাগাওয়ালারা এককালে নিরীহ ছিল; বনেদী ওল্ডবুক শপের প্রভাবে তাহারাও ক্রমশ চালাক অর্থাৎ মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে।

বসির মিঞার দোকানে খরিদ্দারের ভিড় ছিল না। বর্ষার দিনে দেলখোস কেবিনের দিকেই ক্রেতারা সহজে আকৃষ্ট হইতেছে। বসির মিঞা জলসিক্ত কাকের মত অত্যন্ত সাধু মুখভাব লইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত টুলটিতে বসিয়া আছে, আর তাহার অ্যাসিস্টাণ্ট উৎসাহী বড়বাবু নিবিষ্ট মনে রাজ্যের বইয়ের তালিকার কার্বন কপি করিয়া চলিয়াছেন। প্রাচীন এবং আধুনিক ক্যাটালগ পরিবৃত তাঁহাকে দেখিলেই আমার চিত্রগুপ্তের কথা মনে হয়। কোন্ কোন্ বই জীবলোক হইতে মৃত্যুলোকে প্রবেশ করিতেছে, তাহার সঠিক হিসাব রাখাই তাঁহার কাজ; জীবলোকে কাহার কি মূল্য ছিল, তাহারও হিসাব তাঁহাকেই রাখিতে হয়। যমলোকে লাশের দাম কষিবার ভার স্বয়ং যমরাজ বসির মিঞার। এ বিষয়ে তাহার ধৈর্য ও প্রজ্ঞা অসাধারণ। মাঝে মাঝে দুই একজন আধুনিক নচিকেতা প্রশ্নে প্রশ্নে যমরাজকে বিব্রত করিতেছে দেখিয়াছি। কোনও ব্যঙ্গরসিক কবি মডার্ন কঠোপনিষৎ রচনা করিলে বাংলা সাহিত্যের উপকার হইতে পারে।

আমাকে দেখিয়াই বসির মিঞা সোল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল; যেন এতকাল শবরীর মত সে আমারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। বড়বাবু একবার কার্বন কপি হইতে মাথা তুলিয়া কপালে হস্তস্পর্শ করিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। আমি নেটিভ-স্টেট পরিদর্শনকারী বড়লাটের মনোভাব লইয়া যথেচ্ছ ঘুরিয়া ফিরিয়া জীবিত ও মৃত বইগুলি দেখিতে লাগিলাম। সম্পাদক মহাশয়ের

তাগিদ স্মরণ করিয়া মনটা একটু উদ্বিগ্ন ছিল; আমাদের প্রাত্যহিক রসালাপ তেমন জমিল না।

চীনা ভাষায় লেখা একটা ছবির বই উপরেই ছিল, হাতে ঠেকিল। চমৎকার ছবি। ছবি বুঝিবার জন্য ভাষাজ্ঞান অনাবশ্যক। পাতা উলটাইতে উলটাইতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিঞার দিকে চাহিলাম। বসির বলিল, নিয়ে যান, খুব সস্তা। অন্য কেউ হলে দশ টাকা চাইতাম, আপনি পাঁচ টাকা দেবেন। আমিও চিরাচরিত অভ্যাসমত একটু হাসিয়া বলিলাম, তার চাইতে সাফ বলে দাও, তোমার দোকানে আর আসব না।

মুখখানা বেগুনের মত করিয়া বসির বলিল, বললে তো বিশ্বাস করবেন না কত্তাবাবু, মাইরি বলছি, আজই দুপুর বেলায় এক বেটা চীনে এসে চার টাকা আদায় করে নিয়ে গেছে। লোকটা নাছোড়বান্দা। বললে কি জানেন? লাখ টাকার মাল চার টাকায় দিয়ে গেলাম। বেটা ঘুঘু কোথাকার!

ঘুঘু তুমিও কম নও। বলিয়া বইটা বগলে পুরিলাম। চিত্রগুপ্তে যমে চোখে চোখে টরেটক্কা হইয়া গেল, বড়বাবু কার্বন কপি সমেত একটা ভাউচার সম্মুখে ধরিলেন। আমি ছোট্ট একটি সই করিয়া টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

ট্রাম বন্ধ। বাসে আমাদের চিত্রশিল্পী কীর্তনবিশারদ ফণী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হইল। কুশলবার্তার পর সদ্যসংগৃহীত বইটির দিকে তাঁহার নজর পড়িল। হাতে লইয়া পাতা উলটাইয়া দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন, অদ্ভুত ছবি; কিন্তু মজা দেখুন, প্রত্যেকটা ছবিই কোনও না কোনও জায়গায় অসম্পূর্ণ। এ অজ্ঞানকৃত ভুল নয়, স্বেচ্ছাকৃত, ডেলিবারেট। খুব উঁচুদরের শিল্পীর আঁকা তাতে সন্দেহ নেই। কোনও চীনেম্যানকে ধরে কারণটা জেনে নিলে হত।

বইখানার জন্য চক্রবর্তী মহাশয়ের চক্ষু যেরূপ লালাসিক্ত হইতেছিল, আমার ভয় হইল, বুঝি বা ধার চাহিয়া বসেন। প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলাম, বই তো রইলই আমার কাছে, ধীরে সুস্থে দেখানো যাবে। তা এই দুর্যোগে বেরিয়েছিলেন কোথায়?

আর বলবেন না মশায়, কর্মভোগ! বাসা থেকে একটা ঘড়ি চুরি গেছে। জাপানী টাইমপীস একটা, বড়জোর দুটো টাকা দাম হবে। চেপে গেলেই হ'ত। এ অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কিঞ্চিৎ খাতির আছে, তাঁর কানে কথাটা

ভুলেই ফ্যাসাদে পড়েছি। এখন কর থানা আর বাড়ি। এর পরে কোর্ট তো আছেই!

তাঁর কাছেই গেছলেন বুঝি?

গেছলাম নয়, তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। চোর ব্যাটা ধরা পড়েছে। যা ভেবেছিলাম তাই, কোকেন-খোরের কাণ্ড!

পেলেন ঘড়ি?

চক্রবর্তী মহাশয় আমার অজ্ঞতায় দৈহিক কাতরতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আরে মশায়, সে তো এখন বিশ বাঁও জলে। মামলা শেষ হোক, তার পরে। অনেক দিনের ঘড়ি, দমটা যাতে নিয়মিত দেয় সেই অনুরোধ করে এলাম। কাজ শেষ হয়েছে সে কোন সন্ধ্যেয়, পুলিসের কর্তা আমাকে মোটরে তুলে নিয়ে কোকেনের একটা চোরা আড্ডার খোঁজে গিয়েছিলেন। খবর পেয়েছেন সেই ঘড়ি-চোরের কাছে।

দেখলেন কোকেনের আড্ডা?

দেখলাম বলে দেখলাম, একেবারে তাজ্জব বনে গেছি মশায়। চীৎপুরের দই-সন্দেশ-রাবড়ির দোকান। পুলিসের কর্তা তো গাড়িতেই শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন আমাকে। আমি সেখানে গিয়ে ক্ষীরের নাড়ু চাইলাম। দোকানী সন্দিগ্ধভাবে বারকয়েক আমার দিকে চাইতেই শিক্ষামত একটু বাঁকা হাসি হেসে বললাম, একটু দামী জিনিস দিও কর্তা। দোকানী ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে, ঠিকানা কি? বললাম, কাঁকুড়গাছি। বলেই ঝনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিলাম তার পরাতের ওপর। ক্ষীরের নাড়ু হাতে নিয়ে সুট করে বেরিয়ে এলাম। একটা নাড়ুর দাম এক টাকা। পুলিসের কর্তা গাড়ি নিয়ে দূরে একটা গলির মোড়ে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি নাড়ুটি ভেঙে দেখিয়ে দিলেন, আসলে ওটি কোকেনের নাড়ু। বেটাদের সাহসকে বলিহারি যাই। বাছাধন রাবড়িওয়ালা এবারে ফাঁসলেন বোধ হয়। যাঃ, ভুলেই গেছলাম, পান আছে সঙ্গে, নিন একটা।

ডিবা হইতে একটি পান তুলিয়া লইলাম। হেদোর মোড়ে চক্রবর্তী মহাশয় নামিয়া গেলেন। পানটা একটু কষা কষা ঠেকিতেছিল, একটু চুণ পাইলে হইত। চীৎপুরের ক্ষীরের নাড়ুর কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, ট্রামডিপোর কাছাকাছি গিয়া জ্ঞান হইল। নামিতে গিয়াই একজন চীনাম্যানের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হইয়া গেল, লোকটা সেই

বাদলাতেই কাপড়ের বোঁচকা পিঠে লইয়া মন্থরগতিতে চলিয়াছিল, বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিলাম।

চীনা ছবির বইটি আমার "অমনিবাস"-লাইব্রেরির একটা তাকে আশ্রয় পাইল।

*　　　*　　　*

তোড়জোড় করিয়া লিখিতে বসিয়াছি, নীচে বিজাতীয় হাঁকডাকে বিরক্ত হইয়া নামিয়া আসিলাম। একজন ধোপদুরস্ত চীনাম্যান বাড়ির মালিকের সন্ধান করিতেছে। ব্যাপারখানা কি? চীনা ছবির বই কেনা ইস্তক ঘুরিয়া ফিরিয়া কোকেন আর চীনাম্যানের ছোঁয়াচ লাগিতেছে। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'চীনের ড্রাগন' পড়া ছিল। কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। একটু বিরক্তভাবেই প্রশ্ন করিলাম, কি চাই?

চীনাম্যান হোয়াইট অ্যাণ্ট অর্থাৎ উইয়ের অব্যর্থ মারণাস্ত্রের সন্ধান জানে; সে আমার লাইব্রেরি ঘরের উই-বিতাড়ন করিবে; পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক নামমাত্র।

আমার সাহিত্য-জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার সমাধান করিবে এই চীনাম্যান! উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। তবু সন্দেহটা মনের মধ্যে ছিল; প্রশ্ন করিলাম, বাবাজী, এ অধীনের খবর পেলে কোথায়?

বসির মিঞা সন্ধান দিয়াছে। কলিকাতায় এই ব্যবসা সে অনেকদিন ধরিয়াই করিতেছে—হতভাগ্য আমিই কেবল কিছুই জানি না।

মশার ধূপের আবিষ্কারক বলিয়া চীনাদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। উই-নিপাত সম্ভব হইলে একমাত্র উহারাই পারিবে।

রাজি হইয়া গেলাম, কিন্তু খরচের একটা আন্দাজ চাহিলাম।

তাহাতেও আটকাইবে না। পূজার পরে কাজ আরম্ভ করিতে বলিলাম। এখন বিশেষ কাজের ভিড়। কিন্তু লোকটার যুক্তি অন্যরূপ, সে বলিল, উই মারিবার ইহাই মরসুম। বর্ষার পরে শরতের রোদ ফুটিলেই উইয়েরা পূর্বকালের রাজাদের মত দিগ্বিজয়ে বাহির হয়। এই সময়টা তাহারা একটু বিহ্বল ও বেপরোয়া থাকে। শীত আসিয়া পড়িলেই সাবধান হইয়া যায়।

বইগুলার প্রতি মায়া ছিল। আর আপত্তি করিলাম না। কিন্তু বই-আলমারি লইয়া ধস্তাধস্তি করিতে গিয়া সম্পাদকের কাছে প্রতিশ্রুতি

আর পালন করা হয় না। অনেকদিন আগে খরিদ করা অধুনা-বিস্মৃত বই-গুলির পাতা উলটাইতে থাকি, দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয়জন-সমাগমের আনন্দ হয়।

চ্যাং চুয়ান কাজের লোক, একটি সেকেণ্ড সে নষ্ট হইতে দেয় না। নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যায়। আলমারিগুলিতে একটা দুর্গন্ধ তেল মালিশ করিতে করিতে বলে, বাবুজী, এত সব বই আপনি পড়েন? এত খরচ—

একটা আত্মপ্রসাদী সবজান্তাগোছ হাসি হাসি। বেচারার দোষ কি। জুতার চামড়া বাঁচাইবার জন্য যাহারা হাজার হাজার বছর ধরিয়া সমগ্র মেয়েজাতটাকেই পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল, চ্যাং তো সেই জাতের লোক! এই সামান্য ব্যাপারটাকেই সে বিলাসিতা মনে করিতে পারে।

হঠাৎ সেই চীনা ছবির বইটার কথা মনে পড়িয়া গেল, চ্যাংকে প্রশ্ন করিলাম, চীনা ভাষা জান?

এবারে চ্যাং চুয়ানের হাসিবার পালা। আমার অজ্ঞতায় চ্যাং চুয়ান হাসিল। বলিল, ওই দেবভাষা কি কেউ জানে সার্? বড় বড় পণ্ডিতেরা পাঁচ-সাতশোর বেশী শব্দ জানেন না। এ অধীন জানে একশো তেরটি।

তুমি তো তা হলে পণ্ডিত দেখছি। তুমিই পারবে।

বইটা একটু সামলাইয়া রাখিয়াছিলাম। চ্যাংয়ের হাতে দিয়া বলিলাম, দেখ তো কোনও হদিস পাও কি না?

চ্যাং পাংলুনের পকেট হইতে একখণ্ড চামড়া বাহির করিয়া পরিপাটি করিয়া তাহাতে হাত মুছিল এবং শ্রদ্ধার সহিত বইটি হাতে লইয়া পাতা উলটাইতে লাগিল। আমি আসামীর ভঙ্গীতে হাকিমের রায় শুনিবার জন্য সাগ্রহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্রমশ অনুভব করিলাম চ্যাংয়ের চোখ দুটি জ্বলিতেছে। সে একটু অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চ্যাং সহসা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল, সর্বনাশ!

দীনেন্দ্র রায়ী অভিজ্ঞতায় ভয়ে আমার রক্ত তখন হিম হইয়া আসিয়াছে। বলিলাম, সর্বনাশ কি হে, ড্রাগন-ফাগন নয় তো?

একটু ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া চৈনিক বৌদ্ধ চ্যাং লজ্জিত হইয়াছিল, সে শান্ত ভাবে বলিল, তার চাইতেও ভয়ঙ্কর। বাবুজী, এ পুঁথি আপনি পেলেন কোথায়?

আদ্যোপান্ত ইতিহাস বলিলাম। বসির মিঞার জন্যই শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে

অপঘাত-মৃত্যু আছে দেখিতেছি। একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, ব্যাপার কি, খুলে বল চ্যাং। আর দগ্ধে মেরো না।

চ্যাং যাহা বলিল, তাহা সাংঘাতিক। পৃথিবীর এক সম্প্রদায়ের লোকের কাছে এই পুঁথি ভগবান বুদ্ধের দন্তের চাইতেও মূল্যবান, ড্রাগন কোন্ ছার! এই পুঁথিকে স্বর্গরাজ্যের চাবি বলা হয়। এই পুঁথি হারাইয়া তাহারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ ক্ষিপ্ত হইয়া ইহার সন্ধান করিতেছে;. যেখানে যাহার কাছেই থাক ইহা তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবেই। ইহার জন্য কোনও মূল্যই তাহাদের অদেয় নয়—খুন, জখম,রাহাজানি—

আমি আর্তনাদ করিয়া বলিলাম, থাম থাম। আর একটু বিশদ করে আসল ব্যাপারটা খুলে বল তো।

চ্যাং এতটুকু বিচলিত না হইয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া গেল, শ্যাম ইন্দোচীন জাভা সুমাত্রা বার্মা ভারতে যেখানে যেখানে কোকেনের গুপ্ত কারবার আছে, এই বইয়ে কৌশলে সেগুলির সন্ধান দেওয়া আছে, এই আড্ডাগুলির সমবেত নাম 'দক্ষিণ-পূর্ব স্বর্গসমূহ'। প্রত্যেক স্বর্গে ঢোকবার স্বতন্ত্র চাবি অর্থাৎ সঙ্কেত। প্রত্যেক স্বর্গের আইন-কানুনও এতে দেওয়া আছে। বইটা ঠিকানা ভুল করল কি করে তাই ভাবছি।

সে কথা পরে ভেবো 'খন চ্যাং, এখন আমার উপায়?

চ্যাং উর্ধ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া শান্ত কণ্ঠেই বলিল, উপায় এখন সেই নির্বাণ-ধন্য পুরুষ বুদ্ধ। চ্যাং উদ্দেশে নমস্কার করিল। পরে একটু ভাবিয়া বলিল, চীনাপাড়ায় যে কোনও জায়গায় এটা ফেলে দিয়ে আসুন স্যার, ওদের লোক সর্বত্র আছে, ঠিক খুঁজে নেবে।

কিন্তু অমন চমৎকার ছবিগুলো!

ছবি ও নয় বাবুজী, প্রত্যেক ছবির গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে, হয়তো মালঘরের সন্ধান ওই ছবিতে আছে। আপনার কোনও কাজে লাগবে না, অথচ ওর জন্যে প্রাণ খোয়াবেন?

শিল্পী ফণী চক্রবর্তীর চীৎপুরের ক্ষীরের নাড়ু মনে পড়িল। কি কুক্ষণেই যে সেই বাদলায় বাহির হইয়াছিলাম। আশ্চর্য যোগাযোগ!

তবু সাহিত্যিকের মন, এমন একটা অপূর্ব বস্তু হাতে পাইয়া তাহার ব্যবহার করিব না. সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাহাতে মন সায় দিল না। অনেক দিন হইতেই কোকেনের আড্ডা দেখিবার অদম্য কৌতূহল

ছিল। সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নামে অনুরূপ বহুবিধ আড্ডাতেই তো নাম লিখাইয়াছি; শুধু আমি নয়, তরল বয়সে অধিকাংশ সাহিত্যিকই এই অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া পিছল পথে যাতায়াত করিয়া থাকেন। সাধারণ গৃহস্থ পাঠক মানব-জীবনের অন্ধকার দিকটার যে রহস্য-বৈচিত্র্যে অবগাহন করিয়া পুলকিত হইয়া উঠেন, তাহার জ্ঞান যে আমরা কত কঠিন মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া থাকি, তাহা কি কোনদিন তাঁহারা জানিতে পারিবেন! রৌদ্রদগ্ধ সমুদ্র-বারি বাষ্পীয় যন্ত্রণায় আকাশে সঞ্চিত হইয়া মেঘ রূপে ধারা-বর্ষণ করিয়া থাকে, তবেই পৃথিবী শস্য-শ্যামলা হইয়া উঠে। লোকে ধানের উপর ঢেউ খেলিয়া যাইতেই দেখে, ঢেউয়ের সঙ্গে বাষ্পকণার বিচ্ছেদের আর্তনাদ কেহ শুনিতে পায় না। চ্যাংকে বলিলাম, দেখ, পুঁথি আমি ফিরিয়ে দিয়ে আসব, কিন্তু তার আগে একটা স্বর্গে একবার ঢুকতে চাই। এ সুযোগ আর মিলবে না। তুমি পুঁথি নিয়ে প্রস্তুত হও।

চীনা চ্যাংয়ের মুখে খুশী আর ধরে না, ব্লাড ইজ থিকার দ্যান ওয়াইনই বটে! তথাপি আমাকে সাবধান করিবার জন্য একবার বলিল, বাবুজী, বিপদের ভয় পদে পদে; ধরা পড়লে ফিরে আসতে হবে না।

আমিও উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, বুদ্ধ।

হাত জোড় করিয়া নমস্কারও করিলাম।

উই-পর্যায় শেষ হইল না; কোকেনপর্বে দ্রুত নামিয়া গেলাম। শুনিলাম, চীনা অমরকোষের ইহাই স্বর্গবর্গ। সর্বত্র স্বর্গ হইতে শুরু হওয়াই বিধি। ইহার পরে সাহিত্য।

চ্যাং পুরা একদিন সাধনা করিয়া খিদিরপুরের একটি স্বর্গদ্বারের চাবি আয়ত্ত করিল। পঞ্জিকামতে একটা ভাল দিন দেখিয়া যাত্রা করিলাম।

বাহির হইতে বাড়িটা আলুর গুদামের মত। বাঁ হাতের তেলোতে সাতটি করিয়া তেঁতুলবীচি দেখাইয়া সিংহদ্বার পার হইলাম। ভিতরে পর পর দরজা; কাটা কাপড়ের কেনা-বেচার কাজ চলিতেছে, কে আসিতেছে যাইতেছে দেখিবার অবসর কাহারও নাই। ইহার মধ্যে পাহারাও চলিতেছে। প্রথম দরজায় সানইয়াৎসেন ও দ্বিতীয় দরজায় চিয়াং-কাই-শেকের নাম করিতে হইল। সদর পার হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। যে ঘরে পৌছিলাম, সেখানে আবছা অন্ধকার। যেন যাদুমন্ত্রবলে আলো জলিয়া উঠিল এবং ঠিক কলের পুতুলের মত একজন ছাতার কাপড়ের কোর্তা-পায়জামা পরা চীনাম্যান

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া আমাদের পিঠের জামা তুলিয়া পরীক্ষা করিল; বলা বাহুল্য সেখানে পুঁথি-নির্দিষ্ট পারাবত পূর্বেই অঙ্কিত হইয়াছিল। আমরা পাসমার্কা পাইলাম।

কিন্তু এ রাজ্যে পাসমার্কা পাইলেই গেজেটে নাম উঠে না। পুরু কাপড় দিয়া আমাদের চোখ বাঁধা হইল। অনুভব করিলাম একটা ভিজা স্যাঁৎসেতে রন্ধ্রপথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। কলের পুতুল যেখানে গিয়া চোখ খুলিয়া দিল সেটি অত্যুজ্জ্বল আলোকমণ্ডিত একটি সাজঘর।

কলের পুতুল কথা কহিল—সাধারণ, না ছদ্মবেশ?

স্ববেশে চ্যাংয়ের আপত্তি হইবার কথা নয়, আমার পক্ষে ছদ্মবেশ ভাল। দৈনিক কাগজের রিপোর্টারদের সর্বত্র গতিবিধি; সাবধানের মার নাই। অন্যে যেখানে আত্মগোপনের সুবিধা পায়, সেখানে বাহাদুরি করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে যাওয়া মূর্খতা। বাংলা সাহিত্যে আমাদের পূর্বগামীরা কেহই তো আত্মপ্রকাশ করেন নাই, আমরা সন্দেহ করিয়া পুলকিত হইয়াছি এই মাত্র।

কলের পুতুল সাজঘরের দেওয়ালের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, সেখানে সারি সারি ঘোর কালো রঙের বোরখা টাঙানো ছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে একটি টানিয়া লইয়া পরিধান করিলাম। কাছাকাছি আয়না ছিল না, আরবী মহিলা সাজিয়া কেমন দেখিতে হইলাম, কে জানে! কিন্তু বোরখার রন্ধ্রপথে স্থানটি মন্দ লাগিল না।

এবারে কলের পুতুলের অনুসরণ করিয়া যেখানে পৌঁছিলাম, সেই স্থানটি স্বর্গ হইলে স্বর্গকে মনোহর বলিতে হইবে। অপরূপ আলোকমালায় বহুমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জিত সুবৃহৎ হলঘর—মেঝে পুরু গালিচায় মণ্ডিত। অনেকগুলি টেবিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—প্রত্যেক টেবিলের চারিপাশে সজ্জিত চেয়ারে সভ্যেরা বসিয়া গল্পগুজব করিতেছেন; ইঁহাদের অধিকাংশই আমার মত বোরখা পরিহিত; কোমলাঙ্গীরা কেহ ছিলেন কিনা বুঝিবার উপায় নাই। কয়েকজন চীনাম্যান ও আমাদের স্বদেশীয় কয়েকজন সভ্য স্ব স্ব বেশেই উপস্থিত ছিলেন।

হলঘরে একটিও আসন খালি ছিল না। আমাদিগকে পাশের একটি ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। ঘরটি যথোপযুক্ত আলোকিত হইলেও হলঘরের তুলনায় জরাজীর্ণ ও মলিন; সিলিং হইতে দেওয়াল পর্যন্ত সর্বত্র উইয়ের টানা লম্বা বাসা। চ্যাংয়ের সহিত ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিলাম। চ্যাংয়ের মুখে

বিস্ময়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। সে ঘরে তিনটি মাত্র টেবিল, কোনও টেবিলেই লোক নাই। চ্যাং ও আমি একটি টেবিলে সামনাসামনি বসিলাম। কলের পুতুল চলিয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতজন সভ্য আসিয়া ঘরের খালি চেয়ারগুলি অধিকার করিয়া বসিলেন

হঠাৎ হাততালির মত আওয়াজ হইল; আরব্য উপন্যাস পড়া ছিল, বুঝিলাম এখনই একটা কিছু ঘটিবে। ঘটিলও। হোটেলের ওয়েটার জাতীয় তিনজন জীব হাতে হাতে জলের গেলাস ও প্লেট লইয়া প্রবেশ করিল। আমাদের টেবিলেও দুইটি প্লেট পড়িল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকিয়া উঠিলাম। প্রত্যেক প্লেটের মাঝখানে পোলাও-এর মত সজ্জিত কতকগুলি মরা উই, সাদা ধবধব করিতেছে।

সর্বনাশ! উই খাইতে হইবে না কি! টেবিলের নীচে চ্যাংয়ের পা আমার পদস্পর্শ করিল, অর্থাৎ চ্যাং আমাকে সতর্ক করিয়া দিল; অকারণ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া ধরা না পড়ি। আমি আত্মসম্বরণ করিয়া অন্যান্য টেবিলে উপবিষ্ট সভ্যদের দিকে আড়চোখে চাহিলাম। দেখিলাম, তাঁহারা মেওয়া খাওয়ার পদ্ধতিতে তারিয়া তারিয়া এক একটি উই মুখে পুরিতেছেন—দেখিয়া বোধ হইল যেন নন্দন-লোকে দেবতারা অমৃত পান করিতেছেন!

চকিতে আমার ললাটের তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, জলের মত সব পরিষ্কার হইয়া গেল। ওই উইয়ের মধ্যেই মাল আছে। চ্যাংয়ের বিপদ হইবার কথা নয়—তাহার রক্তই তাহাকে বিপন্মুক্ত করিবে। কিন্তু আমি কি করিব?

সত্যই উপায় কিছু ছিল না। মোগলের হাতে পড়িয়াছি, খানা খাইতেই হইবে। রবীন্দ্রনাথ যখন চীন ভ্রমণে গিয়াছিলেন, পিকিঙের রাজপরিবারে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে সাত শত বৎসরের পুরাতন হাঁসের ডিম পরিবেশন করা হইয়াছিল। উহাই নাকি চীন মহাদেশের মহার্ঘতম আহার্য—ডেলিকেসি। কিন্তু চীনে যাহা ডেলিকেসি, ভারতবর্ষে তাহাই বিরেচক। রবীন্দ্রনাথ দাড়ির দৌলতে সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন—গল্পটা শোনা ছিল। আমি বোরখার সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলাম। খুব কৌশলে একটি আধটি উই মুখে পুরিয়া বাকিগুলি বোরখার অন্তরালে জামার পকেটে চালান করিতে লাগিলাম। নিশব্দে কাজ চলিতে লাগিল।

ইহার পরের ইতিহাসও কি লিখিতে হইবে? একটি তুটিতেই যে

অভাবনীয় ক্রিয়া শুরু হইল তাহার ফলে আমার সমস্ত অতীত বিলুপ্ত এবং ভবিষ্যৎ রঙীন এবং উজ্জ্বল হইতে লাগিল। আমাকে কেন্দ্র করিয়া আপনারা বাংলা সাহিত্যে যে নূতনের প্রত্যাশা করিতেছেন এ সংবাদও গোপনে আমি পাইয়াছি। আপনাদিগকে আমি নিরাশ করিব না। তবে এ কথাও স্মরণ রাখিতে বলিব যে, ইহার মূলে উই আর কোকেনের যে বহুমূল্য "অবদান" তাহাও যেন সাহিত্যের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে।

অনতিকাল মধ্যে চ্যাং ও আমি উক্ত উইস্বর্গের উৎসাহী সভ্য হইয়া উঠিলাম। এখন আর বোরখার প্রয়োজন হয় না। এই আড্ডায় যে সকল অত্যাশ্চর্য কাণ্ড এবং অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার সাধ্য ও সাহস আমার নাই। প্রথম দিন বাড়িতে ফিরিয়া চ্যাং সেই চীনা পুঁথিখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়া আবিষ্কার করিল যে, পুলিসের সদাজাগ্রত চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য উইয়ের গর্ভে "কুইনে"র হেপাজতে কোকেন রাখিয়া উক্ত কোকেন-পরিপুষ্ট উইগুলিকে মালরূপে পাচার করিবার পদ্ধতি স্মাগ্‌লিং-বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহা যে আমাদের কলিকাতা শহরেই এমন প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল।

আমাদের এই আড্ডাতেই ক্রমশ বাংলা সাহিত্যের অনেক ধুরন্ধরের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ হইল। আমাদের শিল্পী ফণী চক্রবর্তীকেও একদিন এখানে প্রত্যক্ষ করিয়া বিন্দুমাত্র চমকিত হইলাম না। উই-স্বর্গে ছবির ইনস্পিরেশনের অভাব নাই।

আমার কল্পনার গতি ইতিপূর্বেই যে কারণেই হউক রুদ্ধ হইয়াছিল, যাদুস্পর্শে সমস্ত বাধা অপসারিত হইতে লাগিল। সম্পাদক মহাশয়ের কথা ভাবিয়া আর বিন্দুমাত্র আতঙ্ক হয় না। বরঞ্চ তিনি আসিলে তাঁহাকে কি কৌশলে উই-স্বর্গে দীক্ষা দিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

প্রসঙ্গত, দুইটি কথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। নব আবিষ্কৃত "তৈরী" উইয়ের দৌলতে পুরাতন উইয়ের প্রতি আমার মমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল; আমার লাইব্রেরি ঘরেই এখন গোপনে উই কালচার শুরু করিয়াছি। হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, আমার দীর্ঘকালের সংগৃহীত সমস্ত পুরাতন বই ধ্বংস হইয়া গেলেও লাভ থাকিবে। লাইব্রেরিতেও এখন আর স্থানের অভাব নাই। প্রয়োজনের তাগিদে অনাবশ্যক বাজে বইগুলাকে আবার একটি দুটি করিয়া

বসির মিঞার পুস্তক-পিঞ্জরাপোলে জমা দিয়া আসিতেছি এবং আপনারা যে প্রত্যহ এই অধমের নামাঙ্কিত পুস্তকগুলি নামমাত্র মূল্যে সংগ্রহ করিতে পাইয়া ধন্য হইতেছেন এ সংবাদও আমার অবিদিত নাই। ইহাতে এখন আর আমার কিছুই আসিয়া যায় না। স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি; তেত্রিশ কোটি দেবতার হিসাব রাখিয়া মরিব কেন? তা ছাড়া বাংলা দেশে সাহিত্য-স্রষ্টাদের ইতিহাস পাঠ করিয়া এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, রসাত্মক বাক্য অর্থাৎ কাব্য রচনার জন্য অন্য কোনও আয়োজনের আবশ্যক নাই, আবগারি বিভাগের সহিত কিঞ্চিৎ সংশ্লিষ্ট থাকিলেই ঐ কাজ নির্বিঘ্নে হইতে পারে। শুধু কি তাই? এখানে গবেষণা, বিজ্ঞান, ইতিহাস সকল ব্যাপারেই ইহাই লেখক সম্প্রদায়ের একমাত্র সম্বল। উই-স্বর্গে কয়েকদিন যাতায়াতের ফলে এই সত্যটা এখন বেশ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। ট্রেড-সিক্রেট-অ্যাক্টে না আটকাইলে আরও বিশদ করিয়া বলিতে পারিতাম।

এখন আর আমার দুঃখ নাই, পক্ষাধিককালের মধ্যেই পরমার্থকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। দারিদ্র্যের ভয় আর নাই। একমাত্র অভাব হয় চুণের, তাও পূর্ত বিভাগের কৃপায় পূরণ করিয়া থাকি; চূণকাম করা দেওয়াল চাটিয়া যে তৃপ্তি লাভ করি, প্রিয়াসান্নিধ্যে ততখানি তৃপ্তি পাই না।

যাক, আর অবান্তর কথা বলিব না। সম্পাদক মহাশয় টেলিফোনে খবর দিয়াছেন সন্ধ্যায় তিনি আসিবেন। তৎপূর্বেই আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। সরঞ্জাম হাতের কাছেই আছে, এক মুঠা উই লইয়া...

* * *

সম্পাদক মহাশয় আসিতেই লেখা দিলাম। তিনি বলিলেন, গল্প তো শেষ হইল না। উই কোকেন আছে, কিন্তু সাহিত্য কোথায়? আমি হাসিলাম, হাসিয়া বলিলাম, সাহিত্যই তো আসল মাল, তার খবর দিতে নাই। চীনা ছবির বইটি আনিয়া তাঁহাকে বলিলাম, এই দেখুন, ভাল শিল্পের শেষ হওয়া রীতি নয়, ছবিগুলি সব অসম্পূর্ণ। রস-রচনার ফাউস্বরূপ সেই চীনা ছবির বইটি তাঁহাকে উপহার দিলাম এবং আমার প্রাপ্য দক্ষিণা শিল্পী ফণী চক্রবর্তীকে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

১৩৪৭

ভাই-বোন

রাস্তায় ভারি একটা গোলযোগ শোনা গেল। পথের দুই ধারে পথিক ও দোকানদারেরা সমবেত কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিল—'গেল গেল'—'সর্বনাশ হল।' ব্যাপার কি? একটি বছর ছয়-সাতের ছেলে রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে করিতে চলন্ত ট্রামের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। আর এক মুহূর্তের মধ্যে তাহার কচি দেহ ট্রামের চাকার নীচে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। কিন্তু ট্রামের চালক খুব হুঁশিয়ার। বিদ্যুৎগতিতে প্রাণপণ বলে সে ব্রেক কষিল। গাড়িসুদ্ধ লোককে একটা ঝাঁকানি দিয়া সেই ছেলেটিকে গ্রাস করিবার পূর্বেই ট্রাম থামিয়া গেল। রাস্তার লোকেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিমূঢ় বালককে ঘিরিয়া তখন উল্লাস, বকুনি ও হা-হুতাশের ঘটা পড়িয়া গেল। বালক তাহার চতুর্দিকের জনতা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! এমন সময় আলুথালুভাবে ভিড় ঠেলিয়া একটি নয়-দশ বৎসরের বালিকা বালকটির কাছে আসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া জামার খুঁটে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিতে লাগিল। ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন প্রশ্ন করিল, ও কে খুকী, অমন করে কি রাস্তায় ওকে ছেড়ে দেয়, আর একটু হলেই ও যে যেত! বালকটিকে এ ভাবে অপদস্থ হইতে দেখিয়া খুকী তখন ক্ষেপিয়া গিয়াছে, রোষকষায়িত দৃষ্টি তুলিয়া সে তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমরা ওকে অমন করছ কেন? রাস্তা ছেড়ে দাও, আমরা বাড়ি যাই। বালিকা ছেলেটির দিদি। জনতা দিদিত্বের এই হাস্যকর দাবিতে হাসিয়া উঠিয়া ভিড় ছাড়িয়া দিল। ভাইয়ের হাত ধরিয়া দিদি সগর্বে চলিয়া গেল। বাড়ির সামনে আসিয়াই ভ্রাতার সদ্য অতিক্রান্ত ফাঁড়াটার কথা স্মরণ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিয়া উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দুষ্টু ছেলে! অমন করে কি রাস্তায় যেতে আছে! ভাই-বোনে কান্নার পালা শেষ করিয়া বাড়ি ঢুকিল।

অনেক বছর পরের কথা। রাস্তার সেই বালক এখন বিলাত-ফেরত ডাক্তার, মেডিকেল কলেজের হাউস-সার্জন! চিকিৎসা-বিভাগে তাহার প্রতিষ্ঠা শুরু হইয়াছে, সমাজেও তাহার যথেষ্ট খাতির। মেডিকেল কলেজের মধ্যেই সে কোয়ার্টার্স পাইয়াছে। সদ্যবিবাহিত পত্নী লইয়া সে সেখানে বাস

করে। বিশেষ করিয়া এই বিবাহ সম্পর্কে অপূর্বকুমারের প্রতিষ্ঠা সমাজে অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপূর্বকুমারের স্ত্রী লতিকার পিতা ব্রাহ্ম সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি—ধনে মানে শিক্ষায় ব্যবহারে।

ছেলেটির সেই বালিকা দিদি মাধুরী দরিদ্র স্বামীকে বিবাহ করিয়া কলিকাতার এক দরিদ্র পল্লীতে আপনার ক্ষুদ্র সংসার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সংসার বলিতে স্বামী বীরেন্দ্রনাথ ও একটি শিশুকন্যা। ভ্রাতার বিদেশে অবস্থানকালে বীরেন্দ্রনাথের সহিত মাধুরীর সবিশেষ পরিচয় হয় এবং একদিন পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলের অমতে সম্পূর্ণ নিজের প্রবল ইচ্ছার জোরে সে বীরেন্দ্রকে বিবাহ করে। বীরেন্দ্র ধনে মানে মাধুরীদের পরিবারের সমকক্ষ না হইলেও চমৎকার মানুষ। মাধুরী ও অপূর্বর বড়দিদি অনুপমা কেবলমাত্র এই বিবাহের পক্ষে ছিল। অনুপমার নিজের বিবাহ কোন বড় ঘরে হইলেও ছোট বোনের এই প্রেমকে সে স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছিল, এবং পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঘটা করিয়া বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছিল। পিতামাতার এই অপ্রীতি ও তাচ্ছিল্য মাধুরীকে বড় পীড়া দিতেছিল। তাই বিবাহের পরে সে পিতৃগৃহে বড় একটা আসিত না। স্বামী স্বভাবসুলভ ভালমানুষিতে মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে দেখা দিলেও, শেষে মাধুরীর পীড়াপীড়িতে সেও আসাযাওয়া ত্যাগ করিয়াছিল। সত্যই তো! যাঁহারা আজিও তাহাকে উপেক্ষা করিতে ছাড়েন না, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখাটা নিজের দিক দিয়া যাহাই হউক, স্ত্রীর পক্ষে তাহা যথেষ্টই ক্লেশকর, সন্দেহ নাই। পিতামাতার ও কন্যার মাঝে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই অভিমানের এক পরদা পড়িয়াছিল।

বীরেন্দ্র স্কুলে মাস্টারি করিয়া যৎসামান্য রোজগার করিত, তাহাতে বাসা ভাড়া দিয়া কলিকাতায় বাস করা তাহার পক্ষে দুরূহ ছিল। সুতরাং তাহাকে সকালে বিকালে টিউশনি করিতে হইত। মাধুরীও পিতৃ-গৃহবাসের সকল স্মৃতি বিসর্জন দিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ বরণ করিতে দ্বিধা করে নাই। নিজেই সংসারের সকল কাজ করিত। পিতামাতার উপর অভিমানবশে সে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই ক্ষান্ত হইত, স্বামীর নিকট কখনও পিতৃগৃহের উল্লেখ করিয়া কোনও কথা বলিত না।

মাধুরীর বিশ্বাস ছিল, অপূর্ব ফিরিয়া আসিয়া দিদিকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। দুই বোনের একটি মাত্র ছোট ভাই, অত্যন্ত স্নেহের সামগ্রী।

কিন্তু সেই ভাই দেশে ফিরিয়া বোনের দারিদ্র্য ও স্বামী-নির্বাচনের ভুলটা ভুলিতে পারিল না। কলিকাতায় ফিরিয়া সেই যে সে ঘণ্টা খানেকের জন্ত দিদির সংসারে পদার্পণ করিয়াছিল, আজ পর্যন্ত আর সে তাহার খোঁজ লওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। দিদি অনুপমা তবু মাঝে মাঝে আসিয়া বড় আদরের ছোট বোন ও তাহার কন্যাকে এক-আধটু আদর দেখাইয়া যাইত।

এরূপ সম্বন্ধটা অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। পিতামাতার উপেক্ষা মাধুরী সহিয়াছিল; কিন্তু ভ্রাতার এই তাচ্ছিল্য তাহার বড় বাজিল; চোখের জল বারণ মানিল না। মাধুরীর মন ক্রমশ কঠিন হইয়া আসিতেছিল। সে দিনে দিনে আপনার স্বামী-সন্তানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজের সংসারেই ডুবিয়া রহিল।

অপূর্ব বিদেশে থাকিতে দিদির মতিচ্ছন্নতার কথা শুনিয়া আশ্চর্য ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দিদি এ কী করিয়া বসিল! বীরেনকে সে যে চিরদিন 'ন্যাকা' 'কাপুরুষ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে—আর তাহাকেই কিনা বিবাহ করিল তাহার ছোড়দি—যাহার রুচির উপর তাহার একটা গভীর আস্থা ছিল! দেশে ফিরিয়া সে সর্বপ্রথমেই বড়দিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিল—এ কি করে সম্ভব হল দিদি? অনুপমা শান্তভাবে বলিল, ওরে, বীরেনকে মাধু বড্ড ভালবাসে! বাস, এক কথায় সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু অপূর্বের মনের গ্লানি কাটিল না। এই হীন সম্বন্ধের লজ্জা মাধুরী অনুভব না করিলেও অপূর্বর সর্বাঙ্গ যেন এই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইল। লোকের কাছে সে এই ভগ্নীপতিকে স্বীকার করিবে কি করিয়া!

অপূর্ব এক দিন মাধুরীর বাসায় গিয়া তাহার কর্তব্য শেষ করিয়া আসিল। দীর্ঘ চার বৎসর পরে ভাই-বোনের দেখা; কিন্তু কি যেন একটা ব্যবধান উভয়ে অনুভব করিল; ভাই-বোনের মিলনালাপ তেমন জমিল না। তারপর অপূর্ব তাহার বাক্‌দত্তা পত্নীর পিছনে ছুটাছুটি করিয়া একদিন শুভলগ্নে তাহাকে বিবাহ করিয়া নবোঢ়া পত্নীকে লইয়া মশ্‌গুল হইয়া গেল। বিবাহে আর পাঁচজনে যেমন আসে, মাধুরীও তেমনই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া পিতামাতা ভাইয়ের উপর অভিমানে সে যে কি কান্নাটাই কাঁদিয়াছিল, তাহার ইতিহাস অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানে না।

ইহার কিছুদিন পরেই অপূর্ব মেডিকেল কলেজে চাকরি পাইল, এবং তারপর একদিন সে পত্নী লতিকাকে লইয়া তাহার কোয়ার্টার্সে উঠিয়া গেল।

মানুষ নিজের ভাগ্যকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। মাধুরী, অপূর্ব ও অনুপমা আপন আপন ভাগ্য বহন করিয়া সংসারে চলিতে লাগিল। দরিদ্র মাধুরীর কষ্টে দিন কাটে। অপূর্ব আপনার শ্বশুরকুল ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সগৌরবে চলে ফেরে; পার্টি, নিমন্ত্রণ, ষ্টীমার ট্রিপ ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। স্ফূর্তি ও আনন্দের অন্ত নাই। আপনাকে ও আপনার অর্ধাঙ্গিনীকে কেন্দ্র করিয়া এই যে সুখবিলাস, তাহার মাঝে ভগিনীর স্থান কোথায়? অপূর্ব কতকটা ইচ্ছা করিয়া, কতকটা ঘনিষ্ঠতার অভাবে মাধুরীর কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। স্ত্রী লতিকা তো মাধুকে চেনেই না। বহুসন্তানপরিবৃতা অনুপমা আপন সংসার লইয়াই ব্যস্ত থাকে, বাহিরের বিশ্বে কি ঘটিতেছে, তাহা দেখিবার অবসর তাহার হয় না। পিতামাতা পঞ্চাশোর্ধ্বে গিরিডিতে নির্জনে বাস করিতেছেন।

তবু অপূর্বর বাড়ির পার্টি ইত্যাদিতে বড়দিদি ও বড় ভগ্নীপতির স্থান ছিল, মাধুরী ও বীরেনের কোন স্থানই ছিল না। ইহা লইয়া অনুপমা এক দিন লতিকার কাছে অনুযোগ করিয়াছিল। লতিকা অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিয়াছিল। ভাইয়ের ব্যবহারে অনুপমা বিরক্ত হইয়া ক্রমশ ভাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত ত্যাগ করিল।

মাধুরীর এখনও কিছু সম্বন্ধ ছিল এই দিদিটির সঙ্গে। সুখে দুঃখে তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইতে দিদিই এখন আসে। তবে তাহার অবসর কম—বৃহৎ সংসার। মাধুরী এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকে। স্বামীর কাছে তবু দিদি তাহার মুখ রক্ষা করিতেছে!

বীরেন্দ্রের সঙ্গে মাধুরী কখনও বাপের বাড়ির কথা লইয়া আলাপ-আলোচনা করিত না, সেদিকে তাহার এখনও প্রচুর দুর্বলতা ছিল। সে বাল্যকাল হইতে অভিমানী। তাহার বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিয়া সে কিছু প্রকাশ করিত না, পাছে স্বামী অপমানকর কিছু বলিয়া বসেন! বীরেন্দ্র স্ত্রীর এই দুর্বলতাটুকুকে সম্মান করিয়া চলিত! কিন্তু অপূর্বর সম্বন্ধে সে মাঝে মাঝে তীব্র কথা বলিতে ছাড়িত না। মাধুরী চুপ করিয়া শুনিত, কিছু জবাব দিত না,—জবাব দিবারই বা কি আছে!

কোনদিন সন্ধ্যায় পড়াইয়া ফিরিয়া সে খবর দিত, আজকে তোমার

ভাইয়ের বাড়িতে বিরাট ব্যাপার মাধু, অপূর্ববাবুর শ্যালী না কি বিলেত যাচ্ছেন, তাই তাঁকে একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দেওয়া হচ্ছে। হায় রে, এই গরিবকে একদিন ভুল করেও নেমন্তন্ন করে না, তবু দু-একটা মুখরোচক খাওয়া জুটত! মাধুরী চুপ করিয়া শুনিত।

কয়েক বৎসর পরের কথা বলিতেছি। মাধুরীর বাবা মা উভয়েই গত হইয়াছেন। অনুপমাও পাঁচটি সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছে। এখন অপূর্ব আর মাধুরী দুই ভাই বোন,—সংসারে আপন আপন ভাগ্যচক্রের সঙ্গে সঙ্গে আবর্তন করিয়া চলিতেছিল। পিতার মৃত্যু অকস্মাৎ ঘটিয়াছে,—কলিকাতা হইতে তিন সন্তানের কেহই পিতার সহিত শেষ-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিয়া আসিতে পারে নাই। মাতাও ইহার পর অধিক কাল জীবিত ছিলেন না। অনুপমা তখন অসুখে ভুগিতেছিল, সে যাইতে পারে নাই। মাধুরী আপনার কন্যাকে বীরেন্দ্রের নিকট রাখিয়া ক্রোড়স্থ পুত্রকে লইয়া গিরিডিতে মায়ের সেবা করিতে গিয়াছিল। অপূর্বর স্ত্রী কখনও গিরিডি যায় নাই। মায়ের অসুখের সময় সে আবার অন্তঃসত্ত্বা ছিল, সুতরাং সে পিতার গৃহেই আশ্রয় লইয়াছিল। অপূর্ব মাঝে মাঝে গিয়া মাকে দেখিয়া আসিত, কিন্তু কাজের অজুহাতে এক-আধদিনের বেশি থাকিত না। মাসখানেক ভুগিয়া মা মারা গেলেন। এই সময়টাতে ভাই-বোনে দেখাসাক্ষাৎ হইত; কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা হইত না। দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপীড়িত নারী তাহার বড় আদরের ভাইয়ের কাছে তাহার হৃদয়খানি উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইত, কিন্তু কথা বলিতে গিয়া বলা হইত না, কোথায় যেন কি একটা বিষম বাধা ছিল। বোনের মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবসর অপূর্বর ছিল না,—আসন্ন-প্রসবা পত্নীর বিপদ কল্পনা করিয়া সে তখন ভিতরে ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

মায়ের মৃত্যুর পর অপূর্বই মাধুরীকে তাহার স্বামীগৃহে পৌঁছাইয়া দিল,—বহু বর্ষ পরে আবার অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য মাধুরীর গৃহে তাহার ভ্রাতার পদধূলি পড়িল। তারপর ধীরে ধীরে আবার নিদারুণ বিস্মৃতি।

মাধুরী দিদির সহিত দেখা করিয়া এবার আর কান্না রোধ করিতে পারিল না, বলিল, দিদি মেয়েমানুষ তো ভুলিতে পারে না, বুকের রক্ত যে তোলপাড় করিয়া উঠে, রক্তের সম্বন্ধ—সে কি ইচ্ছা করিলেই ভোলা যায়! কিন্তু ভগবান পুরুষকে কি ধাতে যে নির্মাণ করেন, নির্মমভাবে সব কিছু দলিয়া পিষিয়া

বর্তমানের তাড়ায় তাহারা ছুটিয়া চলে—সমস্ত রক্তের সম্বন্ধ শিথিল করিয়া। আমরা কেন পারি না, দিদি ?

রোগকাতর শীর্ণ মুখখানি তুলিয়া দিদি ভগ্নীর মুখখানি বুকে টানিয়া লইল; কিছু বলিল না।

আপনার বলিতে একমাত্র দিদিই ছিল, সেও আর রহিল না, একদিন সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল।

মাধুরী একদিন যৌবনের জোরে আপনার চারিদিকে যে নিবিড় আবরণ রচনা করিয়াছিল,—দিনের কাজের অবসরে, স্বামী-সন্তানের প্রতি কর্তব্য সমাপন করিয়া, গুটিপোকার মত সেই আবরণ ভেদ করিয়া সে বাহিরে আসিত, তখন তাহার নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ হইত। ছেলেকে আদর যত্ন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে তাহার বড় ভয় করিত। এও তো অপূর্বর জাত! কে জানে একদিন হয়তো এও মায়ের নাড়ির টান উপেক্ষা করিয়া আপনার অদম্য বলে আপন সংসারচক্র নির্মাণ করিতে শুরু করিবে—মা থাকিবে না, বোন থাকিবে না, কোন সম্বন্ধের প্রয়োজন সে অনুভব করিবে না। মাধুরী শিহরিয়া উঠিত,—বাপ রে, ভাইয়ের উপেক্ষাই যে তাহার বুকে শেলের মত বিঁধিয়া আছে, ছেলের উপেক্ষা সে কি সহিতে পারিবে ?

অপূর্বদের পরিবারে যে অবিশ্বাস্য বিয়োগান্ত নাটকের সূত্রপাত হইয়াছিল, অপূর্বর স্ত্রী লতিকার মৃত্যুর পর তাহা সমাপ্ত হইল। একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াই সে ইহলীলা সংবরণ করিল। অপূর্ব চক্ষে অন্ধকার দেখিল। মানুষ এত বড় আঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকে না। এক মুহূর্তেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ কেমন অন্ধকার হইতে পারে, অপূর্ব তাহা কখনও ভাবে নাই।

ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন সে পিছনে একবার ফিরিয়া চাহিল,—মা, বাবা, বড়দিদি কেহ নাই, এক মাধুরী—সেই বা কেমন আছে কে জানে! মাধুরীর কথা আজ তাহার মনে জাগিল।

সদ্যোজাত শিশুটিকে লইয়া অপূর্ব বড় বিব্রত হইল। শাশুড়ী সেটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন বটে, কিন্তু অপূর্ব বিশেষ ভরসা পাইল না। এই কয়েক বৎসরের ব্যবহারেই সে ইহাদের ধাত বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। পরের সন্তানের ঝক্কি সহিবার মত মনোভাব ইহাদের নহে,—বিশেষ করিয়া অপূর্ব এবং অপূর্বের এই শিশুটিই তাঁহাদের আদরের কন্যার মৃত্যুর কারণ। তাঁহারা যে অপূর্বকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিবেন, অপূর্ব তাহা মনে করিতে পারিল না।

মাধুরী সব শুনিল। এক মুহূর্তে সকল অভিমান তাহার ভাসিয়া গেল। আজ আর তাহার অশ্রু বাধা মানিল না। স্বামী অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে গেলেন, ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে লাগিল, মেয়ে হাঁ করিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—মাধুরীর আজ কোন খেয়াল নাই। তাহার বড় সাধের ছোট ভাই অপু সঙ্গীহীন হইয়া ছটফট করিতেছে, সে কি বসিয়া থাকিতে পারে?

বৈকাল পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিতে পারিল না। গাড়ি ডাকিয়া একেবারে অনিমন্ত্রিত অযাচিত ভাবে ভায়ের শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। একবার ভাবিল না—হয়তো অপূর্ব ইহাতে রাগ করিবে, বিরক্ত হইবে। শৈশবের একটা ঘটনার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—সেই যেদিন চলন্ত ট্রামের মুখ হইতে উদ্ধার পাইয়া তাহার ভাই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সে তখন সব বাধা ঠেলিয়া ভাইকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিল। আজও যে তাহার বড় সাধের ভাই বিপন্ন হইয়াছে,—লজ্জা অভিমান তাহার আজ কি থাকিতে পারে!

মাধুরী ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপূর্বর শ্বশুরালয়ে পৌঁছিল। বাহিরের ঘরে অপূর্ব একা বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল; কখন একটা গাড়ি আসিয়া বাড়ির সামনে থামিয়াছে, সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ 'ভাই অপু' বলিয়া কে তাহাকে ডাকিল! বড় পরিচিত সেই স্বর! অপূর্ব চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—তাহার পরিত্যক্ত, তাহারই অনাদৃত বড় সাধের ছোড়দি মাধুরী। মাধুরী ছুটিয়া আসিয়া অপূর্বর হাত ধরিয়া তাহাকে একেবারে কোলে টানিয়া লইল। দিদির চোখের জলে ভায়ের রুক্ষ কেশ সিক্ত হইতে লাগিল। অপূর্ব 'দিদি' বলিয়া বহুদিন পরে ডাকিল,—তাহার বুকের সমস্ত বোঝা নামিয়া গেল।

১৩৩৪

তিলোত্তমা

কানপুরের তেলকলের মালিক মহাবীরপ্রসাদ, তস্য পুত্র বেণীপ্রসাদ। হৃষ্টপুষ্ট নাদুসনুদুস প্রেমিক ছোকরা, পাউডার ভ্যাজেলিন মাখে, বাঁ দিকে টেরি কাটে, কানপুর হাই স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। সোরিমিঞার টপ্পাও দু-একটা গাইতে জানে। ফ্লুট বাজায়। দোষের মধ্যে বড় ভীতু। গিধ্বড়—মানে, শেয়ালের ডাক শুনলেই ভয়ে শুকিয়ে যায়। মহাবীরপ্রসাদ অয়েল মিল—মানে, সরষের তেলের বিলিতী ঘানি। বস্তা বস্তা সরষে আসে, গুদামে জমা হয়, দিনরাত ঘানি চলে—বিপুল বেগে, বিচিত্র সুরে।

বাপ না থাকলে বেণীপ্রসাদ গদিতে কাত হয়ে সুরে সুর মিলিয়ে ফ্লুট বাজায় এবং থেকে থেকে ঘর্মাক্ত কপালটা মুছে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলে, তিলোত্তমা মেরে পিয়ারী।

তিলোত্তমা—মানে, স্কুলের হেডমাস্টার সর্বেশ্বর সেনের একমাত্র কন্যা তিলোত্তমা সেন। ডাকনাম খুকী, তবু আধুনিকা। স্কুলেরও একমাত্র ছাত্রী। ফার্স্ট ক্লাসেই পড়ে, মাস্টারের পেছনের চেয়ারে বেণী ঝুলিয়ে বসে, মাস্টার ঘরে ঢুকলে তবে ঢোকে, ঘণ্টা পড়বার আগেই বেরিয়ে যায়—ছোট্ট হাতঘড়িটা দেখে নেয় একবার।

বেণীপ্রসাদ তাকিয়ে থাকে জড়ভরতের হরিণের মত, ব্যাকুল কাতর তার চাউনি।

দেখে আর মনে মনে ভাবে মজ্নুর কথা—

লায়লা, লায়লা, কি চমৎকার নাম। তিলোত্তমা বড় খটমট।

বাংলা ভাষাটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারে না—

অনেক চেষ্টা করে মধুর করে একদিন ডাকে, খোকী—

তিলোত্তমার হিন্দী একেবারে বরদাস্ত হয় না। ঝংকার দিয়ে গ্রাম্যভাবে বলে, মর্ মুখপোড়া, খোকী আবার কে?

পাশাপাশি বাড়ি। যাওয়া-আসা আছে।

বেণীপ্রসাদরা নিরামিষ, ঘি দুধ মালাই রাবড়ি পকৌড়ি দহিবড়া। মাছভাজা না হলে তিলোত্তমার ভাত রোচে না।

মহাবীরপ্রসাদ অয়েল মিলের তেলে ভাজা গঙ্গার রুইমাছ—তারিয়ে তারিয়ে খায় প্রত্যহ দুবেলা।

ওই তেলের কথা ভেবে বেণীপ্রসাদ খুশি। তেলের মধ্যে দিয়েই অবিচ্ছিন্ন-তৈলধারাবৎ প্রেম হতে কতক্ষণ!

কাঁচা আমের সময় তিলোত্তমা মিষ্টি করে বলে, বেণীভাই, ভাল সরষে চাই কিছু, কাসুন্দী বানাব। কাঁচা আম আর কাসুন্দী দিয়ে মাছ ভাজা যদি খেতে!

বেণীপ্রসাদ মনে মনে বলে, রাম রাম। মুখে বলে, খাব একদিন, তুমি খিলাবে।

একটুকু ছোঁয়া লাগা, একটুকু কথা শোনা, বেণীপ্রসাদ ছোটে সরষের ক্ষেতে।

বাড়ির পাশেই মাঠ, বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রসারিত। সরষেফুল—যেন গাঢ় হলুদের ঢেউ, ঢেউয়ের উপর ঢেউ—অপরূপ!

বেণীপ্রসাদ ফ্লুট হাতে মাঠে যায়। নগ্‌দিকে বলে সরষে ভাঙতে, বসে বসে ফ্লুট বাজায়—পিলু বারোঁয়া।

সরষে থেকে ঘানিতে হয় তেল, শিলনোড়ায় পিষে তিলোত্তমা বানায় কাসুন্দী।

বেণীপ্রসাদ দেখে আর ভাবে, হায়, যদি সরষে হতাম!

দিন যায়। সরষেফুল ঝরে পড়ে, পুড়ে তামাটে হয়ে যায় দিগন্ত পর্যন্ত, ঝড়ো হাওয়ায় শুক্‌নো সরষের ঝুম্‌ঝুমি বাজতে থাকে।

মহাবীরপ্রসাদের হাঁকডাক শোনা যায়। মহা খুশি সে। ঘানি ঘুরবে। তেল নয়, চকচকে টাকা বেরিয়ে আসবে ঘানি থেকে, করকরে নোট!

স্ত্রী বিমলা বলে, টাকা নিয়ে ধুয়ে খাবে তুমি, এ দিকে ছেলেটা যে দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছু নজর কর না তুমি—

কেন, খায় না?

ছাই খায়, দিনরাত শুধু ভাবে আর বাংলা কেতাব পড়ে। তুমি সাদি দিয়ে দাও ওর ওই বাঙালিনের সঙ্গে। মহাবীরপ্রসাদ শুধু বলে, হুঁ।

এটাওয়ার কাম্‌তাপ্রসাদ। বিরাট কারবার ঘিউয়ের। কোটিপতি। তারই একমাত্র কন্যা যমুনা। সব ঠিকই আছে। কিন্তু বাঙালিন!

স্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট মহাবীরপ্রসাদ। সর্বেশ্বর সেনের চাকরি যায়। কানপুর থেকে ভাগলপুর, ভাগলপুর থেকে কটক, কটক থেকে গৌহাটি এবং গৌহাটি থেকে কলকাতা—বেণীপ্রসাদ আর পাত্তা করতে পারে না।

চিঠি লেখে। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' ছাপিয়ে ফুটে ওঠে মজনুর প্রেম-ব্যাকুলতা। তিলোত্তমা শেষে চিঠিগুলো বাবার কাছ থেকে গোপন করতে থাকে। দয়া হয় তার। কিন্তু জবাব দেয় না।

ধীরে ধীরে সত্যিই শুকিয়ে যায় বেণীপ্রসাদ, ডাক্তার বলে—ক্ষয়-রোগ। কাম্‌তাপ্রসাদ স্বয়ং এসে দেখে যায়, যমুনার সাদি হয়ে যায় এলাহাবাদে।

মহাবীরপ্রসাদ মাথা ঠুকতে থাকে কাঠের হাতবাক্সে।

সরষেক্ষেতের মাঝখানে মাচান বেঁধে দেয় মহাবীরপ্রসাদ, হাওয়া বদলাতে বেণীপ্রসাদ সেখানে গিয়ে বসে, ফ্লুট বাজাতে পারে না। সন্ধ্যের পরে শেয়ালের ডাকের ভয়ে বার বার কানে আঙুল দেয়।

সরষেফুলের গন্ধে ভরে যায় চারিদিক, মৌমাছিরা গুঞ্জন করতে থাকে. প্রজাপতি আর ফড়িং ওড়ে হাওয়ায় পাখা মেলে। খুব ভাল লাগে বেণীপ্রসাদের। তার মন ছুটে যায় সুদূর বাংলা দেশে—যেখানে তিলোত্তমা গঙ্গার মাছ ভেজে খায় সরষের তেলে। বাংলায় নাকি সর্ষের ফসল নেই, মহাবীরপ্রসাদ-মিলের তেলই হয়তো সেখানে যায়, তিলোত্তমা তাই খায়। তার কথা মনে করে কি ?

শেষে একদিন খুবই বাড়াবাড়ি হল। হলুদবরণ সরষেফুলের গন্ধে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল বাতাস। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল বেণীপ্রসাদের। তিলোত্তমার একটা ফিকে-হয়ে-আসা বাঁধানো তস্‌বির হাতে সে মাচার ওপর বসল, বেণী-দোলানো ছোট্ট মেয়েটি—খোকী—তিলোত্তমা বলে চেনাই যায় না, কিন্তু বেণীপ্রসাদের ঝাপ্‌সা চোখ ওরই মধ্যে দেখতে পেল কৌতুক-কৌতূহলে উদ্ভাসিত একজোড়া চোখ, তার ওপর টানা ভুরু, মুখে দুষ্টুমিভরা হাসি, পাতলা ঠোঁট, ভরাট বুক, কোঁকড়া কালো চুলের গোছা হাওয়ায় উড়ছে যেন। সরষেফুল দিয়ে সাজাল সে ছবিটাকে, ভ্রমরেরা মাতাল হয়ে উড়তে লাগল ছবিটার মুখের আশে-পাশে। একবার ডাকতে গেল বেণীপ্রসাদ, তিলোত্তমা পর্যন্ত উচ্চারণ হল না। বিষম কাশিতে ভেঙে পড়ল বেণীপ্রসাদ, সরষেফুলের হলুদের ওপর পড়ল তাজা খুনের ছোপ, পাষাণ হলুদের ওপর লালের ব্যাকুলতা—মৃত লায়লির বুকে মুমূর্ষু মজনুর আছাড়ি-পিছাড়ি! অবসন্নভাবে হাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল বেণীপ্রসাদ, ঘোলাটে চোখে স্পষ্ট দেখতে পেল—গুদামে সরষে জমছে বস্তার পর বস্তা, অবিশ্রান্ত ঘুরছে ঘানি, চোঙের মুখ দিয়ে গলিত সোনার মত গলে পড়ছে তেল, প্রবাহ বয়ে চলেছে,

ভর্তি হচ্ছে পিপের পর পিপে, মালগাড়িতে স্টীমারে চালান হচ্ছে ভাগলপুরে কটকে গৌহাটিতে কলকাতায়—সারা বাংলা মুলুকে—যেখানে যত বাঙালী আছে তার কলজের রক্তের মত সেই তেল পান করছে মাছভাজার সঙ্গে, যে মাছভাজা বেণীপ্রসাদকে তিলোত্তমা খিলাতে পারলে না।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। শেয়ালেরা সমবেত কণ্ঠে রাত্রির প্রথম প্রহর ঘোষণা করল। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিল বেণীপ্রসাদের। শেয়ালকাঁটা। সে সংজ্ঞা হারাল।

নগ্‌দি ছুটল। বিম্‌লা এল, মহাবীরপ্রসাদ এল, এল ডাক্তার, এল হকিম। ছবির ওপর মুখ গুঁজে নিঃসাড়ে পড়ে রইল বেণীপ্রসাদ। আর উঠল না।

ফুলন্ত সরষের ক্ষেতের ঠিক মাঝখানে মাটি চাপা দিয়ে সমাধিস্থ করা হল বেণীপ্রসাদকে। শেষ-সঙ্গী ছবিটি এবং নিত্য-সঙ্গী ফুলুটটি সঙ্গেই রইল।

সাত দিন পরে ক্ষেত দেখতে গিয়ে মহাবীরপ্রসাদ দেখলে, ক্ষেতের মাঝখানে ঠিক গোরের ওপরে এক নতুন ধরনের সরষের গাছ, সেই অপরূপ হলুদবরণ ফুল, অনেক মোটা পুরুষ্টু শুঁটি—তফাতের মধ্যে শুধু পাতায় পাতায় কাঁটা। তাজ্জব লাগল মহাবীরপ্রসাদের।

আরও কদিন পরে ঝানু ব্যবসায়ী মহাবীরপ্রসাদ যেন কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণে গোরস্থানের নতুন সর্ষে গাছ দেখতে গেল, শুকিয়ে এসেছে শুঁটিগুলি, ভেঙে দেখল মহাবীরপ্রসাদ। তাজ্জবকি বাত, একেবারে সরষের মত! দুই আঙুলে পিষে দেখল দানাগুলি, চটচট করছে যেন। লাফিয়ে উঠল মহাবীরপ্রসাদ। শুঁটিগুলি ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে দিল চারদিকে।

দেখতে দেখতে পুরনো সর্ষে আর নতুন সর্ষের শোভায় ঝলমল করে উঠল মহাবীরপ্রসাদের ক্ষেত, হাঙ্গামা নেই, পয়সা লাগে না। আপনি বাড়ে। পাগল হয়ে উঠল মহাবীরপ্রসাদ। বেণীপ্রসাদের বাসনা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে যেন।

পুরাতন আর নতুন সরষে ঝাড়াই হল একসঙ্গে, বিলকুল মিশ খেয়ে গেল। তেলও বেরুল পরিষ্কার—প্রচুর পরিমাণে। ভর্তি হল পিপে, বোঝাই হল গরুর গাড়ি, তারপর মালগাড়ি হস্-হস্ করতে করতে এগিয়ে চলল কলকাতার দিকে, স্ট্র্যাণ্ডরোডের তেল-গুদামে খোলা হল পিপের মুখ, ঠনঠনের হরেরাম মুদির দোকান থেকে পৌছল তিলোত্তমার হেঁসেলে। ভেটকি মাছের ফ্রাই হল—পুঁইশাকের চচ্চড়ি। পরিপাটি করে খেলে তিলোত্তমা।

হঠাৎ তার বেণীপ্রসাদকে মনে পড়ে গেল। খোকী!—কি বোকা ছেলেটা! মনটা কিন্তু খুব সাদা। অত বড়লোকের ছেলে, জুলুম করে নি একদিনও। করতেও তো পারত!

দুদিন পরে পা ফুলল তিলোত্তমার। টিপে-টুপে দেখল। গোদ হল নাকি? কিন্তু টিপলে বসে যায়।

ডাক্তার দেখে বললেন, বেরিবেরি। কর্পোরেশনের লোক এসে বাকি তেলটুকু নিয়ে গেল। পরীক্ষা করে জানিয়ে গেল সরষের তেলের সঙ্গে ভেজাল মেশানো আছে। ভেজালটাই মারাত্মক।

খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। সরকারী-বেসরকারী ল্যাবরেটরিতে চলল গবেষণা। সন্ধান পাওয়া গেল শেয়ালকাঁটা বীজের। তিলোত্তমা কিন্তু বাঁচল না।

মহাবীরপ্রসাদ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে দেখতে লাগল—সারা কানপুর, তামাম ইউ. পি. ভরে গেছে নতুন সরষের গাছে। বেণীপ্রসাদের কল্‌জে-ছেঁড়া কবর-ফোঁড়া মহা-অবদান সারা ভারতবর্ষের বুকে লক্‌লক্ করতে লাগল লেলিহান রসনা বিস্তার করে। হলদে ফুল তো নয়, যেন আগুনের শিখা! চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল মহাবীরপ্রসাদ।

১৩৫৬

পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর

ভয় পাইবেন না, আমি আপনাদিগকে মহাভারত শুনাইব না—এ একেবারে হালী একটা ব্যাপার, আমাদের এই কলিকাতা শহরেই ঘটিয়াছে। ঘটনাটির কথা সংবাদপত্রে সবিস্তারে প্রকাশিত হইয়াছিল। আপনারা পাঁচ কাজের লোক, হয়তো লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু আমরা গল্পলেখক—সাহিত্যস্রষ্টা, আমাদিগকে সৃষ্টি করিতে হয় জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে। সংবাদপত্রের বিচার-বৈচিত্র্যাদিস্তম্ভ বাদ দিলে আমাদের চলে না। ইহাতেও যাঁহারা অবিশ্বাসী রহিবেন, তাঁহাদিগকে একবার দক্ষিণ বালীগঞ্জ ঘুরিয়া আসিতে বলি, সেখানে তাঁহারা সুবিখ্যাত "পাঞ্চালী সিনেমা"টি সগৌরবে বর্তমান দেখিবেন, তাঁহাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে।

এখন পর্যন্ত রেসের ঘোড়ার এবং কোলের (ল্যাপ) কুকুরের বংশ-পরিচয় পেডিগ্রী প্রভৃতির সন্ধান লওয়ার রেওয়াজ শ্বেতকায় প্রভুদের দেখাদেখি আপনারা আমরাও বজায় রাখিয়াছি, কিন্তু মানুষের বংশ-পরিচয়, বিবাহাদি গুরুতর ব্যাপারেও লওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা লইতেন, ফলে তাঁহাদের আমলে বংশে অবাঞ্ছিত রক্তধারা প্রবেশ করিয়া বহুদিনের পাকা বনিয়াদে ভাঙন ধরাইতে পারিত না। আজকাল তো দেখিতেছেনই—কুলজি কোষ্ঠী মিলাইবার চিরাচরিত প্রথাটিকে না মানিবার বড়াই আমরা করিতেছি বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে কি সব কাণ্ডই না ঘটিতেছে। নেবুতলার সেনবংশের শ্রীমতী পাঞ্চালী সেনের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে অন্ততঃ তাঁহার জননী সুরমা দেবী পর্যন্ত ধাওয়া করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাইব বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণী শীতের পড়ন্ত রৌদ্রে ছাদে বসিয়া একাগ্র চিত্তে একটি পত্র লিখিতেছে। সদ্য বিবাহের সাক্ষীস্বরূপ তাহার সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু, সে যে বিদুষী তাহা তাহার করধৃত 'সবুজ পত্র' পত্রিকাখানিই প্রমাণ করিতেছে। সে [illegible] "স্ত্রীর পত্র" পড়িয়া পড়িয়া নূতন স্বামীর উদ্দেশে লিপি রচনা করিতেছিল। পাড়াটি সিমলে পাড়া, ছাদটি তাহার পিত্রালয়ের। সহসা পাশের বাড়ির ছাদ হইতে মাঝের ব্যবধান অবলীলাক্রমে ডিঙাইয়া একটি সুগঠিতদেহ তরুণ যুবক

টেনিস র‍্যাকেট লুকিতে লুকিতে অথচ পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছে দেখা গেল। উপবিষ্ট তরুণীর ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে আসিয়া র‍্যাকেটটি কক্ষপুটে ধারণ করিয়া আগন্তুক তাহার চোখ টিপিয়া ধরিতেই হাতের মুক্তার মত অক্ষর বাঁকিয়া চুরিয়া গেল। মেয়েটি কৃত্রিম ক্রোধে চাপা গলায় বলিল, ছিঃ ছিঃ কি হচ্ছে নীলুদা, আমার না বিয়ে হয়েছে! আমি আমার চির আরাধ্য পতি-দেবতাকে পত্র লিখছি দেখতে পাচ্ছ না? বলিয়াই সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া চোখ হইতে পরিচিত হাত দুইটি ছাড়াইয়া হাতে লইল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। নবাগত তরুণটিকে আপনারা সকলেই চেনেন, তিনিই বিখ্যাত বক্তার নৃপেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ।

সুতরাং তাঁহারই প্রথমা কন্যা কুমারী পাঞ্চালী সেন যে সপ্তদশবর্ষ বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে উঠিয়াই একাধারে পাঁচজন প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গেই প্রেম করিবে তাহাতে আমরা বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হই নাই। পাঞ্চালী নাম দিবার সময়েই সুরমার দ্বিধাবিভক্ত অবচেতন মনে মহাভারতের দ্রৌপদীর বিচিত্র বিবাহিত জীবনের কথা উদিত হইয়াছিল কি না বসু-মিত্র-মাইতি মহাশয়েরা অনুসন্ধান (আধুনিক মনোবীক্ষণী প্রথায়) করিলে তাহা বলিতে পারিবেন কিন্তু আমরা অবগত আছি, এই পাঁচ জন হতভাগ্য বেতনভোগী মাস্টার ছাড়া কলির কর্ণ বিখ্যাত অভিনেতা মাণিক গাঙ্গুলীর প্রতিও পাঞ্চালীর ঘোরতর আসক্তি ছিল। মাণিক কোন ছবিতে নামিলে আর রক্ষা ছিল না। একাদিক্রমে আটাশবার সে ছবি না দেখিলে পাঞ্চালীর তৃপ্তি হইত না। বাপের পয়সা এবং মায়ের প্রশ্রয় না থাকিলে এরূপ ঘটা অবশ্য সম্ভব ছিল না। বুঝিতেই পারিতেছেন, দুইটিই প্রচুর পরিমাণে ছিল। ইঁহারা আদর দিয়া দিয়া কন্যাকে যে গোলোকধামে তুলিয়াছিলেন সাত চিৎ না হইলে সেখান হইতে তাহাকে ভূলোকে নামানো অসম্ভব ছিল। তাই সে যখন যাহা চাহিয়াছে তখনই পাইয়াছে।

মেয়ে পড়াশুনায় দিগ্বিজয় করিবে এটা ছিল মায়ের সখ; তাই মেয়ের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজি বাংলায় একজন, ইতিহাসে একজন, অঙ্কে একজন, সেলাইয়ের একজন এবং গানে একজন এই মোট পাঁচ জন মাস্টার পাঞ্চালীকে বিদুষী করিয়া তুলিবার জন্য ঘণ্টা ভাগ করিয়া চেষ্টা করিতেছিল। মায়ের নির্বন্ধাতিশয্যে নিরুপায় হইয়া পাঞ্চালী শেষ পর্যন্ত এই ঘোরতর শিক্ষক-বন্ধন স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু স্বভাব-সুলভ নৈপুণ্যে সব কয়টিকেই

সে কাজে লাগাইয়াছিল। আসল তলোয়ার লইয়া খেলিবার পূর্বে কাঠের ভোঁতা তলোয়ার লইয়াই তো খেলিতে হয়। এই নিরীহ বেচারীদের পাইয়া পাঞ্চালী ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল, ইঁদুরকে থাবার মধ্যে পাইলে বিড়ালে যেমন করিয়া থাকে। অবশ্য গানের মাস্টার করালীচরণ ঠিক নিরীহ শ্রেণীর ছিল না—প্রেমের ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া ছাত্রীপ্রেমের ব্যাপারে তাহার মনসবদারী প্রায় হাজারের কোঠাতেই উঠিয়াছিল। কিন্তু পুরাণ-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সকল মহাবীরেরই যেমন একটি করিয়া মৃত্যুবাণ থাকে পাঞ্চালীর কাছে মাস্টার করালীচরণের সেই মৃত্যুবাণটি বোধ করি ছিল, আর চারজন গোবেচারার মত সেও লেপটাইয়া গেল। ইংরেজি-বাংলার অনাদি, ইতিহাসের বীরেন, অঙ্কের গণেশ এবং শেলাইয়ের বিমল প্রথম দৃষ্টিতেই আধমরা হইয়া হাজির হইয়াছিল, পাঞ্চালী তাহাদিগকে ফাঁসির আসামীর মত কোনও রকমে তাজা রাখিয়া চরমক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আয়োজন খুব বেশী নয়—একটু আধো-আধো আদুরে কথা, একটা অপাঙ্গ দৃষ্টি, এক ঝলক হাসি অথবা আচমকা এক হুলকা স্পর্শ। ব্যস, আর কিছু নয়, ঘড়ির কাঁটার মত লোকগুলা সকালে বিকালে ঠিক টাইম রাখিয়া চলিতে লাগিল, ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতেও ব্যত্যয় নাই। গানের মাস্টারের অবশ্য কিছু ডিম্যাণ্ড ছিল, পাইয়া পাইয়া পাওয়াটাই তাহার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে এখানেও সে দাবী ছাড়িবে না। কিন্তু নিরপেক্ষ বলিতে হইবে পাঞ্চালীকে—সে করালীকে এতটুকু বেশী প্রশ্রয় দেয় নাই।

এরূপ অবস্থায় কাণাঘুষায় রটিয়া গেল পাঞ্চালীর বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে। ফলে পাঞ্চালীকে নানা প্রত্যক্ষ হালকা ও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। নিরীহেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। নির্বাকরা প্রণয় নিবেদনে মুখর হইতে লাগিল। ব্যাপার এমন দাঁড়াইল যে, মাকে আর না জানাইলে চলে না। যাহা খেলা ছিল তাহাই মারাত্মক হইয়া উঠিল। যেগুলিকে কাঠের ঘোড়া ভাবিয়া পাঞ্চালী নির্ভয়ে হ্যাট হ্যাট করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই হঠাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিয়া চিঁহি চিঁহি করিতে ও চাট ছুঁড়িতে লাগিল।

কিন্তু পাঞ্চালী ধৈর্য হারাইল না। এই খেলাটাও তো তাহার চাই, মাণিক গাঙুলী এখন পর্যন্ত পরদা ছিঁড়িয়া বাহিরে আসিল না। ইহাদের উস্কাইয়া তাতাইয়া ল্যাজে গোবরে না করিতে পারিলে তাহার দিন কাটিবে কেমন করিয়া। অনাদি আমতা আমতা করিয়া বলিতেছে, এবার একটা

ব্যবস্থা করার দরকার পাঁচু, তোমার বাবাকে বলি। বীরেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংযুক্তা ও রাণী ক্রিশ্চিনার নজীর দেখাইয়া মাস-তারিখের দিকে ধাবিত হইতেছে। গণেশ কথা বলে কম, কিন্তু দুই প্লাস দুইকে সে চার করিতেই অভ্যস্ত, তাহার আবেদন গাণিতিক। বিমলের হাতে মুহুর্মুহু স্থচ বিদ্ধ হইতেছে। পাঞ্চালী "পাগল", "কোথায় কি" বলিয়াও আর সামলাইতে পারিতেছিল না। মনে মনে অনুতাপও করিতেছিল, মজার লোভে এতগুলা পুতুলকে না নাচাইলেই ভাল হইত। কিন্তু করালীচরণ গানের গমকে গমকে গিটকিরিতে গিটকিরিতে চোখের দৃষ্টিকে এবং হাতের আকুঞ্চন-প্রসারণকে এমনই অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল যে যাহা হউক একটা ব্যবস্থা অবিলম্বে অবলম্বন করিবার জন্য পাঞ্চালী মন স্থির করিতে লাগিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঞ্চালী একটা রাস্তাও স্থির করিয়া লইল। প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে ঘোষণা করিল যে, সে স্বয়ম্বরা হইবে। অবশ্য পুরাতন প্রথায় রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া নয়, তাহার স্বয়ম্বর হইবে আধুনিক। সে গঙ্গার জলে ডুবিবে, যে তাহাকে উদ্ধার করিয়া ডাঙায় তুলিবে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাহাকেই সে আত্মদান করিবে। মা-বাবার তখন আর আপত্তি থাকিবে না। সম্মুখে আসন্ন দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জন দেখিতে তাহারা গঙ্গার ঘাটে গিয়া নৌকা ভাড়া করিবে, মা থাকিবেন, বাবা থাকিবেন, পিসীমারাও থাকিবেন। গভীর জলে গিয়া পাঞ্চালী কায়দা করিয়া জলে পড়িবে। তাহার পরের ব্যবস্থা— পাঞ্চালী অনাদিকে বলিল অনাদির হাতে, করালীকে বলিল করালীর হাতে। বীরেন বেচারা সাঁতার জানিত না, পাঞ্চালী বীরেনকে ভরসা দিল সে ডুব-জল অবধি যাইবে না। যাহা হউক, একটা হৈ চৈ হওয়া চাই, যে তাহাকে বিবাহ করিবে তাহাকে হিরো হইতে হইবে। নতুবা চিরাচরিত পাঁজিপুঁথি কোষ্ঠী ঠিকুজী মিলাইবার প্রথা, সে পথে পাঞ্চালীর যাইতে ইচ্ছা নাই। তা ছাড়া সে পথে এ-পাঁচজনের কাহারও অধিকার নাই। বলা বাহুল্য, পাঞ্চালী ভাল সাঁতার জানিত। প্রার্থীর দল বিফল হইলেও জলে সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে সে বিশ্বাস তাহার ছিল এবং ইহাও সে জানিত যে তাহারা বিফল হইবেই।

প্ল্যান শুনিয়া প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখনও কয়েক দিন অবশিষ্ট ছিল, দেখা গেল, সুইমিং কষ্টুম কাঁধে ফেলিয়া বিভিন্ন

ট্যাঙ্ক-স্কোয়ারে চারিজন নিয়মিত হাজিরা দিতেছে, বীরেন বেচারা ইতিহাসের নজির আশ্রয় করিয়াই নিশ্চিন্ত আছে। গলা খারাপ হইবার ভয়েও করালীচরণ পিছপাও হয় নাই।

* * *

বিজয়া দশমী। ব্ল্যাক-আউটের জন্য দিনে দিনেই বিসর্জন সারা হইবে। বাবুঘাট লোকে লোকারণ্য। পাঞ্চালী উৎসাহসহকারে মাকে পিসীমাকে দাঁড়টানা হালধরার কৌশল শিখাইতেছে, তাহার উল্লাস-চীৎকারে পাড়ে এবং নৌকাতেও কম দর্শকের সমাবেশ হয় নাই। সে যে অপরূপ সুন্দরী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোকরারা ভিড়ের মধ্যেই গা টেপাটেপি করিয়া তাহার লীলাচাঞ্চল্য দেখিতেছে এবং মাঝে মাঝে উদ্দেশে দু'চারিটা বচনও ছাড়িতেছে। পাঞ্চালীর বাবা একধারে বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, এই ভিড়ের মধ্যে পাঞ্চালী জোর করিয়া তাঁহাকে আনাতে তিনি যেন বিরক্তই হইয়াছেন। লোকের কাঁধে কাঁধে লরীতে লরীতে জলস্রোতের মত প্রতিমার স্রোত আসিতেছে। হল্লা চীৎকার কোলাহলে গঙ্গাতীর ও গঙ্গাবক্ষ মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

বিখ্যাত সাঁতারু ও সিনেমা-ম্যাগনেট শম্ভু পালের মেজাজটা সেদিন সকাল হইতেই ভাল ছিল। সকালেই বাগবাজারের "সার্বজনীন" পূজায় একজন গোরাকে সে বেদম ঠেঙাইয়াছে, লোকটা মেয়েদের ভিড়ে কুমতলবে ঢুকিয়াছিল। সেদিন দ্বিপ্রাহরিক থ্যাটটাও হইয়াছিল ভাল। পুরাতন অভ্যাসের বশে সে পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত ওই দিনের দুর্ঘটনা বাঁচাইবার জন্য গঙ্গাতীরে হাজির হইয়াছিল। ভিড়ের চাপে দু-দশটা লোক জলে ডুবিয়াই থাকে। অন্যান্য বার সদলবলে আসিত, এবার একাই আসিয়াছে। সাঁতারের সাজ পরিয়া সাঁতার দিয়া তীরের কাছাকাছি একটা বয়ার উপর বসিয়া সে জনতার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। শিকারীর মত তীক্ষ্ণ এবং প্রখর তাহার চোখ। বাবুঘাটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি সন্ধানী আলোবৎ তীব্র দৃষ্টি ফেলিয়া সে উদ্যত হইয়াই ছিল। নৌকাতে ডানাকাটা পরীর মত মেয়েটিকে সেও দেখিয়াছিল। প্রথমটা বিরক্তিই বোধ হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু মেয়েটির স্বতঃস্ফূর্ত চালচলনে সে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই মেয়েটিই যে পা ফস্কাইয়া জলে পড়িবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। 'গেল গেল" রব উঠিবার পূর্বেই শম্ভু পাল জলে পড়িল এবং নৌকার আঘাত বাঁচাইয়া বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইল।

পরস্পরের অগোচরে প্রার্থী পাঁচজনও কেকের ভিতর কিসমিসের মত জনতার ভিড়ের মধ্যেই ছিল। বীরেন আন্দাজে জলের গভীরতা পরিমাপ করিয়া "হায় হায়" করিয়া উঠিল। আর চারজন ধুতি পাঞ্জাবী খুলিয়া কষ্টুম শোভিত হইয়া বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে জলে ঝাঁপ দিল বটে কিন্তু তাহাদের নাকানি-চোবানিই সার হইল। ইণ্টারন্যাশনাল সাঁতারু শম্ভু পাল ততক্ষণে মেয়েটির কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল।

পাঞ্চালী গা এলাইয়া দিয়া খানিকটা তলাইয়া গিয়াছিল, মা পিসীমার আর্ত চীৎকার সেখানেও সে শুনিতে পাইতেছিল। জলের উপরে মাথা তুলিবার পূর্বেই সে অনুভব করিল তাহার ঝুঁটিতে কে হাত দিয়াছে। সর্বনাশ, উহাদের কেহ নাকি! পাঞ্চালীর সত্য সত্যই ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হইল। ঝুঁটি-ধরা অবস্থাতেই সে জলের ভিতর এমন কাণ্ড করিতে লাগিল যে শম্ভু পাল না হইয়া আর কেহ হইলে তাহাকেও আর সলিল-সমাধি হইতে উঠিতে হইত না। কিন্তু শম্ভু পাল অনেক দেখিয়াছে, সে মেয়েটির বদমাইসি অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল এবং একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের থাবা তাহার মাথায় মারিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ডাঙায় তুলিল।

কিন্তু সেই শক্ত হাতের এক আঘাতেই পাঞ্চালী জীবনে এই সর্বপ্রথম আত্মহারা হইল। দুলালী মেয়ে, মা বাপ তাহার জিদ এড়াইতে পারিলেন না। তাহার পর কেমন করিয়া "পাঞ্চালী সিনেমা"র পত্তন হইল এবং ভূতপূর্ব পাঁচজন গৃহশিক্ষকই পাঁচজন বিশ্বাসী দ্বাররক্ষকে পরিণত হইল সে স্বতন্ত্র ইতিহাস। অধিকন্তু, তরুণীচিত্তব্রেকার মাণিক গাঙুলীও "পাঞ্চালী-প্রডাকশনে" বাঁধা মাহিনায় বাঁধা পড়িয়াছে। "পাঞ্চালী সিনেমা"য় একদিন দয়া করিয়া পদার্পণ করিলে এই একদা-প্রেমিক অধুনা-ভক্তদের মুখেই সে কাহিনী আপনারা শুনিতে পাইবেন। সীটের বন্দোবস্ত ভাল। ছারপোকা কম।

১৩৫১